সন্দীপন

বার্ষিকী-২০১৯

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গর্ব শেখ জামাল:

শেখ জামালের জীবনকাল ছিল খুব সংক্ষিপ্ত – ২৮ এপ্রিল, ১৯৫৪ থেকে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর আবাসিক ছাত্র ছিলেন, থাকতেন নজরুল ইসলাম হাউজে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কিশোর শেখ জামাল ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট পাকিস্তানি বাহিনীর বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে ভারতে যান। মুজিব বাহিনীর ৮০ জন নির্বাচিত তরুণের সঙ্গে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৯ নম্বর সেক্টরে যোগদান করেন। দেশে ফেরেন ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ জামালকে সেনা অফিসার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শেখ জামালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রবল আগ্রহ দেখে মার্শাল টিটো তাঁকে যুগোস্লাভিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেন। ১৯৭৪ সালের শুরুতে স্যান্ডহার্স্টে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে একাডেমি থেকে ফিরে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের পোস্টিং হলো ঢাকা সেনানিবাসস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ক্যাপ্টেন নজরুলের অধীনে শেখ জামালের রেজিমেন্টজীবনের হাতেখড়ি হলো কোম্পানি অফিসার হিসেবে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলে জামালের চাকরিকাল ছিল প্রায় দেড় মাস। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে অফিসার ও সৈনিকদের মাঝে তিনি অসাধারণ পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতার ছাপ রেখেছিলেন। ১৪ আগস্ট রাতে ব্যাটালিয়ন ডিউটি অফিসার হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে আসেন তিনি। কিন্তু রাতে আর সেনানিবাসে থাকা হয় না শেখ জামালের। তিনি ফিরে আসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ঘাতক দল ততক্ষণে প্রস্তুতি নিচ্ছে শতাব্দীর এক নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের জন্য। শেষ করে দেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই সম্ভাবনাময় যুবককে।

তথ্য সূত্র: https://www.banglatribune.com/youth/news/354169?fbclid=IwAR2aTpRVtt_MZ06Eu4lcRaWFGY33TQ__7TOqgKOXZnuMkfyJCf_XYcw88

অধ্যক্ষ

ও

সকল সদস্যের পক্ষ থেকে

শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ...

সন্দীপন

বার্ষিকী প্রকাশনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি

উপদেষ্টামণ্ডলী :
মোঃ মনজুরুল হক, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা
মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা
ড. মোঃ নূরুন নবী, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা
আসমা বেগম, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

সম্পাদনাপর্ষদ :
রানী নাছরীন, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা
ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
প্রসূন গোস্বামী, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি
মশিউর রহমান, প্রভাষক, বাংলা
মোঃ আব্দুল জলিল, প্রভাষক, ইংরেজি
ফাহমিদা আক্তার, প্রভাষক, বাংলা
মো. মুজাহিদ আতীক, প্রভাষক, বাংলা
মোঃ তারিকুল ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা
মো. মাঈদুল ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা
মোঃ রাফসানুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি
মাস্টার ইয়ামিন ইকবাল সাবাত, ম্যাগাজিন প্রিফেক্ট, দ্বাদশ (প্রভাতি)
মাস্টার সাজিদ রহমান, ম্যাগাজিন প্রিফেক্ট, দ্বাদশ (দিবা)
মাস্টার মোঃ সাজিদুর রহমান স্বপ্ন, সহকারী ম্যাগাজিন প্রিফেক্ট, একাদশ (প্রভাতি)
মাস্টার মোঃ ফাহিম মুস্তাসির, সহকারী ম্যাগাজিন প্রিফেক্ট, একাদশ (দিবা)

মুদ্রণতত্ত্বাবধান : বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ-২০১৯
আলোকচিত্র :
খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান
মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া, প্রভাষক, রসায়ন
মাস্টার মোঃ গোলাম সাকলাইন, একাদশ (প্রভাতি)
মাস্টার, মোঃ রাসেদুল ইসলাম, একাদশ (প্রভাতি)
প্রচ্ছদ : মাস্টার হাছিবুল আলম মামুর, দ্বাদশ (দিবা)
অলংকরণ :
রানী নাছরীন, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা
ডিজাইন : গ্যালাক্সী ডিজাইন হাউজ, ঢাকা-১২১৬
প্রকাশকাল : মার্চ ২০২০

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং
বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ

সভাপতির বাণী

বার্ষিকী একটি প্রতিষ্ঠানের প্রবহমাণতার প্রতিবিম্ব। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা সর্বোপরি তাদের সৃজনশীল প্রতিভার অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটে বার্ষিকীতে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিকী **'সন্দীপন'** স্বীয় ঐতিহ্য নিয়ে বিকাশোন্মুখ সৃজনশীলতার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভবিষ্যতের নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রত্যয়ী সকল শিক্ষার্থীর আবেগ ও প্রাণোচ্ছ্বাসকে ধারণ করে প্রকাশিতব্য বার্ষিকী **'সন্দীপন-২০১৯'** এর আত্মপ্রকাশকে আমি অভিনন্দন জানাই।

'সন্দীপন' এর নবীন লেখকেরাই একদিন অগ্রসারিতে অবস্থান করে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে উজ্জ্বলভাবে স্বজাতিকে মেলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস। এসব নবীন লেখকের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ।

পরিশেষে বার্ষিকী প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নিরন্তর শুভেচ্ছা।

মোঃ মাহবুব হোসেন

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

শিল্প সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভা বাঙময় হয়ে ওঠে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধন এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে, জাতীয় প্রগতিতে ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে স্বীয় অবদান রেখে অত্যুজ্জ্বল হওয়ার জন্য প্রণোদিত করে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমঞ্চে নিজেদের স্বীয় মর্যাদার সাথে আসীন হতে প্রস্তুত করার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করছে **'সন্দীপন ২০১৯'**। কলেজ বার্ষিকীর এ আত্মপ্রকাশে অধ্যক্ষ হিসেবে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের এক উজ্জ্বল দর্পণ **'সন্দীপন'**। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী হিসেবে এ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রচিত অকৃত্রিম সাহিত্য, সাহসী রঙে অঙ্কিত চিত্রকর্ম, বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য, বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল, হাউস প্রতিবেদন, প্রতিষ্ঠানের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র, সম্মানিত বোর্ড অব গভর্নরস এবং ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি পরিচিতি। প্রকাশিতব্য সাহিত্য ও চিত্রকর্মে কোমলমতি শিক্ষার্থীর অপরিণত বয়সের সাহসী সৃষ্টিই তাদের একদিন জগদ্বিখ্যাত হতে অনুপ্রাণিত করবে। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভাশিস। কলেজ বার্ষিকী **'সন্দীপন ২০১৯'** শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ ও আলোর পথে উদ্দীপিত করে তুলতে সহায়ক হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'সন্দীপন ২০১৯' সর্বমহলে সমাদৃত হবে এবং ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যায়তনের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বলতর করবে ইনশাআল্লাহ। এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও নিরন্তর শুভেচ্ছা।

কাজী শামীম ফরহাদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
এবং
প্রাক্তন রেমিয়ান, কলেজ নং : ২০৭১

সম্পাদকীয়

মানুষ জন্মগতভাবে এক ভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে। অন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য মানুষ ভাষাকে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানবীয় গুণাবলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেগবান হয়েছে ভাষা, ধাপে ধাপে ঋদ্ধ হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম লালনক্ষেত্র ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, সুবিশাল আয়তনে সবুজে সুশোভিত **ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ**। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে কলেজ বার্ষিকী **'সন্দীপন'**। এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বিকাশোন্মুখ প্রতিভার ভাষিক বর্ণনের মুখপত্র **'সন্দীপন'**।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সাবলীল সৃজনীশক্তির প্রকাশ, বিগত বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কলেজের অর্জন, সহশিক্ষা কার্যক্রমে কলেজের অংশগ্রহণের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাপ্তি, কলেজ অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত নানা উৎসবের স্থিরচিত্রসহ সামগ্রিক অগ্রগতির এক প্রামাণ্য স্মারক **'সন্দীপন'**।

'সন্দীপন'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে ছাত্রদের অকৃত্রিম সৃজনশীল আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাষিক বয়ান। এক পা দু পা করে শিশু হাঁটতে শেখে, দৌড়াতে শেখে; একদিন সে হয় বিশ্বজয়ী দৌড়বিদ। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে/ পাগলা হাতি মাথা নাড়ে'- ছড়ার খুদে ছড়াকারই একদিন হয়েছে নন্দিত বিশ্বকবি। তাই আজকের **'সন্দীপন'**-এর লেখিয়েদের কেউ যে আগামীতে বিশ্বনন্দিত কবি-সাহিত্যিক হবে না তা কে নিশ্চিত করে বলতে পারে? এমন হতেই পারে যে, এদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ অতীতের সকলকে ছাড়িয়ে নতুন উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি পৃথিবীর বুকে নিজ ভাষা ও দেশকে মর্যাদার আসনে আসীন করবে।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনামূলক লেখা দিয়ে কলেজ বার্ষিকীকে ঋদ্ধ করেছেন। এর সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাক্ষাৎকার সংযোজন **'সন্দীপন'**কে পৌঁছে দিয়েছে অনন্য উচ্চতায়।

'সন্দীপন-২০১৯' প্রকাশের ক্ষেত্রে রুধির ধারার মতো শক্তি ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছেন কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যার। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা সম্পাদনা পর্ষদকে এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে উৎসাহ প্রদান করেছে। বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল **'সন্দীপন-২০১৯'**। **'সন্দীপন'** সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ ধন্যবাদ ও মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রানী নাছরীন

আহ্বায়ক
'সন্দীপন' সম্পাদনা পর্ষদ-২০১৯
এবং
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

বোর্ড অব গভর্নরস

মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
চেয়ারম্যান

বেগম ফাতিমা ইয়াসমিন
মহাপরিচালক, অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে সচিব)
ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স বাংলাদেশ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

প্রফেসর মুঃ জিয়াউল হক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
সদস্য

মোঃ আলমগীর
অতিরিক্ত সচিব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল
অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
সদস্য

গৌতম আইচ সরকার
অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
সদস্য

মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
সদস্য

এ, কে, এম, বদরুল হাসান
প্রভাষক
শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
সদস্য

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
সদস্য সচিব

শিক্ষকবৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ

মোঃ মনজুরুল হক
প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
দিবা-সিনিয়র শাখা

ড. মোঃ নূরুন নবী
প্রভাতি-জুনিয়র শাখা

আসমা বেগম
দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ

ফাতেমা জোহরা
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ
বর্তমানে উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত বিভাগ

রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান বিভাগ

ড. মো. হায়দার আলী প্রামানিক
বাংলা বিভাগ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ শমসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুখনী
অর্থনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
দর্শন বিভাগ

জে এম আতিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা বিভাগ

সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস বিভাগ

অনাদি নাথ মন্ডল
গণিত বিভাগ

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

ড ম মালেকুল এহতেশাম লাদন
বাংলা বিভাগ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহেদুস হক
রসায়ন বিভাগ

প্রশান্ত চক্রবর্তী
গণিত বিভাগ

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

আসাদুল হক
ইংরেজি বিভাগ

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়ন বিভাগ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নার্গিস জাহান কনক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা বিভাগ

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

হাফিজ উদ্দিন সরকার — উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ | জাকিয়া সুলতানা — প্রাণিবিদ্যা বিভাগ | ফাতেমা নূর — ইংরেজি বিভাগ | নুরুন্নাহার — চারু ও কারুকলা বিভাগ | মোঃ আয়নুল হক — ইংরেজি বিভাগ

প্রভাষকবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মোঃ ফরহাদ হোসেন — ভূগোল বিভাগ | সাবরিনা শরমিন — ভূগোল বিভাগ | এ, কে, এম, বদরুল হাসান — পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | খন্দকার আজিমুল হক পান্থ — পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | মোঃ ফারুক হোসেন — রসায়ন বিভাগ | মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন — পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া — রসায়ন বিভাগ | মোঃ হাবিবুর রহমান — প্রাণিবিদ্যা বিভাগ | মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন — ইসলাম শিক্ষা বিভাগ | মোঃ নজরুল ইসলাম — রসায়ন বিভাগ | অসীম কুমার দাস — ভূগোল বিভাগ | দেওয়ান শামছুদ্দোহা — ইংরেজি বিভাগ

মোঃ শামসুজ্জোহা — শারীরিক শিক্ষা বিভাগ | জি এম এনায়েত আলী — উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ | মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া — পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | মোঃ নুরুল ইসলাম — কৃষি শিক্ষা বিভাগ | মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া — কৃষি শিক্ষা বিভাগ | মোঃ খায়রুল আলম — কৃষি শিক্ষা বিভাগ

মোঃ ফারুক হোসেন — শারীরিক শিক্ষা বিভাগ | মোঃ মহিউদ্দিন — ইসলাম শিক্ষা বিভাগ | মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী — গণিত বিভাগ | হেদেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া — বাংলা বিভাগ | মোঃ হিসাব আলী — গণিত বিভাগ | মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম — গণিত বিভাগ

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী — বাংলা বিভাগ | মুহসিনা আক্তার — হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | জাফর ইকবাল — হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | মশিউর রহমান — বাংলা বিভাগ | মোহাম্মদ আল আমিন — ইসলাম শিক্ষা বিভাগ | মোঃ এনামুল হক — ইংরেজি বিভাগ

টিচার্স গ্যালারি

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষি শিক্ষা বিভাগ

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান বিভাগ

রাসেল আহমেদ
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি বিভাগ

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি বিভাগ

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল বিভাগ

আবদুল কুদ্দুস
দর্শন বিভাগ

মোহাম্মদ মাইনুদ্দীন
ইংরেজি বিভাগ

হরি পদ দেবনাথ
রসায়ন বিভাগ

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা বিভাগ

আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়ন বিভাগ

ওমর ফারুক
গণিত বিভাগ

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু জাফর সিদ্দিক
গণিত বিভাগ

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সালেহ
গণিত বিভাগ

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা বিভাগ

তারেক আহমেদ
বাংলা বিভাগ

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি বিভাগ

তাসান্না আরা
বাংলা বিভাগ

আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি বিভাগ

মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

ফারজানা ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত বিভাগ

মোঃ সোলাইমান আলী
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

দুলাল চন্দ্র দাস
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মো. মুজাহিদ আতীক
বাংলা বিভাগ

লুৎফুন নাহার
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ তারিকুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ আফজাল হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

নিশাত নওশিন
বাংলা বিভাগ

আছমা খাতুন
বাংলা বিভাগ

মো. মাঈদুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

আফসানা আক্তার
বাংলা বিভাগ

মোঃ রাফসানুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ ফোরকান
রসায়ন বিভাগ

সানজিদা আফরিন অনু
ইংরেজি বিভাগ

রাফিয়া আক্তার
বাংলা বিভাগ

মো. এনামুল হাসান
রসায়ন বিভাগ

সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

ভারত চন্দ্র পৌড়
ক্রীড়া বিভাগ

মোহাম্মদ শাহ্সাৎ হোসেন
ক্রীড়া বিভাগ

প্রণব হাওলাদার
হিন্দু ধর্ম বিভাগ

বর্ণালী ঘোষ
সঙ্গীত বিভাগ

প্রদর্শকবৃন্দ

আব্দুল মোমেন খান
ভূগোল বিভাগ

মোঃ ছানাউল হক
জীববিদ্যা বিভাগ

মোঃ কামাল হোসেন
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

ফারহানা আক্তার
জীববিদ্যা বিভাগ

পরেশ চন্দ্র রায়
গণিত বিভাগ

ওয়াহিদা সুলতানা
ভূগোল বিভাগ

মোঃ রমজান আলী
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ জুবায়ের হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ গোলাম আজম
রসায়ন বিভাগ

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ

সাগর চন্দ্র দাস
প্রভাষক, চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আনিছুর রহমান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জে. রৌশন আরা হানিফ
প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ

আফরোজা লাবনী
প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

মোঃ লুৎফর রহমান
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ আরিফুল হক
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ হাসান মাসকুর খান
প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ

এস. এম সোহেল রানা
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

মোঃ আলী মর্তুজা মজুমদার
প্রভাষক, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ

জনিকা মহলদার
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

হোমায়রা
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

টুম্পা রক্ষিত
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ হাবিবুল্লাহ
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আবু নাসের
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া বিভাগ

মোঃ মাহমুদ হাসান
প্রদর্শক, ভূগোল বিভাগ

সোমা রানী বনিক
সহকারী শিক্ষক, হিন্দু ধর্ম বিভাগ

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া বিভাগ

মোঃ নাসিরুল হক
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া বিভাগ

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

বেনজীর আহমেদ
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

ফরিদ আহমেদ
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মতিয়ার রহমান
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

মোঃ অছিউর রহমান
সহকারী স্টোর কর্মকর্তা

মোঃ আমীর সোহেল
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মাইনুল ইসলাম
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর

মোঃ জুলফিকার আলী ভূট্টো
সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ তৌফিক আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মসজিদের স্টাফ

মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন
ইমাম

মোঃ হাসানুজ্জামান
খাদেম

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
হিসাব রক্ষক

মোসাম্মৎ তহমিনা খানম
প্রধান সহকারী

আল-মামুন
পিএ টু প্রিন্সিপাল

মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
উচ্চমান সহকারী

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী

মোঃ সুহেল রানা
স্টোর কিপার

মোঃ আফজাল হোসেন
স্টোর কিপার

রওশন আরা সাথী
মেট্রন

মোঃ খাইরুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

মুহাম্মদ শহিদুর রহমান
অফিস সহকারী

মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড

মোঃ রবিউল ইসলাম
ফার্মাসিস্ট

মুনিরা বেগম
মেট্রন

দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড

মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

হাবিবুর রহমান
হিসাব সহকারী

মোঃ শহীদুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

রিপন মিয়া
হিসাব সহকারী

মোঃ মঈনুল হাসান
গ্রাউন্ডস সুপারিনটেনডেন্ট

হাসিনা খাতুন
অফিস সহকারী

তানজিম হাসান
স্টুয়ার্ড

চন্দন কুমার সরকার
ফার্মাসিস্ট

মোঃ মঞ্জুরুল হক
স্টুয়ার্ড

মোহাম্মদ লিটন মিয়া
স্টোর এ্যাসিসটেন্ট

মোঃ মাহবুব হাসান
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার

খন্দকার ওয়ালিদ
অফিস সহকারী

মোঃ আব্দুল খালেক
গাড়ি চালক

মোঃ শহীদউল্লাহ্
গাড়ি চালক

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ মমতাজ উদ্দিন মজুমদার
ইলেকট্রিশিয়ান

চাঁন মিয়া
প্লাম্বার

মোঃ আমজাদ হোসেন
টেবিলবয়

মেথিউ রবীন্দ্র মুহুরী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

আবু সাঈদ মোল্লা
হাউস মালি

মোঃ শাহজাহান প্রধানিয়া
টেবিলবয়

আহাদুজ্জামান হাওলাদার
হাউস গার্ড

মোঃ আব্দুল জলিল
বাবুর্চি

মোঃ রেজাউল আলম খান
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ মোস্তফা
বাবুর্চি

মোসাম্মাৎ জরিনা খাতুন
আয়া

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হেড গার্ড

মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার
প্লাম্বার হেল্পার

মোঃ হারুন অর রশীদ
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ ইউনুস
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট

মোঃ আবুল কালাম
এমএলএসএস

মোঃ জাকির হোসেন
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ ইয়ার আলী
বাবুর্চি

মোঃ আইয়ুব আলী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোহাম্মদ আলী খান
এমএলএসএস

মোঃ খলিলুর রহমান
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
এমএলএসএস

মোঃ ছাবেদ আলী
রং মিস্ত্রী

শ্রী কৃষ্ণন দাস
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ জিন্নাহ
কার্পেন্টার হেল্পার

মোঃ জাকির হোসেন মনু
টেবিলবয়

মোঃ আব্বাস আলী
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ ফারুকুল ইসলাম
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ সেলিম
টেবিলবয়

মোঃ কামাল হোসেন
বাবুর্চি

মোঃ আব্দুর রশিদ
এমএলএসএস

মোঃ সোহরাব হোসেন
বাবুর্চি

মোঃ সেলোয়ার
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ মনির হোসেন
হেড মালী

তিমথী পেনাপেল্লী সবুজ
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ আমিনুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ জাকির হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ রেজাউল ইসলাম
পেইন্ট সুপারভাইজার

মোঃ শহীদুল ইসলাম
ম্যাট

মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বাবু
সুইপার হোস্টেল

মোঃ হানিফ
সুইপার শিক্ষা ভবন-১

মোঃ মোবাশ্বের আলী খাঁন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আনোয়ারুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ ফারুক সিকদার
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ কুদ্দুস মোল্লা
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ নজরুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

স্টাফস গ্যালারি

মোঃ কামাল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ মজিবুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুর রহমান
হাউস গার্ড

আব্দুল জলিল মিয়া
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আল আমিন খোন্দকার
ওয়ার্ডবয়

মোঃ শহীদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

শাহ্ মোঃ আজিজুল হক
ওয়ার্ডবয়

মোঃ বনিউর রহমান
মালী

গাজী মোস্তফা কামাল
টেবিলবয়

মোঃ মোকছেদুল হক
টেবিলবয়

মোঃ মহিরুল হক
মালী

মোঃ মোকলেচুর রহমান
সেবীর অর্ডারলি

মোঃ মন্টু মোল্লা
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ নূরে আলম সিকদার
মালী

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ নাসির উদ্দিন
হাউস মালি

মোঃ আব্দুল হক
হাউস গার্ড

মোঃ সাহাদাত হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
হাউস মালি

মোঃ শহীদুল ইসলাম
হাউস মালি

মোঃ আব্দুল্লাহ্
টেবিলবয়

মোঃ আজমল হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোহম্মদ আলাউদ্দিন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুল বাছেদ
টেবিলবয়

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মোঃ মজিবুর রহমান
গেইট দারোয়ান

মোঃ জাহিরুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পাম্প অপারেটর

মোঃ সাইফুল ইসলাম (মহিউদ্দিন)
সহকারী বাবুর্চি

মোহাম্মদ শরীফ হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোছাঃ শিউলি আক্তার
হোস্টেল সুইপার

মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ আহসানুল হক
টেক্সটবুক বেয়ারার

আব্দুর রশিদ শেখ
এমএলএসএস

খালেদ পারভেজ
এমএলএসএস

আব্দুল কাদের
এমএলএসএস

আনোয়ার হোসেন খাঁন
নিরাপত্তা প্রহরী

আবদুস সালাম মিঞা
নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট

মোঃ জালাল উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ জহিরুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ হেমায়েত হোসেন
এমএলএসএস

মোঃ ওসমান আলী
ওয়ার্ডম্যান

মোঃ মফিজুল ইসলাম
ওয়ার্ডম্যান

মোঃ শহিদুজ্জামান
হাউজ গার্ড

মোঃ রাসেল বেপারী
হাউজ গার্ড

মোঃ আবু সায়েদ
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট

মোঃ রিপন আলী
সুইপার

মোসাম্মৎ লাইলী আক্তার
সুইপার

মোঃ স্বপন হোসেন
সুইপার

আকলিমা বেগম
সুইপার

এ জেড এম মাইনুল আকবর
সুইপার

নুর মোহাম্মদ কাজল
বৈদ্যুতিক সহকারী

মোঃ আকিবুল ইসলাম
টেবিলবয়

সেলিম মিয়া
টেবিলবয়

মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম
টেবিলবয়

মোঃ রাসেল আলী
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ নবীজুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ খলিলুর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ঝাড়ুদার

হাফিজ মোল্লা
গেইট দারোয়ান

মোঃ হানিফ
গ্রাউন্ডসম্যান

মুকুল
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ দারুল মিয়া
পেইন্টার (রং মিস্ত্রী)

মোঃ সোহরাব আলী
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ সোহাগ মিয়া
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

তপন কুমার পাল
পাম্প অপারেটর

রিপন মাহমুদ
হোস্টেল সুইপার

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ রাসেল
টেবিলবয়

রাহাত আহমেদ
এমএলএসএস

মোঃ ইমদাদুল হক
হাউস মালি

পি. কে জেমস লুক
সুইপার (একাডেমিক)

মোঃ লাভলু মিয়া
হাউস মাদি

মোঃ হাজারুল ইসলাম
সুইপার (সেন্ট্রাল)

সুজন কুমার পাল
সুইপার (সেন্ট্রাল)

আবু ছাহিদ দিপু
গেইট সারেয়ান

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
এমএলএসএস

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন
এমএলএসএস

মোঃ আব্দুল হালিম রেজা
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

জিয়াউর রহমান
ইলেকট্রিশিয়ান মেশিন অপারেটর

মোঃ মনছুর আলী
হাউস মাদি

মোঃ মানিক মিয়া
সুইপার

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ডাঃ মোঃ আরমান ফয়ছাল
মেডিকেল অফিসার

এ বি সালাম
অফিস সহকারী

মোঃ জতিক শেখ
হোস্টেল সুইপার

মোঃ সুমন
নাইট গার্ড

মোঃ জুলেমান
গেইট সারেয়ান

মোঃ বায়েজিদ
ম্যাট

মোঃ পারভেজ হাসান
এমএলএসএস

রিংকু আহমেদ
ম্যাট

অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রধান শাখা, মেডিকেল এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে বিএনসিসি শিক্ষক এবং ক্যাডেট দল

অধ্যক্ষের সাথে স্কাউট শিক্ষক এং স্কাউট দল

অধ্যক্ষের সাথে বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক এবং বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

সূচিপত্র

বিষয় শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১. হাউস প্রতিবেদন	২৫
২. সহপাঠ্যক্রমিক ও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন	৩২
৩. টিচার্স কর্নার	৩৮
৪. স্টুডেন্টস কর্নার	৫৯
৫. রেমিয়ান অধ্যক্ষের সাথে আলাপচারিতা	১৩১
৬. শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক	১৩৩
৭. কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন	১৩৪
৮. চিত্রশৈলী ও ফটোগ্রাফি	১৩৬
৯. স্টুডেন্টস গ্যালারি	১৪৩
১০. স্মৃতির পাতায় বর্ণিল-২০১৯	১৮৮
১১. স্থাপনা ও নিসর্গ	১৯৯
১২. ক্লাব পরিচিতি	২০১
১৩. স্মৃতি অমলিন	২০২

ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস

ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬টি আবাসিক হাউসের মধ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এই হাউসের প্রথম নাম ছিল জিন্নাহ্ হাউস। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় ১ নম্বর হাউস। এবং পরবর্তী কালে দেশমাতৃকার অমর সন্তান, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির। নানা ইতিহাস ঐতিহ্যসহ স্বর্ণালি স্মৃতি ধারণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাউসটি। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের দেয়ালে শোভাবর্ধন করেছে ড. কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য ম্যুরাল। হাউসটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন মেট্রনসহ ১১ জন স্টাফ। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে ড. কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের সফলতার রয়েছে এক গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষায় সকল ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজের আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় হাউসের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুদরত-ই-খুদা হাউস ২০১৯ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হ্যাট্রিক করেছে এবং ফুটবল প্রতিযোগিতায় টানা ১২ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে বিজয়ের ১ যুগ পূর্ণ করেছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা বাদে কুদরত-ই-খুদা হাউস সকল আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ড. কুদরত-ই-খুদা হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউক।

হাউস মাস্টার	: নূরুন্নাহার
হাউস টিউটর	: মুহসিনা আক্তার
হাউস এন্ডার	: মোঃ রাজিব আহম্মেদ আজাদ
হাউস প্রিফেক্ট	: ইফতি রহমান তূর্য

জয়নুল আবেদিন হাউস

জয়নুল আবেদিন হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬১ সালের মে মাসে 'আইয়ুব হাউস' নামে এ হাউসটির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর দেশমাতৃকার অমর সন্তান, বাংলাদেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম অনুসারে এ হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জয়নুল আবেদিন হাউস।

হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং মনোরম। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দ্বিতল হাউসটির সবুজ-শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। হাউসটির দেয়ালের শোভা বর্ধন করছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি সুন্দর বাগান। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে আটটি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য চারটি বিশেষ কক্ষ। এছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমন রুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ জন কর্মচারী এবং একজন মেট্রন নিযুক্ত আছেন। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই করে রুটিন মাফিক। এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে PEC এবং JSC পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র জিপিএ-৫ অর্জন করেছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে, তাছাড়া ২০১৮ সাল পর্যন্ত রানার আপ হয় এ হাউসটি। ২০১৮ সালে জয়নুল আবেদিন হাউস বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় টানা চ্যাম্পিয়ন হয়। এই হাউস ২০১৭ সালের দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে টানা দুবার রানার আপ হয়। ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০১৯ সালের অন্যতম আকর্ষণ ট্রেজারহান্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এ হাউস।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে রয়েছে যেমন গভীর হৃদ্যতা, তেমনি রয়েছে ছাত্রদের সাথে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুনিবিড় সম্পর্ক।

মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা জয়নুল আবেদিন হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : আসাদুল হক
হাউস টিউটর : নার্গিস জাহান কনক
হাউস এন্টার : সামিউল চৌধুরী
হাউস প্রিফেক্ট : আলভী রহমান

জসীমউদ্‌দীন হাউস

'মূলধন, আয় এবং ভৌত সম্পদের কোনোটাই একটা জাতির সম্পদ নয়। শুধু মানব সম্পদই একটি জাতির আসল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।'- এফ,এইচ, হারবিসন

প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর অপূর্ব সমন্বয়ে সমন্বিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজের হাউসসমূহ। কলেজের সাতটি হাউসের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন হাউস নবীন সংযোজন। দিবা জুনিয়র শাখার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, একতা, খেলাধুলায় নৈপুণ্য অর্জন তথা সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ২০০৮ সালে বাংলা সাহিত্যের পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের নামানুসারে এ হাউসটির নামকরণ করা হয়। ২০১৯ সালে অফিস আদেশের মাধ্যমে শিক্ষা ভবন-২ এর ২০৬ নম্বর কক্ষটিকে এ হাউসের অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়।

হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর ও একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

এই হাউসের ছাত্ররা মনে প্রাণে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি পাবলিক পরীক্ষা PEC ও JSC তে অধিকাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে।

একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৯ সালে জসীমউদ্‌দীন হাউস ৫৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার আপ, ফুটবলে রানার আপ, ট্রেজারহান্ট এ রানার আপ, নাটকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৮ সালে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রানার আপ, ক্রিকেটে রানার আপ, ফুটবলে রানার আপ ও নাটকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। হাউসটি ধারাবাহিক সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কলেজের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জসীমউদ্‌দীন হাউস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে এবং করবে।

হাউস মাস্টার : মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
হাউস টিউটর : মশিউর রহমান
হাউস এন্ডার : শাহরিয়ার নূর তুহিন।
হাউস প্রিফেক্ট : হাসিবুল নূর তরঙ্গ।

ফজলুল হক হাউস

"কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান"

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। উক্ত কলেজে ৭টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হল শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক হাউস। দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, কৃষক বন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তার দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট বড় ২৮টি কক্ষ। এছাড়াও রয়েছে ১টি কমন রুম ও সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'হাউস প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড'। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত, দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক হাউসটিতে বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে।

'ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ' এ সংস্কৃত শ্লোকে হাউসের ছাত্ররা মনে প্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিন মাফিক করে থাকে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনা ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। শুধু শিক্ষামূলকই নয় সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমেও শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক হাউস উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ২০১৮ সালের ৫৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় গৌরব অর্জন করে। একই বছরে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাউসটি রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক-এটাই প্রত্যাশা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

হাউস মাস্টার : মুহাঃ ওমর ফারুক
হাউস টিউটর : মোঃ জুবায়ের হোসেন
হাউস এন্ডার : মোঃ ফাহিম হাসান
হাউস প্রিফেক্ট : মোঃ মুমিনুল হক খান অন্তর

নজরুল ইসলাম হাউস

"বলবীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত শির
ওই শিখর হিমাদ্রির"
-কাজী নজরুল ইসলাম

আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রাপ্তিযোগ, সত্যের সাথে স্বপ্ন আর বিদ্রোহের সাথে বশ্যতার অপূর্ব সংমিশ্রণে নজরুল ইসলাম হাউস যেন সুদক্ষ কারিগরের এক সুনিপুণ সুতিকাগার। ভিআরএমসি কে যদি একটি স্বর্ণের মুকুট কল্পনা করা হয় তবে তার কেন্দ্রে বসানো মুক্তাটি হবে নজরুল ইসলাম হাউস। বিদ্রোহ, তারুণ্য, প্রেম, সাম্য আর অসাম্প্রদায়িকতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে হাউসটির। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত এই দ্বিতল হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত, সুপরিকল্পিত ও দৃষ্টিনন্দন। এ হাউসটির সামনে রয়েছে অত্যন্ত মোহণীয় একটি পুষ্পকানন। এছাড়াও হাউসটির চতুর্পার্শ্বে শোভাবর্ধন করছে বিভিন্ন ফলদ ও কাষ্ঠল বৃক্ষ। শৃঙ্খলা, সততা, সাম্য, সৌহার্দ্য, ঔদার্যে সমুজ্জ্বল এ হাউসে ছাত্রের বসবাসের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত ২৮টি কক্ষ, ১টি পূর্ণাঙ্গ কমন রুম, সুবিশাল ডাইনিং হল ও প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত স্থান। ছাত্রদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস টিউটরের বাসভবন।

হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০ জন কর্মচারি ও ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। একাধারে প্রাতিষ্ঠানিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের সুবিশাল অর্জন অত্যন্ত ঈর্ষণীয়।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে SSC ও HSC পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্রই GPA-৫.০০ পেয়েছে। এছাড়াও ২০১৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করে নজরুল ইসলাম হাউস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহিদ শেখ জামাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুসহ দেশবরেণ্য প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এ হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ২০১০ সালের কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্নেহভাজন ছোট ভাইয়ের স্মৃতি বিজড়িত এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন।

হাউস মাস্টার : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
হাউস টিউটর : মোঃ আবু ছালেক
হাউস এডার : মোহাম্মদ অলিউল্লাহ
হাউস প্রিফেক্ট : হারুন-অর-রশিদ।

লালন শাহ হাউস

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসের মধ্যে 'লালন শাহ' হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩ নং হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালে ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক 'লালন শাহ' এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'। বর্তমানে হাউসটির সংস্কার কাজ চলমান থাকায় এ হাউসের আবাসিক ছাত্ররা বিভিন্ন হাউসে অবস্থান করছে। আশা করা যায়, আগামী জুলাই ২০২০ এর মধ্যে হাউসটির সংস্কার কাজ শেষ হবে এবং হাউসটি নতুন রূপে নতুন উদ্যমে তার কর্মকাণ্ড চালু করবে।

পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল 'লালন শাহ' হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ২৯টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১১০ জন ছাত্র থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতো এ হাউসে অবস্থান করবে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, কমন রুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর ও স্টাফ রুম। হাউসে ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তায় রয়েছে একজন স্টুয়ার্ড, একজন ওয়ার্ডবয়, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুইজন টেবিলবয়, একজন মালি, একজন দারোয়ান এবং একজন সুইপার। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে ভ্রাতৃতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস প্রতিবন্ধক দৌড় প্রতিযোগিতা এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও লালন শাহ হাউস আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

হাউস মাস্টার : প্রশান্ত চক্রবর্তী
হাউস এডার : আসিফ আব্দুল্লাহ ওসান
হাউস প্রিফেক্ট : আব্দুর রহমান সাকিব।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০ মার্চ ২০০৮ সালে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। এ হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮। এ হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুইজন টেবিলবয়, একজন ওয়ার্ডবয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। হাউসের সামনে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলবাগান ও একটি সুবিশাল মাঠ। পশ্চিম দিকে একটি আমবাগান ও পেয়ারা বাগান। পূর্বে ফুলবাগান এবং পেছনে রয়েছে আরেকটি পেয়ারা বাগান। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায় এবং শান্তির আশ্বাস মেলে।

পাঁচতলা এ হাউসের বিভিন্ন তলায় রঙিন আলো হাউসের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ মনোরম পরিবেশ ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ আরো বৃদ্ধি করছে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসা ও ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও ২০১৮ সালে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অতঃপর ২০১৯ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, ২০১৮ সালে রানারআপ এবং ২০১৮ সালে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও ২০১৭ সালে রানার আপ হয়। ২০১৮ সালে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় রানার আপ এবং ২০১৯ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এভাবে এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্য প্রমাণ করে আসছে।

হাউস মাস্টার : মোহাম্মদ সেলিম
হাউস টিউটর : তারেক আহমেদ
হাউস এন্ডার : আসিফ মাহমুদ
হাউস প্রিফেক্ট : সাকি আল মুইজ ধ্রুব।

শিক্ষা, সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মোঃ মেসবাউল হক
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানে ২য় (ডে) শিফট চালু করা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনে প্রায় ৫১০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

যুগোপযোগী শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর কর্মজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিচে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজের শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্রে সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। নিচে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো :

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল-২০১৯

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ -৫	পাশের হার
পিইসি	৩০০	৩০০	২৯৯	১০০%
জেএসসি	৩৯৭	৩৯৭	২৯৯	১০০%
এসএসসি	৫০৭	৫০৪	৩৫৯	৯৯.৪১%
এইচএসসি	৯২৭	৯২৫	৪৬৫	৯৯.৭৮%

সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো:

১. **২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত থানা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা :**

- সাধারণ জ্ঞান (গ বিভাগ) : আহনাফ আবরার হাসিন (নবম শ্রেণি)-১ম
- আবৃত্তি (ক বিভাগ) : নাকিস আহমেদ (চতুর্থ শ্রেণি)-১ম
- আবৃত্তি (গ বিভাগ) : আহনাফ আবরার হাসিন (নবম শ্রেণি)-১ম
- উপস্থিত বক্তৃতা (গ বিভাগ) : আহনাফ আবরার হাসিন (নবম শ্রেণি)-১ম
- ধারাবাহিক গল্প বলা (গ বিভাগ) : জাওয়াদ মোঃ নাহিন (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- দেশাত্মবোধক সংগীত (ক বিভাগ) : সাবিল ইসলাম (চতুর্থ শ্রেণি)-১ম
- রবীন্দ্র সংগীত (খ বিভাগ) : অরিজিৎ ভৌমিক (সপ্তম শ্রেণি)-১ম
- রবীন্দ্র সংগীত (গ বিভাগ) : ওয়াজিউর রহমান প্রথম (নবম শ্রেণি)-১ম
- নজরুল সংগীত (গ বিভাগ) : অর্জন রহমান (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- ভাব সংগীত (ক বিভাগ) : সাবিল ইসলাম (চতুর্থ শ্রেণি)-১ম
- ভাব সংগীত (গ বিভাগ) : ওয়াজিউর রহমান প্রথম (নবম শ্রেণি)-১ম
- লোক সংগীত (গ বিভাগ) : অর্জন রহমান (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- হামদ ও নাত (ক বিভাগ) : সাবিল ইসলাম (চতুর্থ শ্রেণি)-১ম
- তবলা (গ বিভাগ) : ঋদ্ধ নিরুপম মণ্ডল (দশম শ্রেণি)-১ম
- চিত্রাংকন (গ বিভাগ) : জাওয়াদ মোঃ নাহিন (অষ্টম শ্রেণি)-১ম

উল্লেখ্য, ওয়াজিউর রহমান প্রথম ভাব সংগীতে জেলা পর্যায়ে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. **০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ হয়ে তুরস্ক রেডিও টেলিভিশন (টি আর টি) আয়োজিত ৪১তম আন্তর্জাতিক শিশু উৎসবে শিশু সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়–** জাওয়াদ মোঃ নাহিন (অষ্টম শ্রেণি)

৩. **০১-০২ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত Dhaka Tribune Inter-School Quiz Competition এ চ্যাম্পিয়ন হয় DRMC কুইজ দল।** দলের সদস্যরা হলো :

- রাইয়ান রহমান সিয়াম (দশম শ্রেণি)
- আবরার আজিম ঋত্বিক (দশম শ্রেণি)

উল্লেখ্য, Dhaka Tribune কর্তৃপক্ষ Prize Money হিসেবে বিজয়ীদের ১ লক্ষ টাকা এবং কলেজকে (DRMC) ১ লক্ষ টাকা প্রদান করে।

৪. **০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা :**

- রাইসুল ইসলাম (নবম শ্রেণি)-১ম
- পুলক সূত্রধর (দশম শ্রেণি)-২য়

৫. **৮-১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে DRMC বিতর্ক দল।** বিতার্কিকরা হলো :

- খান মোঃ ওমর ফারুক (একাদশ শ্রেণি)
- নাইমুর রহমান দুর্জয় (একাদশ শ্রেণি)
- সাজিদুল ইসলাম অয়ন (একাদশ শ্রেণি)

৬. **০৮-১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে Viqarunnisa English Language Club আয়োজিত 3rd VELC National Language Fiesta :**

ক) Script Writing : ➤ ওমর ফারদিন খান (দশম শ্রেণি)-১ম

খ) Secondary গ্রুপে কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় DRMC কুইজ দল। দলের সদস্যরা হলো :

- আবরার আজিম ঋত্বিক (দশম শ্রেণি)
- নাকিব হায়দার (নবম শ্রেণি)
- রাইয়ান রহমান সিয়াম (দশম শ্রেণি)

গ) Senior গ্রুপে কুইজ প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয় DRMC কুইজ দল। দলের সদস্যরা হলো :

- আবরার চৌধুরী (একাদশ শ্রেণি)
- সাজিদ রাইয়ান আকাশ (একাদশ শ্রেণি)
- মোঃ সাজেদুল হক ইয়াশফি (একাদশ শ্রেণি)

৭. ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা :

- সৈয়দ আবতাহী নূর (ষষ্ঠ শ্রেণি)-২য়

উল্লেখ্য, সে ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত Bangladesh Turkey Friendship Art Competition এ বিজয়ী হয়ে ২১ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত তুরস্কে অবস্থান করে।

৮. ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা অঞ্চল-৮ এ সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা:

- ভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গ্রুপ) : রাশেদুল ইসলাম ইয়ন (সপ্তম শ্রেণি)-১ম
- ভাষা ও সাহিত্য (৯ম-১০ম শ্রেণির গ্রুপ) : মোঃ তামহিদুল ইসলাম (দশম শ্রেণি)-১ম
- ভাষা ও সাহিত্য (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : মোঃ জুনায়েদ ইসলাম (একাদশ শ্রেণি)-১ম
- গণিত ও কম্পিউটার (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গ্রুপ) : রাশিক রহমান (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গ্রুপ) : মাহিম মোহাম্মদ সাহিদ সাদি (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (৯ম-১০ম শ্রেণির গ্রুপ) : ত্বাহা ইমতিয়াজ আলিম (দশম শ্রেণি)-১ম
- বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : মোঃ মোখলেছুর রহমান (একাদশ শ্রেণি)-১ম

উল্লেখ্য, রাশেদুল ইসলাম ইয়ন, মোঃ জুনায়েদ ইসলাম, রাশিক রহমান ও ত্বাহা ইমতিয়াজ আলিম ঢাকা মহানগর পর্যায়ে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৯. ২৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের থানা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা :

- শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী (স্কুল গ্রুপ) : সৌমিত্র শর্মা উৎস (দশম শ্রেণি)
- শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী (কলেজ গ্রুপ) : এস এম ইমতিয়াজ মাহমুদ (দ্বাদশ শ্রেণি)
- শ্রেষ্ঠ বি.এন.সি.সি ক্যাডেট : ফাহিম ইমতিয়াজ (দ্বাদশ শ্রেণি)
- রবীন্দ্র সংগীত (৯ম-১০ম শ্রেণির গ্রুপ) : ওয়াজিউর রহমান প্রথম (নবম শ্রেণি)-১ম
- রবীন্দ্র সংগীত (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : নন্দিত বনিক (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম
- দেশাত্মবোধক গান (৯ম-১০ম শ্রেণির গ্রুপ) : সৌমিত্র শর্মা উৎস (দশম শ্রেণি)-১ম
- দেশাত্মবোধক গান (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : নন্দিত বনিক (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম
- নজরুল সংগীত (৯ম-১০ম শ্রেণির গ্রুপ) : সৌমিত্র শর্মা উৎস (দশম শ্রেণি)-১ম
- নজরুল সংগীত (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : এস এম ইমতিয়াজ মাহমুদ (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম
- লোক সংগীত (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গ্রুপ) : নাফিস ফুয়াদ (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- লোক সংগীত (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : এস এম ইমতিয়াজ মাহমুদ (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম
- একক বিতর্ক (৯ম-১০ম শ্রেণির গ্রুপ) : তামহিদুল ইসলাম (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম
- একক বিতর্ক (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : নাইমুর রহমান নুর্জয় (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম
- উচ্চাঙ্গ সংগীত (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গ্রুপ) : অর্জন রহমান (অষ্টম শ্রেণি)-১ম
- উচ্চাঙ্গ সংগীত (১১শ-১২শ শ্রেণির গ্রুপ) : এস এম ইমতিয়াজ মাহমুদ (দ্বাদশ শ্রেণি)-১ম

১০. ১৫-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে দুরন্ত টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয় DRMC কুইজ দল। দলের সদস্যরা হলো :

- মোঃ আলীউর রহমান (চতুর্থ শ্রেণি)
- সামীউল মোস্তফা হাসান (পঞ্চম শ্রেণি)
- আহনাফ ইলমান (ষষ্ঠ শ্রেণি)
- ওমর বিন আরিফ (সপ্তম শ্রেণি)

উল্লেখ্য, দুরন্ত টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ Prize Money হিসেবে বিজয়ীদের ৪০ হাজার টাকা ও কলেজকে (DRMC) ৬০ হাজার টাকা প্রদান করে।

১১. ০২ মে ২০১৯ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় DRMC বিতর্ক দল। দলের সদস্যরা হলো:

- আহনাফ আবরার হাসিন (নবম শ্রেণি)
- জুলকার নাইন (নবম শ্রেণি)
- নাফিউল ইসলাম (নবম শ্রেণি)

১২. ১৪-১৫ জুন ২০১৯ তারিখে YMCA College আয়োজিত National Quiz Festival এর Literary Quiz প্রতিযোগিতা:

- ওয়াসি কবীর (দশম শ্রেণি)-১ম

১৩. ২০-২২ জুন ২০১৯ তারিখে শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ আয়োজিত ৪র্থ বিজ্ঞান মেলা :

ক) **Secondary** গ্রুপে কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন:

- আবরার আজিম ঋত্বিক (দশম শ্রেণি)
- ইফতেখার ওমর পিয়াল (দশম শ্রেণি)

খ) **Senior** গ্রুপে কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন:

- সাজিদ রায়হান আকাশ (দ্বাদশ শ্রেণি)
- লামিম নাহিয়ান (দ্বাদশ শ্রেণি)
- মোঃ সাজেদুল হক ইয়াশফি (দ্বাদশ শ্রেণি)

১৪. ২৫-২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল ও কলেজ আয়োজিত **3rd National Earth Carnival** এ **Green Quiz** এ চ্যাম্পিয়ন হয় **DRMC** কুইজ দল। দলের সদস্যরা হলো:

- নাকিব হায়দার (নবম শ্রেণি)
- আবরার আজিম ঋত্বিক (দশম শ্রেণি)
- ইফতেখার ওমর পিয়াল (দশম শ্রেণি)

১৫. ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা:

- আবু সায়াদ (একাদশ শ্রেণি)-২য়

১৬. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাপান দূতাবাস আয়োজিত **JENESYS 2019-Student and Youth Exchange Network** এর জন্য নির্বাচিত হয়:

- কাজী রেভান (একাদশ শ্রেণি)

১৭. ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে **St. Joseph Higher Secondary School** আয়োজিত **3rd Nature and Adventure Festival:**

ক) **Team Based Quiz** এ চ্যাম্পিয়ন:

- আবরার আজিম ঋত্বিক (দশম শ্রেণি)
- নাকিব হায়দার (নবম শ্রেণি)
- ইফতেখার ওমর পিয়াল (দশম শ্রেণি)

খ) **Biology Olympiad:**

- আসিফ জামান (নবম শ্রেণি)-১ম

১৮. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত **Iranian Geometry Olympiad (IGO)** এ ৫০ টি দেশের ১৬১৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৫ তম হওয়ার গৌরব অর্জন করে:

- আহমেদ ইত্তিহাদ হাসিব (দ্বাদশ শ্রেণি)

১৯. ২০-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে Holy Cross College আয়োজিত 17th Inter College Science Festival এ Team Based Quiz চ্যাম্পিয়ন হয় DRMC কুইজ দল। দলের সদস্যরা হলো :

- নাহিয়ান ইমদাদ লামিম (দ্বাদশ শ্রেণি)
- আহনাফ ওয়াজেদ খান (দ্বাদশ শ্রেণি)
- আহমেদ ইত্তিহাদ হাসিব (দ্বাদশ শ্রেণি)

২০. ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত "শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর সম্মেলন-২০১৯" এ চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থিত অভিনয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে :

- এম. এ মুনঈম সাগর (একাদশ শ্রেণি)

উল্লেখ্য, সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে 'শেখ রাসেল পদক-২০১৯' গ্রহণ করে।

২১. ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে Bangladesh University of Professionals কর্তৃক আয়োজিত 2nd BUP National Quiz Carnival এ চ্যাম্পিয়ন হয় :

- নাকিব হায়দার (নবম শ্রেণি)
- আবরার আজিম ঋত্বিক (দশম শ্রেণি)

২২. ০৭-০৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হয় :

- কাজী রেভান (একাদশ শ্রেণি)
- সুভজিত মন্ডল (দশম শ্রেণি)
- তামহিদুল ইসলাম (দশম শ্রেণি)

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কলেজের রাস্তাসমূহের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কুদরত-ই-খুদা হাউস, জয়নুল আবেদীন হাউস, নজরুল ইসলাম হাউস ও ফজলুল হক হাউসের নামাজের কক্ষে ও ডাইনিং রুমে টাইলস স্থাপন করা হয়েছে।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের হাউসমাস্টারের অফিস কক্ষ সংস্কার, আলমারি ও ছাত্রদের ডাইনিং টেবিলের জন্য টেবিল ক্লথ ক্রয় করা হয়েছে।
- আবাসিক ভবন-১, ২, ৩ এর পুরাতন সাব-ডিভিশন ইলেকট্রিক বোর্ড পরিবর্তন করে নতুন সাব-ডিভিশনার ইলেকট্রিক বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-৩ এর নিচতলার কক্ষের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- জাতীয় পতাকা স্ট্যান্ড এবং পারিপার্শ্বিক স্থানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা হয়েছে।
- কলেজের জন্য একটি নতুন ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- কলেজের জন্য ২০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-১ ও ৩ এর জন্য নতুন ডিজিটাল ঘড়ি ক্রয় করা হয়েছে।
- কলেজের জন্য ৫০০ টি প্লাস্টিকের চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।
- কলেজের প্রশাসন ভবনের জানালায় থাই গ্লাস লাগানো হয়েছে।
- কর্মচারীদের কোয়ার্টার সংস্কারের কাজ চলমান।
- কলেজের বিভিন্ন স্থানে সার্চ লাইট লাগানো হয়েছে।
- কলেজের জন্য নতুন ট্রান্সফরমার, এইচটি মিটার ইউনিট ও পিএফআই প্ল্যান্ট ক্রয় করা হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-২ এর চারপাশের বারান্দায় গ্রিল লাগানো হয়েছে।
- কলেজের ছাত্রদের ফিস কালেকশন পেমেন্ট সার্ভিস এর চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জয়নুল আবেদীন হাউসের পুরাতন জলছাদ ভেঙে নতুন জলছাদ নির্মাণ করা হয়েছে।
- জয়নুল আবেদীন হাউসের নামাজের কক্ষ সংস্কার ও ডাইনিং হল রং করা হয়েছে।
- টিচার্স কোয়ার্টার-১, ২ ও ৩ এর সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কর্মচারীদের কোয়ার্টার ১ ও ২ এর সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- নতুন ৬তলা কর্মচারী কোয়ার্টারের ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।

- কলেজের প্রাচীর সংস্কার ও উঁচুকরণের কার্যক্রম চলমান।
- কলেজের মাঠের ঘাস কাটার জন্য ০২টি নতুন মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- কলেজের সভাকক্ষের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজের জন্য নতুন জীপ ক্রয় করা হয়েছে।
- বাহির থেকে আগত অতিথিগণের জন্য অপেক্ষাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রশ্ন ব্যাংক কক্ষের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-১ ও ২ এর টিচার্স কক্ষসমূহের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- DPDC এর সমন্বয়ের মাধ্যমে টিচার্স কোয়ার্টারসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের মেরামত কাজ চলমান।
- শিক্ষাভবন-১ ও ২ এ সততা স্টোর নির্মাণ করা হয়েছে।
- পূর্ব দিকের মেইন গেইট সংলগ্ন অভিভাবক শেড নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফার্নিচার খাত হতে ছাত্রদের জন্য নতুন করে টেবিল, চেয়ার, লকার ও খাট তৈরি এবং পুরাতন টেবিল, চেয়ার, লকার ও খাট মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- টিন দ্বারা ফার্নিচার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।
- কলেজের বটতলার পেইভমেন্ট টালি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজের পুকুরে ৪০০০ মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।
- কলেজের জি-টাইপ কোয়ার্টারে ড্রেনের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-১ এ উপাধ্যক্ষের অফিসের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

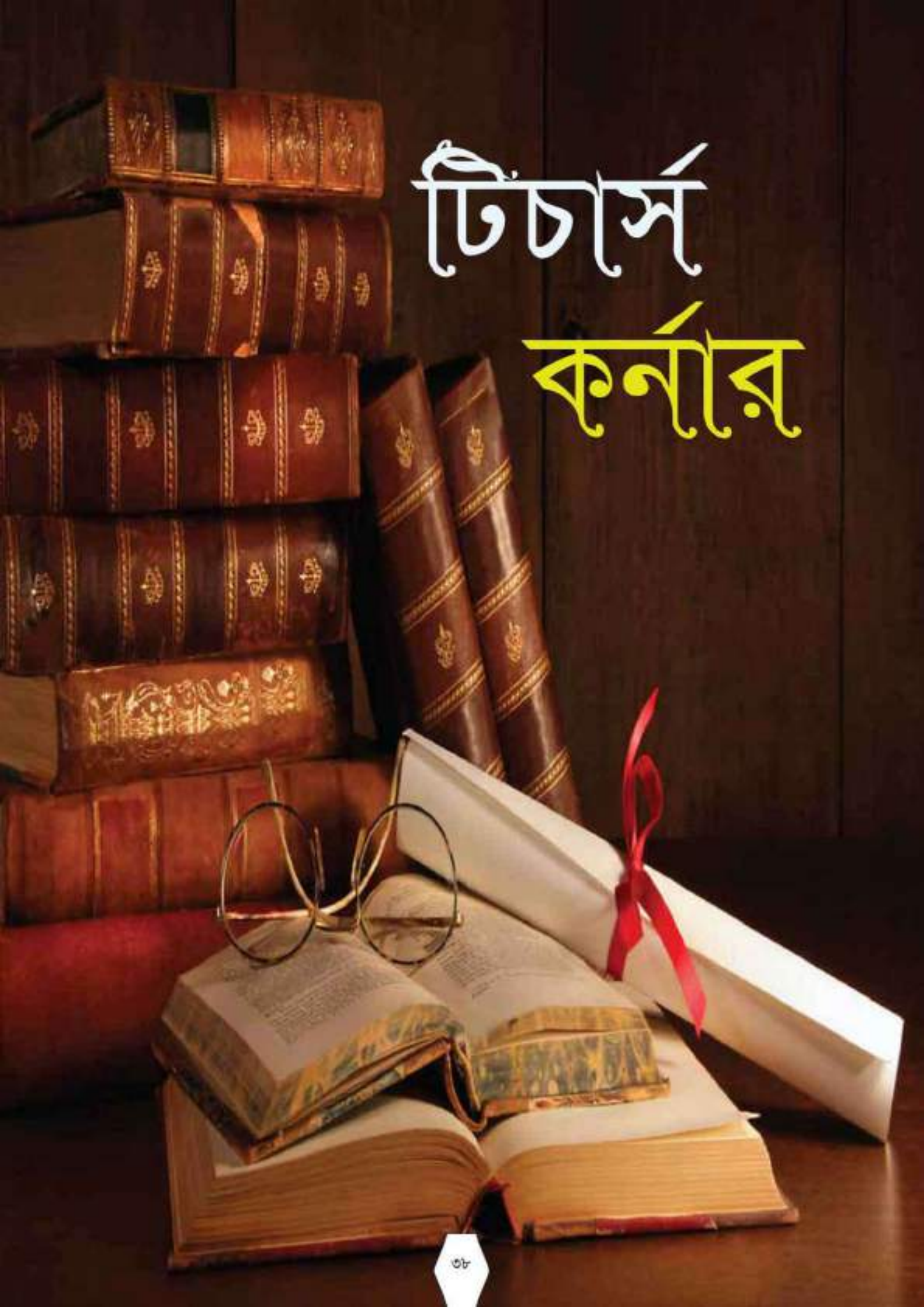

টিচার্স কর্নার

চলো মনে রং লাগাই

মির্জা তানবীরা সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা বিভাগ

মন অকূল আধার! মনে সকল কল্পনার বাস। আর যে কোনো সৃষ্টির মূল শর্ত কল্পনা। কল্পনার পরিধি যত বিস্তৃত, মনের প্রসার তত গতিশীল। মনের গতি বাধাপ্রাপ্ত হলে সৃষ্টির পথ গতি রহিত হয়ে পড়ে। কল্পনার পথ বা পরিসর অপরিমিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার পরিমিতি বোধের আশ্রয় অভিপ্রেত নয়।

কল্পনা যেখানে বাসা বাঁধে তাই মন। এখন মনকে যদি তল ভাবি, আর কল্পনা যদি রং হয় তবে তাই শ্রেয়। এই তবে মনকে রাঙানোর উৎকৃষ্ট উপায় বা সুযোগ। রং বেছে নেয়ার ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে তা প্রয়োগের সহজাত বোধ থাকলেই হয়ে গেল। মন রাঙানোর কাজ অর্ধেক সারা। এবার কল্পনার পরিধিকে ডাকি? ভাবনা, যা কল্পনাকে পরিচালিত করে তাকে অনুসরণ করি।

ভাবনা যা সচেতন, অবচেতন ভাবে মনে এসেই যায়; যার অনেকটাই আমরা প্রকাশে অপারগ হই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভাবনা আমাদের তাড়িত করে। ভাবনাকে গুছিয়ে উপস্থাপনেই সৃষ্টির প্রয়াস। এই ভাবনাগুলোকে কুড়িয়ে কল্পনায় ছড়িয়ে চলো মনকে রাঙাই।

মনে মনে যা ভাবি তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য অদম্য শক্তির দরকার। এই শক্তি আমরা পাব ইচ্ছা থেকে। যদি ইচ্ছা- শক্তি প্রবল করা যায় তবে ভাবনা প্রতীয়মান হয় সহজেই। ইচ্ছাকে গতিশীল বা বেগবান করার প্রত্যয় আমাদের মনের গহীনে সুপ্তভাবে সকলেরই থাকে তবে তাকে জাগ্রত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে অবসর ও প্রকৃতির সাহচর্য প্রয়োজন।

প্রকৃত প্রকৃতি প্রেমিক হওয়া মানে মনের উদারভাব। বিশাল প্রান্তর, প্রসারিত মাঠ, বিস্তীর্ণ গহীন বন, অবারিত সবুজে বিচরণ মনে দোলা দেয় নানান কল্পনা। কোনো কিছু গভীরভাবে অনুভব করতে হলে প্রশস্ত পরিসর অবশ্যম্ভাবী। যত বৃহৎ পরিসর, তত প্রসারিত মনের দখল। মনেও জায়গা বানানো যায়, মনে মনে কথা বলা যায়। সে ভাষা একান্ত নিজস্ব। মন বোঝে, আর বোঝে সে।

আমার ঘরে পরী আসে

রতন সরকার
সহকারী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা বিভাগ

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন রাত দুইটা। মনে হচ্ছে পাশের ঘরে উজ্জ্বল আলো। আমি ঘুমানোর সময় আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম। আমার মনে আছে। তাহলে আলো কেন? এতো উজ্জ্বল আলো? আস্তে করে উঠে পাশের ঘরের দরজাটা ধাক্কা দিলাম। না। আলো নেই। সারা ঘর অন্ধকার। গভীর কালো অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। গন্ধ, মিষ্টি একটা গন্ধে সারা ঘর ভরে আছে। এমন সুন্দর গন্ধ এর আগে কখনো পাইনি। মনে হচ্ছে কেউ যেন এসেছিল। গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। জানালাটা খুলে বাহিরে তাকালাম। না, কেউ নেই। একটা দমকা হাওয়া এসে লাগলো। পরিষ্কার আকাশ। হালকা কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা পেজা তুলোর মত মেঘ উড়ে যাচ্ছে। তারা, অনেক তারা সারা আকাশ জুড়ে। সপ্তমীর চাঁদ। মাঝে মাঝে মেঘগুলো তারাদের ঢেকে দিচ্ছে আবার সরে যাচ্ছে। জানালা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এলাম। এপাশ ওপাশ করলাম সারা রাত। ঘুম আর এলো না।

নূপুরের শব্দ। ঘুম ভেঙে গেল। বালিশের নিচ থেকে ঘড়িটা নিয়ে দেখলাম রাত দুইটা। গতকাল রাতের কথা মনে পড়লো। পাশের ঘরের দিকে তাকালাম। উজ্জ্বল একটা আলোর আভা। নূপুরের শব্দটাও পাশের ঘর থেকেই আসছে। মনে হচ্ছে পাশের ঘরে কেউ যেন নূপুর পরে নাচছে। আস্তে করে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুললাম। উজ্জ্বল আলো। অসম্ভব সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ। একজন অপরূপা সুন্দরী নাচছে। পায়ে নূপুর পরা। এমন সুন্দরী নারী আমি আগে কখনো দেখিনি। মনে হয় এ জগতের কেউ নয়। অন্য কোন গ্রহ বা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। আমাকে দেখামাত্র নাচ থামিয়ে দিল। এক পা এক পা করে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে সব বোধ হারিয়ে ফেলেছি যেন। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "কে তুমি?" সে এগিয়ে চলল, বললাম, "দাঁড়াও, যেও না, কে তুমি? দাঁড়াও। যেওনা।" সে নিমিষেই মিলিয়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। উজ্জ্বল আলোটা আর নেই। পুরো ঘর অন্ধকার। তবে মিষ্টি গন্ধটা আছে সারা ঘর জুড়ে। এগিয়ে গিয়ে জানালাটা খুললাম। আজ আকাশ মেঘে ঢাকা কোথাও কোন তারা নেই। চাঁদও নেই। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া এসে লাগল মুখে। হাওয়ার সঙ্গে বিন্দু বিন্দু জলকণা ছড়িয়ে গেল মুখে। হালকা হালকা ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। বিছানায় ফিরে এলাম।

রাত দুইটা ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গন্ধ। নূপুরের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। আমার ভয় করতে লাগল। কে এই নারী? কেন প্রতি রাতে আমার ঘরে আসে? এত গভীর রাতে এমন রূপবতী নারী? কেন? কী চায় সে আমার কাছে? সাহস সঞ্চয় করে উঠে গেলাম। পাশের ঘরের দরজা খুললাম। ঘরের মাঝখানে বসে আছে গত রাতে দেখা সেই অপরূপা সুন্দরী। তার রূপের আলোয় সারা ঘর উজ্জ্বল হয়ে গেছে। শরীর থেকে ভেসে আসছে সুন্দর মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছি সেই রূপবতীকে। কিন্তু বলার মত ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। এবার মেয়েটি আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসলো। বললাম, "কে তুমি?"

সে ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলো। ভয়ে ভয়ে কয়েক পা এগিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সে বলল, "বসো।" আমি তার মুখোমুখি বসলাম। সে বলল, "আমি পরী। আমার নাম লিলিথ। আমি পরীদের দেশ থেকে এসেছি।" পরী? আমার ঘরে পরী? আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম লাঠি বা এই জাতীয় কিছু একটা। যদি আক্রমণ করে! তবে তো আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন এসেছো?"

: এমনি।
: আমার ঘরে কেন এসেছ?
: ভয় পেয়ো না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তুমি খুব ভালো।
: আমার ভেতর ভালোর কী দেখলে?

: তুমি ছবি আঁক, বাঁশি বাজাও, কবিতা লেখ। তোমার ছবি আমার খুব ভালো লাগে। তোমার রঙ ও রেখা আমাকে নাড়া দেয়। তোমার ছবি দেখতে চুপি চুপি তোমার ঘরে আসি। কখনো কখনো মনের আনন্দে নাচি তোমার ঘরে। লিলিথ উঠে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটি পেইন্টিং এর সামনে দাঁড়ালো। আমার মাথাটা কাজ করছে না। আমি ভাবতেই পারছি না, আমার ঘরে পরী! এত রূপবতী পরীদের কথা গল্পে পড়েছি।

কিন্তু আজ আমার ঘরে সত্যিকারের পরী! প্রায় প্রতিদিন গভীর রাতে আসে। কিছুই ভাবতে পারছি না, আমি এখন কী করব? লিলিথ ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, "আজ আসি।" আমি কিছু বলার আগেই দরজার দিকে পা বাড়ালো। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পরী, সারা ঘর জুড়ে রয়ে গেল অসম্ভব সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ।

নূপুরের শব্দ। রাত দুইটা।
আমাকে দেখে নাচ থামালো লিলিথ।
তোমার দেশ কোথায়?
: আকাশপুরীতে।
: তোমাদের দেশ কেমন?
: অনেক সুন্দর।
: অত দূর থেকে কেমন করে আস তুমি?
: ডানায় ভর করে।
: তোমার ডানা কোথায়?
: যখন তোমার ঘরে আসি তখন গুটিয়ে রাখি। এই যে দেখ আমার ডানা।
লিলিথ আমার দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। সত্যিই তার পিঠে দুটো ডানা।
: আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের দেশে? তোমাদের দেশ দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

: তুমি কী করে যাবে। তোমার তো ডানা নাই। আর তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের দেশে মানুষদের যাওয়া মানা। পরীরানি দেখতে পেলে মেরে ফেলবে।
: তোমাদের দেশ দেখতে খুব ইচ্ছে করে আমার।
: আচ্ছা ঠিক আছে। একদিন চুপি চুপি তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের দেশে। সাবধানে থাকতে হবে, পরীরানি যেন দেখতে না পায়।

: কী করে যাব? আমার তো ডানা নেই।
: তুমি চিন্তা করো না। আমি পঙ্খিরাজ ঘোড়া নিয়ে আসবো। আমাদের দেশে অনেক পঙ্খিরাজ ঘোড়া আছে। অনেক মজা হবে। পঙ্খিরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে তুমি আর আমি উড়ে উড়ে আমাদের দেশে চলে যাব।
: কবে নিয়ে যাবে?
: পরশু! পরশু রাতে আমি পঙ্খিরাজ নিয়ে আসবো।

কিছুতেই মন বসছে না। একটা উত্তেজনা। পরীদের দেশে যাব। কখন রাত দুইটা বাজবে। সময় আর কাটতে চায় না। মাথায় হাত দিয়ে চুলের মধ্যে কে যেন বিলি কেটে দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, লিলিথ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। রূপের আলোয় ভরে গেছে ঘর। মাতাল করা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে উড়ে চলেছে পঙ্খিরাজ। আমি লিলিথকে জড়িয়ে ধরে বসে আছি পঙ্খিরাজের উপর পঙ্খিরাজ চালাচ্ছে লিলিথ। মেঘের মধ্য দিয়ে, হরেক রঙের মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে পঙ্খিরাজ। ঝিকিমিকি অনেক তারাদের পেছনে ফেলে এক আকাশ পেরিয়ে আরেক আকাশের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছি আমরা। আমি অনেক রঙিন মেঘ আর তারা দেখতে দেখতে আনন্দে আর শিহরণে ভেসে যাচ্ছি। এমন সময় লিলিথ বলল, 'আমরা প্রায় চলে এসেছি। ঐ যে সামনে আমাদের দেশ। একটা ফুল বাগানের ভিতর এসে নামলাম আমরা। চারিদিকে অনেক ফুল। কী সুন্দর সেই সব ফুলের রঙ আর গন্ধ! হাজার হাজার নাম না জানা ফুল। হরেক রঙের প্রজাপতি। অনেক, অনেক রঙবাহারী প্রজাপতি উড়ছে চারিদিকে। পাখি। রঙ বেরঙের কত যে বাহারী পাখি! এত সুন্দর সুন্দর পাখি আমাদের দেশে দেখিনি কখনো। মনে হচ্ছে ফুল, পাখি আর প্রজাপতির দেশে এসে পড়েছি। লিলিথকে বললাম, "তোমাদের দেশের ফুল, পাখি, প্রজাপতি, গাছ সবকিছু এত সুন্দর!" লিলিথ আমার দিকে তাকিয়ে শুধু মিষ্টি করে হাসলো। পাশে দাঁড়ানো ছিল পঙ্খিরাজ। লিলিথ বলল, 'পঙ্খিরাজ তুই যা।' পঙ্খিরাজ চলে গেল। আমাকে বলল, "তুমি এখানে থাক।" ঘুরে ঘুরে চারিদিকে দেখ। আমি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। সাবধান! লুকিয়ে লুকিয়ে, গাছের আড়াল থেকে সব দেখবে। পরীদের কেউ যেন তোমাকে দেখে না ফেলে। কেউ দেখে ফেললে তোমাকে বাঁচানো যাবে না। পরীরানি তোমাকে মেরে ফেলবে।

লিলিথ খাবার আনতে চলে গেল। আমি ফুলগাছের ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম পরীদের দেশ! আহ! কী সুন্দর। রাস্তাগুলো সব পরিষ্কার কোথাও কোন ময়লা নেই। রাস্তার দু'পাশে ফুল গাছের সারি। একটা লেক, লেকের জলে অনেক জলজ ফুল ফুটে আছে। লেকের এক পাশে পরীদের ঘর। কী সুন্দর সেই সব ঘরের ডিজাইন আর কী সুন্দর রঙ করে সাজানো! এক পাশে ছোটদের খেলার মাঠ। ছোট ছোট পরীর বাচ্চারা খেলছে সেখানে। পাশেই একটা ঝর্ণা। অবিরাম ঝরছে ঝরঝর জল। আমি দেখতে দেখতে কখন যে সামনের রাস্তায় চলে এসেছি ভুলে গেছি। কে যেন পেছন থেকে হাত ধরে টান দিল। চমকে উঠে ফিরে দেখি, লিলিথ। "তোমাকে না লুকিয়ে থাকতে বলেছি? ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছো কেন? এদিকে এসো।" ঝোপের আড়ালে ফুল বাগিচার মধ্যে আমাকে বসালো। ওর হাতে একটা পাত্রে অনেক খাবার।

আমি বললাম দুঃখিত, লিলিথ রাগ করে বলল, "তোমাদের, মানে মানুষদের এই একটা বড় দোষ। ভাল কথা শুনবে না, মানবে না, আর শুধু বলবে, দুঃখিত। নাও এবার খাবার খাও। খাবারের পাত্রটা আমার সামনে রাখলো। আহ কী সুন্দর গন্ধ! একটা মিষ্টি মুখে দিলাম। কী অপূর্ব স্বাদ! "লিলিথ! এ কী করেছ তুমি! এ কে? তুমি আমাদের দেশে মানুষকে নিয়ে এসেছে!" তাকিয়ে দেখি আমাদের চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জন পরী। কারো পোশাক লাল, কারো নীল, কারো হলুদ।

এরা হয়তো লালপরী, নীলপরী হবে। চল রানির কাছে। লিলিথ কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু নীল পরীরা তা বলার সুযোগ দিল না। সিংহাসনে বসে আছেন মহারানি পরী। সোনার তৈরি প্রাসাদ, বিচিত্র তার কারুকাজ কোথাও কোথাও হীরকখচিত। আমরা এত সুন্দর কারুকাজ করতে পারি না। কে তুমি? পরীরানি প্রশ্ন করলেন। লিলিথ কিছু বলতে চাচ্ছিল। তুমি চুপ কর। "মহারানি ধমক দিলেন।" আমি বললাম, আমি মানুষ। পৃথিবী থেকে এসেছি। আমার দেশ বাংলাদেশ। মহারানি রেগে বললেন, আমাদের দেশে কেন এসেছো? আমাদের দেশে মানুষের প্রবেশ নিষেধ। তা তুমি জান না? বললাম,"জানি, জানি, মহারানি।" মহারানি আরো রেগে গিয়ে বললেন, "জানার পরেও কেন এসেছো?" বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার এত সুন্দর দেশ দেখার লোভ সামলাতে পারিনি। লিলিথের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? মহারানি জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, সে আমার বন্ধু। খুব ভাল বন্ধু।

: তুমি কী কর?
: মহারানি, আমি চিত্রকর ।
: কীসের ছবি আঁকতে পার তুমি?
: মহারানি আমি ফুল, পাখি, গাছ, নদী, মানুষ পশু-পাখি সব কিছুরই ছবি আঁকতে পারি।
: আচ্ছা।

পরীরানি একটু নরম হলেন। বললেন তোমাকে একটা সুযোগ দিতে পারি। আমার একটা প্রতিকৃতি আঁকতে হবে। যদি সেটি আমার পছন্দ হয় তা হলে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। তা না হলে মানুষ হয়ে আমাদের দেশে ঢোকার অপরাধে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আমার চাহিদা মত ক্যানভাস, রঙ, তুলি সব দেওয়া হলো। লিলিথকেও আমার পাশে থাকার অনুমতি দিলেন মহারানি। আমি বললাম, 'মহারানি সময় লাগবে। আর আপনাকে মডেল দিতে হবে। আমি চেষ্টা করব।' ছবি আঁকা শেষ হওয়ার পর মহারানি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমার বুক কাঁপছে। কী বলবেন মহারানি, কী হবে আমার? অনেকক্ষণ পর মহারানি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "সুন্দর, সুন্দর হয়েছে মেয়েরা, কী বল তোমরা?" সেখানে উপস্থিত সব পরীরা বলল, 'সুন্দর'। একজন বলল, "আপনার ছবি আপনার থেকেও সুন্দর হয়েছে রানিমাতা।" পরীরানি তাঁর মাথার মুকুট থেকে একটা হীরকখণ্ড খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার কাজ দেখে আমি খুশি হয়েছি চিত্রকর। এটা আমার প্রাসাদে টাঙানো থাকবে। আর এই নাও তোমার পুরস্কার। তোমাকে মুক্তি দিলাম। এখন দেশে ফিরে যাও।" লিলিথ পাশেই দাঁড়ানো ছিল। মহারানি লিলিথকে বললেন, "যাও, ওকে ওর দেশে পৌঁছে দিয়ে এসো।" রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আমি আর লিলিথ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি দুজন। অসম্ভব সুন্দর প্রকৃতি আর মনোহর দৃশ্য। একটা নীল রঙের পাখি লিলিথের ঘাড়ে বসে ওকে আদর করে উড়ে গেল। আমি লিলিথ কে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের দেশটা এত সুন্দর কেন লিলিথ?" লিলিথ বলল, "আমাদের দেশে কেউ মিথ্যে কথা বলে না।"

জ্বরে করণীয়

এহতেশাম লালন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জ্বর কোনো রোগ নয়; রোগের উপসর্গ মাত্র। দেহের অভ্যন্তরে অন্য কোনো রোগের কারণে উপসর্গ হিসেবে জ্বর দেখা দিতে পারে। Oxford Dictionary অনুযায়ী Fever means a higher than normal body temperature of a person usually caused by disease অর্থাৎ দেহের তাপমাত্রা রোগের কারণে স্বাভাবিকের (৯৮.৪°F) চেয়ে বেশি হওয়াকে জ্বর বলে। তবে অধিকাংশ জ্বরই শরীরের জন্য বড় রকমের কোনো সমস্যা তৈরি করে না বরং উপকারী । Most fever is beneficial, causes no problems and helps the body fight of infections.[১]

অধিকাংশ জ্বর যেমন- করোনা ভাইরাস জ্বর, ডেংগু, চিকনগুনিয়া, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সাধারণত একিউট শ্রেণির হয়। ক্রনিক রোগীরও উত্তেজক কোনো কারণে জ্বর দেখা দিতে পারে।[২] একই আবহাওয়ায় বা পরিবেশে কিংবা একই খাবার খেয়ে সব লোক একই রোগে এক সাথে আক্রান্ত হয় না। রোগে আক্রান্ত হওয়া তার রোগ প্রবণতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তির বর্তমান শারীরিক অবস্থা যদি তার চারপাশের পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারে এবং তাতে শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হয় তখনই তার শরীরে জ্বর কিংবা অন্য কোনো একিউট রোগ দেখা দিতে পারে।[৩] সাধারণত শারীরিক অনিয়ম; যেমন- বৃষ্টিতে ভেজা, বেশি সময় ধরে গোসল করা, বর্ষার নতুন পানিতে গোসল করা, রোদ লাগানো, অতিরিক্ত গরমে থাকা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত জাগা, ঘর্মাক্ত অবস্থায় গোসল, ঠান্ডা লাগানো, শারীরিক বা মানসিক আঘাত প্রভৃতি কারণে জ্বর হতে পারে।[৪]

জ্বরে শুধু ওষুধের ওপর নির্ভর না করে ভালো খাদ্যের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন।[৫] অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে জ্বর চাপা দেয়ার কারণে প্রায়শই জ্বরের পর মাথাব্যথা, খাদ্যে অরুচি এবং কাজ-কর্মে বিরক্তি দেখা দেয়। উপশমদায়ক চিকিৎসা সাময়িকভাবে উপশম দিলেও দীর্ঘমেয়াদি ভাবে সোরার সংমিশ্রণে রোগ জটিলতার সৃষ্টি করে এবং তা স্থায়ীরোগে রূপান্তর হওয়ার সুযোগ পায়।[৬] ঠিক নিয়মে ওষুধ না খেলে জীবন রক্ষাকারী ওষুধই জীবননিনাশকারী বিষে পরিণত হতে পারে।[৭] নিরাময়ের উপযোগী না হলে অনেক সময় ওষুধই রোগকে জটিল করে তোলে।[৮] এতে করে শরীরে অনেক বড় রোগ বাসা বাধে। ফলে লিভার, কিডনি, হার্ট, ফুসফুস ব্রেইনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আক্রান্ত হয়। এসব রোগীর রোগ বিবরণীতে প্রায় সময় জ্বর চাপা দেয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় এবং সে জ্বরের লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে ওষুধ দিলে মাথাব্যথাসহ লিভার, হার্ট, কিডনির ন্যায় অন্যান্য কঠিন রোগও ভালো হতে দেখা যায় ।

এক রোগের পরিবর্তে আর এক রোগ ধরিয়ে দেয়া চিকিৎসা নয়, রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলাই হলো চিকিৎসা। মনে রাখতে হবে, ওষুধ রক্তে মিশ্রিত না হলে তা কার্যকরী হয় না। কৈশিক নাড়ী (Capillar) সূক্ষ্ম হওয়ায় তা স্থূল মাত্রার ওষুধ গ্রহণ করতে অক্ষম।[৯] আরোগ্যের জন্য প্রকৃত ওষুধের এক/দুই মাত্রার বেশি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় না।[১০] জ্বর হলে মৌসুমীফল বিশেষ করে টাটকা টক ফল যেমন-আমড়া, পেয়ারা, জাম্বুরা, আনারস, লেবু ইত্যাদির রস বা জুস ঘনঘন খাওয়াতে হবে। এর সঙ্গে মধু, তুলসী পাতার রস, শসা ও টমেটো খাওয়ানো যেতে পারে।[১১]

জ্বরে করণীয়:

- জ্বর আসে জাহান্নামের ধোঁয়া হতে। সুতরাং তাকে পানি দ্বারা শীতল করো। (বুখারি ও মুসলিম)
- প্রয়োজনে পানি দ্বারা হাত-পা-শরীর আলতোভাবে স্পঞ্জ করে দিতে হবে।
- শিশুবাচ্চাকে বুকের সঙ্গে কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখতে হবে।
- মাথাব্যথা থাকলে মাথায় পানি দিতে হবে ও দীর্ঘক্ষণ সিজদারত থাকতে হবে।
- স্যালাইন পানি ও মৌসুমী ফলসহ সকল সহজপাচ্য খাবার খেতে দিতে হবে।
- প্রয়োজনে বিশ্রামসহ দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ খেতে হবে।

তথ্য সূত্র:

১. www.medicalnewstoday.com
২. ডা. মো. শারফুল আলম: হোমিওপাথিতে জ্বর চিকিৎসা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ১৮
৩. ডা. মো. শারফুল আলম: হোমিওপাথিতে জ্বর চিকিৎসা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ১৫
৪. ডা. মো. শারফুল আলম: হোমিওপাথিতে জ্বর চিকিৎসা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ১৫
৫. ডা. এ. এন. এ মোসেন : আধুনিক এলোপাথিক চিকিৎসা, পৃ. ৪২
৬. ডা. মো. শারফুল আলম: হোমিওপাথিতে জ্বর চিকিৎসা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ২২
৭. ডা. এবিএম আবদুল্লাহ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
৮. ডা. মো. শারফুল আলম: হোমিওপাথিতে জ্বর চিকিৎসা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ১৫
৯. ডা. আবু হোসেন সরকার : বায়োকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা, পৃ. ১৪
১০. সামুয়েল হ্যানিমান, অর্গানন অব মেডিসিন, অনুচ্ছেদ ১৫৪
১১. ন্যাচারোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র।

প্রেক্ষাপট

ড.রুমানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রেক্ষাপট : ১

স্বপ্না টেবিলের উপর এতগুলো বই ছড়িয়ে রেখেছো কেন? মায়ের প্রশ্নের জবাবে স্বপ্ন বলে যে তার অনেক পড়া। কীভাবে এত পড়া পড়বে? তাই সব বই টেবিলের উপরে এনে রেখেছে। মা পাশে বসে স্বপ্নকে বুঝিয়ে বললেন যে, যখন টেবিলের উপর অনেক বই থাকবে তোমার মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়বে। মস্তিষ্ক সারাক্ষণ ভাববে অনেক পড়া, কোনটা রেখে কোনটা পড়বে। এতে পড়া শেষ হতে দেরি হবে। কিন্তু যদি তোমার সামনে শুধু একটাই বই থাকে তাহলে মস্তিষ্ক ভাববে অল্প পড়া এবং মস্তিষ্কে চাপ কম হবে। এতে করে পড়া দ্রুত হয়ে যাবে। স্বপ্ন মায়ের কথামত সব বই গুছিয়ে সেলফে রেখে দিল আর একটি বই সামনে নিয়ে পড়তে বসল। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারলো মা আসলেই সত্যি বলেছেন। সে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো। মা স্বপ্নকে আদর করে দিলেন।

প্রেক্ষাপট : ২

অ্যাসেম্বলিতে শপথ পাঠ করানো হচ্ছে। কেউ কেউ এক হাত সামনে বাড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু অন্য হাত সাবধান পজিশনে রেখে পেছনে রেখে দিয়েছে। কেউ আবার মুখ, ঘাড় চুলকাচ্ছে। দূর থেকে রুমানা ম্যাডাম ব্যাপারটি লক্ষ করছিলেন। এরপর জাতীয় সঙ্গীত গাইবার পালা এলো। এবারও ছেলেরা কেউ কেউ সাবধান পজিশনে না থেকে নড়াচড়া, গল্প, চুলকানি, হাই তোলা, হাত পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত। ম্যাডামের খুব রাগ হচ্ছিল। অ্যাসেম্বলি শেষ হতেই ম্যাডাম গিয়ে ছেলেগুলোকে ধরলেন। প্রথমে খুব করে বকা দিলেন। পরে তাদের বুঝিয়ে বললেন যে, জাতীয় সঙ্গীতকে অবমাননা করার অর্থ দেশকে অসম্মান করা। দেশ মানে মা। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে রাখতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর মতো।

আর শপথ হলো পবিত্র কিছু বাক্য। যা হলো প্রতিজ্ঞা। তাই এই দুই সময়ে খুব সচেতনতার সাথে, যথাযথভাবে কাজগুলো করতে হবে। ছাত্ররা প্রথমে বকা খেয়ে মন খারাপ করলেও পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারলো। তারা ম্যাডামের কাছে ক্ষমা চাইল এবং আর কোনোদিন এমনটি করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলো।

প্রেক্ষাপট : ৩

আগামীকাল সৃজিলার জন্মদিন। কোন জামাটা যে পরবে বুঝতেই পারছে না। রোদেলা হেসে দিয়ে সৃজিলাকে বললো, আমার বাইরে যাবার কেবল দুটো জামা রয়েছে। আমাকে এত চিন্তা করতে হয় না। যে কোনো জিনিস বেশি থাকলে সবসময় বেশি চিন্তা করতে হয়। কারণ অপশন বেশি থাকে। বেশি অপশনের ভেতর পছন্দ করতে গিয়ে ব্রেনকে বেশি খাটাতে হয়, এতে উইল পাওয়ারের ক্ষয় হয়। দেখিস না স্টিভ জবস্ বা মার্ক জুকারবার্গ সবসময় একটাই কাপড় পরেন, যাতে সবসময় মস্তিষ্কের ক্ষয় কম হয়। কারণ এটা তাদের মিনিমালিস্ট থিঙ্কিং। এটাকে বলে মিনিমাল জীবন। মিনিমাল জীবন তোকে উইল পাওয়ার ধরে রাখতে হেল্প করবে। যেহেতু তুই তোর জন্য অপশন কমিয়ে আনছিস, অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে তুই তোর খুব গুরুত্বপূর্ণ এই রিসোর্সকে নষ্ট করছিস না। সৃজিলা বললো, সত্যি বলতে কী, আমি এতদিন ভাবতাম তোর বাবার এত টাকা, তাও তুই সবসময় ঘুরে-ফিরে দুটো ড্রেসই পরিস কেন? আজ বুঝলাম, সত্যিটা। রোদেলা আবারও হাসলো। সে বললো, আমি কিন্তু জামা চেঞ্জও করি। ৬ মাস পর পর। তখন আগেরগুলো গরিবদের দিয়ে দেই। আজ যেন রোদেলাকে নতুন করে আবার সৃজিলা দেখলো। সে বুঝলো তার অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন।

প্রেক্ষাপট : ৪

সাবেরা ম্যাডাম রানী ম্যাডামকে ফেসবুক সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি তার আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছেন। কেনো, জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার মেয়েও যেন পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে মোবাইল দেখে, ফেসবুক ব্যবহার না করে। তিনি মেয়েকে লেখাপড়ায় মনোযোগী করার জন্য নিজেই নিজের ফেসবুক আইডি ডিঅ্যাকটিভেট করে দিয়েছেন। অন্যরা যারা শুনেছিলেন সবাই সহমত প্রকাশ করলেন এ বিষয়ে। আর সাবেরা ম্যাডামকে অভিনন্দিত করলেন। আসলে এই যে ভার্চুয়াল ভাইরাস-এটা একটা নেশা। এখন মানুষ হেরোইন, মরফিন খায় না। শিক্ষিত-মূর্খ সবাই এই ভার্চুয়াল ভাইরাস নামক নেশায় আক্রান্ত। বাচ্চারা এতে আক্রান্ত হয়ে লেখাপড়া শিকেয় তুলছে। রাতে দেরি করে ঘুমায়, সকালে স্কুল-কলেজে পৌঁছাতে দেরি

হয়ে যায়। কারণ ঘুম থেকে যথাসময়ে উঠতে পারে না। মোবাইলে হাত দিলে হাত আর চোখ কিছুই সরানো যায় না। বড়দের জন্যই কঠিন, ছোটরা তো আরও একধাপ এগিয়ে। শিক্ষক মিলনায়তনে তখন বেশ কয়েকজন শিক্ষক সাথে সাথে তাদের সন্তানদের কথাও মনে করলেন। তারাও তাদের ফেসবুক আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা বুঝতে পারলেন ভার্চুয়াল ভাইরাসের এই করালগ্রাস থেকে শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর তা হলেই সামাজিক বিভিন্ন অবক্ষয় দূর হবে।

প্রেক্ষাপট : ৫

জিবিয়ান রিহাতকে বলছে, কিরে রিহাত, তুই দেখি DRMC Hair Cut দিয়েছিস? আমাকে দেখ কত সুন্দর স্টাইল করে চুল রেখেছি। রিহাত হেসে দিয়ে বললো, দেখতেই তো পাচ্ছি আরেকটু বড় হলে ঝুঁটি করা যেতো। আসলে চুল ছোট রাখতে রাখতে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন চুল না কাটলে কেমন নোংরা জংলী জংলী মনে হয়। কলেজে পড়া অবস্থায় ঠিকই চুল বড় রাখতে চাইতাম । হয়তো নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে বেশি ইচ্ছা করতো। কিন্তু এখন নিজের ইচ্ছাতেই চুল ছোট রাখি। এটা স্বাস্থ্যকরও। আর স্মার্টও লাগে। জানিস, কলেজের কথা খুব মনে পড়ে। আমাদের শিক্ষকরা কত যত্ন করে আমাদের পড়াতেন, পড়াতে চাইতেন। আর আমরা কী দুষ্টুমিটাই না করতাম। তুই একদিন ক্লাসে রাবারে কাগজ ঢুকিয়ে তীর ছুঁড়লি সজল স্যারের ক্লাসে। আর স্যারের কী রাগ! মনে আছে? এখন মনে পড়লে খুব অপরাধী মনে হয় নিজেকে। হুম। তখন যদি ক্লাসে আরেকটু মনোযোগী হতাম আজ তোর মতন ডাক্তার হতাম। DRMC কে, কলেজ জীবনটাকে খুব মিস করি রে। আমিও করি। জিবিয়ান এবং রিহাত নস্টালজিক হয়ে যায়। কত শত স্মৃতি এসে যে ভিড় করে তাদের মাথায়!

প্রেক্ষাপট : ৬

বাসের সব যাত্রী নেমে গেছে। একটিমাত্র মেয়ে সিটে বসে আছে। কন্ডাক্টর এবং ড্রাইভার একে অন্যের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। হঠাৎ করেই ড্রাইভার মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁক নিয়ে ছোট নির্জন একটি রাস্তায় বাস নিয়ে ঢুকে পড়তেই থেমে যায়। তার চোখে তৃষ্ণা। কিন্তু কন্ডাক্টর মেয়েটিকে পালাতে সাহায্য করে। তার ভেতরের ভালো মানুষটা তাকে নির্দেশ দেয় মেয়েটিকে পালাবার জন্য।

এই তো আমাদের জীবন। টুকরো টুকরো ঘটনা, স্মৃতি আর কথা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। এ জীবন থেকে শেখার অনেক কিছু রয়েছে। আমরা কেউ শিখি, কেউ-বা উপেক্ষা করি। কোন পথটি বেছে নেবো-সেটা আমাদের নিজস্ব পছন্দ।

লক্ষ্য

ড. রুমানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যতনে রতন মিলে
অযতনে মিলে ক্ষয়,
সত্যে সাহস বাড়ে
মিথ্যা বাড়ায় ভয়।

সুশিক্ষা নিলে হয়
চরিত্র নির্মল,
কুশিক্ষা পেলে হয়
চরিত্র দুর্বল।

মনোযোগী হয়ে যারা
লেখাপড়া করে খুব,
মনোযোগী নয় যারা
দিতে পারে খাড়াডুব।

লক্ষ্যতে থেকো সবে
প্রত্যয়ে অবিচল,
মানুষ হবার তরে
রেখো তুমি বুকে বল।

সত্যেরে বুকে নিয়ে
চরিত্র তুলে ধরো,
বিশ্বাস রেখে মনে
নিজেকে মানুষ করো।

প্রতিদান (সত্য ঘটনা)

সাবরিনা শারমিন
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ

মানুষের জীবনে মনে রাখার মতো অনেক ঘটনা থাকে। অনেক বড় কিছু ঘটনা মানুষ যেমন মনে রাখে, অনেক ছোট ছোট ঘটনাও মানুষের স্মৃতিতে দাগ কেটে যায়। যা কোনোদিন ভোলা যায় না। আজ আমি যে গল্পটি লিখতে যাচ্ছি তা পড়ে অনেকের কাছে হয়তো তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু আমার জীবনে অনেক বড় একটি শিক্ষামূলক ঘটনা।

আমার চাকরি জীবনের শুরু থেকেই আমি অনেক দূর থেকে যাতায়াত করি। শুরু থেকে আমি বাসে অথবা সিএনজি করে যাতায়াত করি। তখন কলেজের পশ্চিম গেইট থেকে বাসে গুলশান-১ নম্বর পর্যন্ত যাওয়া যেত। এরপর বাকিটা পথ রিকশা করে বাসায় পৌঁছাতাম। প্রতিদিন যাতায়াত বাবদ আমার কমপক্ষে একশত পঞ্চাশ থেকে দুইশত টাকা লেগে যেত। বাসের জন্য প্রতিদিন কলেজের পশ্চিম গেটের বাইরে অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতে হতো। কারণ বাসের সংখ্যা ছিল সীমিত। নিরাপত্তার জন্যই আমি বাসে করে যাতায়াত করতাম। মজার বিষয় হলো প্রায়ই একজন ছোটখাটো বয়স্ক মহিলা খুব মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াতো। কখনো আমার কাছে কিছু চাইতো না। আমি যখন যা পারতাম (দশ/বিশ টাকা) তাঁর হাতে দিতাম। সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিত ও দোয়া করত। আমার খুব ভালো লাগতো। মাঝে মাঝে কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকতো। অনেক দিন পর দেখা হলে আমাকে অনেক দিন কেন দেখেনি প্রশ্ন করত।

২০১৩ বা ২০১৪ সালের ১লা জানুয়ারির ঘটনা। ঐদিন কলেজে জাতীয় পর্যায়ের বই উৎসব ছিল। সারাদিন অনেক ব্যস্ততায় কেটেছে আমাদের সকলের। ফেরার সময় হল, এদিকে আমার পকেটের টাকা শেষ। কোনরকমে বাসায় পৌঁছে বিশ/তিরিশ টাকার মত থাকবে। পরের দিন কলেজে যাওয়ার টাকা হবে না। ঐদিন যেহেতু মাসের প্রথম দিন, সেহেতু ব্যাংকে অনেক ভিড় থাকবে। টাকা তোলা সম্ভব নয়। পরের দিন টাকা তুলতে পারব। আর তখন তো ডেবিট কার্ডের এত প্রচলন ছিল না। আমার স্বামী কর্মসূত্রে ঢাকার বাইরে থাকেন। কাজেই টাকা জোগাড় করা কঠিন। যদিও আমার শাশুড়ি, ননদসহ একসাথে থাকি, তবুও তাদের কাছে কখনও টাকা ধার চাওয়াটা লজ্জাজনক মনে হচ্ছিল। কাজেই পরের দিন কলেজে আসার মত টাকা লাগবে। আগেই বলেছি আমার কাছে যা টাকা আছে তা দিয়ে পরের দিন কলেজে আসা কঠিন হবে। তবুও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। এই সময় সেই বয়স্ক মহিলা একটা হাসি দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না। আমি দশ টাকা তার হাতে দিলাম। যথারীতি তিনি আমাকে অনেক দোয়া করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বাস আসলে আমি বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। কী করব ভাবছিলাম।

রাতে বাসায় কী মনে করে আমি আমার ব্যাগটা খুললাম। আশ্চর্য! ব্যাগ খুলেই আমি অবাক হয়ে দেখি ১০০ টাকার একটি ভাঁজ করা নোট আমার ব্যাগের ভিতরে। আমার শরীর কিছুক্ষণের জন্য হিম হয়ে আসল। কারণ, আমি ভুল করেও কখনো এভাবে টাকা রাখি না। আমি আমার ওয়ালেটে নির্দিষ্ট পকেটে আলাদা আলাদা নোট গুছিয়ে রাখি। শত তাড়াহুড়ো থাকলেও আমি টাকা নির্দিষ্ট স্থানে রাখি। অনেক চেষ্টা করেছি মনে করার, কিন্তু মনে করতে পারলাম না টাকাটা কোথা থেকে এলো। মনে মনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। কারো কাছে ধার করার প্রয়োজন হলো না। পরের দিন কয়েকজন সহকর্মীর কাছে জানতে চাইলাম। কেউ আমাকে কোনো টাকা দিয়েছে কিনা? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। আজও আমি এই রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। তবে আমার বিশ্বাস, হয়তো মহান সৃষ্টিকর্তা এই বিপদে আমাকে প্রতিদান হিসেবে দিয়েছেন। আমার জীবনে এটি একটি বড় শিক্ষামূলক ঘটনা। আমরা জানি সকল ধর্মে দান করার বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে, দান করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। অনেকে আছেন যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রচুর দান করেন। তারা মানুষ হিসেবেও অনেক সৎ ও মহৎ।

বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন আসে। আবার অনেকে সমস্যা থাকলেও মানুষকে জানাতে পারে না। আমরা অনেক টাকা বিভিন্ন কাজে অপচয় করি কিন্তু কেউ সাহায্যের আবেদন করলে সেটাকে অনেক সময় গুরুত্ব দেই না। তখন আমরা খুব হিসেবি হয়ে যাই। বিশেষ করে অনেকের মধ্যে দান করার মনোভাব কাজ করে না। কেউ কেউ গুরুত্বও দেয় না। আমরা কখনো এটা ভেবে দেখি না যে, এরকমের দিন যে কারো জীবনে আসতে পারে। আমাদের সকলের সামান্য সহযোগিতায় একজন মানুষ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। একটি পরিবারে ফিরে আসতে পারে আনন্দ।

অনুভবে

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

রহিমের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়। তার বাবা রহমান পেশায় শিক্ষক, মাতা আকলিমা খাতুন গৃহিণী। আজ ২৫ সেপ্টেম্বর রহিমের মেয়ে রোকেয়ার ১৫তম জন্মদিন। সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রোকেয়া তার বাবাকে বলল, "বাবা আজকের দিনটির কথা কি তোমার মনে আছে?" রহিম অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল,"হ্যাঁ মা মনে আছে।" তার মেয়ে ভারাক্রান্ত মনে বলল, "বাবা অফিস থেকে আসার সময় একটি কেক ও কিছু ফুল নিয়ে এসো।" রহিম বলল, "আচ্ছা মা।"

রহিমের স্ত্রী তানিয়া আজার তার মেয়ে রোকেয়াকে নাস্তা করিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করে দিল। রোকেয়া তার বাবা মাকে বলে ভ্যানে করে স্কুলে চলে গেল। রহিম মতিঝিলে একটি বেসরকারি ব্যাংকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। আজ তার মনটা ভাল। তার স্ত্রী তানিয়া তাকে বলল, "গোসল করে এসে নাস্তা করে যাও।" রহিম নাস্তা সম্পন্ন করে নয়টায় অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হলেন। অফিসের পাশে গাড়ি থেকে নেমে একটি কেকের দোকানে গিয়ে কেকের অর্ডার দিয়ে চলে আসলেন। পাশের আরেকটি দোকানে পথশিশুদের জন্য খাবারের অর্ডার দিয়ে অফিসে প্রবেশ করলেন। অফিসে প্রবেশ করেই পিয়ন করিমকে রিসিট দুটি দিয়ে বলল কেক ও খাবারগুলো বিকেল তিনটায় এনে রাখতে, বাসায় যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। প্রতিদিনের মতো কাজ শুরু করে এবং বিকাল ৩ টার দিকে খাবার খেল। খাবারের পর ক্লান্তিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে সে ভাবছে তার শৈশব, যৌবন ও পরবর্তী সময়ের কথা।

তার মা রোজ তাকে ডেকে দিত, নিজ হাতে খাওয়াত। ব্যাগ গুছিয়ে তাকে স্কুলে দিয়ে আসত। ছুটির পর বাসায় নিয়ে এসে গোসল করিয়ে, খাবার খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত। বিকেলে ঘুম থেকে ডেকে খেলতে পাঠাত ও সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি ফিরতে বলত। প্রতিদিনই সে তার মায়ের কথা শুনে। কিন্তু একদিন বন্ধু ফরিদের কথা শুনে তাদের বাসায় যায়। সে দিন ফিরতে রাত হয়। এরই মধ্যে তার বাবা বাসায় ফিরে আসেন। বাবা সেদিন এমনভাবে বেত্রাঘাত করেছেন যা আজো মনে পড়লে চোখে জল আসে। এরপর কোনদিন সে আর দেরি করে বাসায় ফেরেনি। মা সেদিন নিরবে জন্য কেঁদেছেন। মা প্রতিদিন তার সাথে পড়ার টেবিলে বসে থাকতেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন মায়ের কী চিন্তা! যখন স্কুল বন্ধ থাকত তখন সে নদীতে সাঁতার কেটে মাছ ধরত এবং নানা বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সময় কাটাত।

মেট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট শেষ হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে সে যখন পড়াশুনা শুরু করে তখন তার ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত। অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রতি সপ্তাহে মা বিভিন্ন খাবার রান্না করে নিয়ে আসতেন। রহিম ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় মা মারা যান। এরপর থেকে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার তার বাবা আসতেন। সে খেয়াল করল তার বাবার মন সবসময় খারাপ থাকে। এরই মধ্যে ভাই অধ্যয়ন শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমান। পরবর্তীতে বিয়ে করে তিনি অস্ট্রেলিয়া স্থায়ী হন। এদিকে ভাইয়ের শোকে বাবা মারা যান। রহিমকে বিয়ে করিয়ে ভাই আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যান এবং মাঝে মধ্যে চিঠিতে খোঁজ খবর নিতেন। বিয়ের দুই বছর পর তার মেয়ে রোকেয়ার জন্ম হয়।

স্ত্রী তানিয়া অনেক রাত জেগে এবং কষ্ট করে মেয়ে রোকেয়াকে লালন-পালন করে বড় করছে। রোকেয়ার জন্য তানিয়ার সেকি চিন্তা এসব দেখে বার বার করে রহিমের তার মায়ের কথা মনে পড়ছে। রহিম মায়ের প্রতিচ্ছবি মেয়ের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়।

বিকাল ৫টায় পিয়ন করিম এসে রহিমকে বলল, "স্যার, এতক্ষণ আপনাকে ডাকিনি কারণ দেখলাম আপনি ঘুমাচ্ছেন।" রহিম তাড়াহুড়া করে চেয়ার থেকে উঠে করিমকে বলল, "কেক ও খাবার গুলো এনেছ কি না?"

করিম বলল, "জী স্যার এনেছি।" রহিম তাড়াহুড়ো করে অফিস থেকে ফুল ও খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খাবারগুলো গুলিস্তানে কিছু পথ শিশুকে বিতরণ করে ফুল কিনে বাসার দিকে রওনা হলো। সে ভাবছে বন্ধু ফরিদের বাবা-মাকে ফোন করা হয়নি। আজ যে ফরিদের মৃত্যুবার্ষিকী। ফরিদের মেয়ের ২য় জন্মদিনে ময়মনসিংহ থেকে আসার সময় সে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। ফরিদের বাবা মা এখন রহিমের মধ্যে ফরিদের ছায়া খুঁজে বেড়ায়। রহিম চিন্তা করে সেকি পারবে ফরিদের বাবা মাকে তার নিজের বাবা-মায়ের মত দেখতে? রোকেয়া কি পারবে এই প্রযুক্তির যুগে মানবতা ধরে রাখতে? বাসায় প্রবেশ করে রহিম দেখে তার জন্য মেয়ে রোকেয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।
মনটাই তার ভালো হয়ে যায়।

ভৌগোলিক তথ্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

অসীম কুমার দাস
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ

বাংলাদেশ একটি দেশ যার লক্ষ্য হলো উন্নয়ন। উন্নয়নের তরীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র এখন সম্মুখে বহমান। উন্নয়ন হচ্ছে কোন এক দেশের সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। মাঝে মাঝে আমার কিছু ছাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করে স্যার 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়টি পড়ে আমার কী লাভ? এসব কিছু জেনে আমি কী করব? বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্ররা। তখন আমি খানিক মুচকি হেসে তাদের বিষয়টির কিছু বিষয় বোঝাতে চেষ্টা করি আসলে কেন আমরা এই বিষয়টি পড়ব। আমি আবার অনেক সময় মনে মনে বলি আসলে কেন আমরা এই বিষয়টি পড়ব। আমি আবার অনেক সময় মনে মনে বলি আসলে তো এ বিষয়ে বিষয়গত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝার মতো জ্ঞান তাদের হয়নি। এ দেশে পড়াশোনা মানে লেখাপড়া শেখার পর চাকরি নামক বিষয়টির নিশ্চয়তার জন্য এমন প্রশ্ন অথবা বাবা মায়ের স্বপ্ন বিজ্ঞান পড়ে ডাক্তার, প্রকৌশলী অথবা অন্য কোন বিষয়ে পড়ে উচ্চ বেতন লাভের আশা। আমাদের মতো দেশে আসলে তাই হওয়া উচিত। কিন্তু উন্নত দেশে পড়াশোনার বিষয় ও কাজ করার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। ফলে দেশ উন্নয়নে তাদের মেধাকে বেশি নিয়োজিত করতে পারে এবং দেশের জনগণও উপকৃত হয় অনেক বেশি।

বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি পরিকল্পনা হলো বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এটি একটি দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের ভাবনা। যেমন আমাদের দেশের নয় বিভাগের মধ্যে সব বিভাগের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সমান নয়। তাই দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন অঞ্চল ভিত্তিক গবেষণা ও পরিকল্পনা।

অঞ্চল ভিত্তিক এই উন্নতির জন্য সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, বিজ্ঞানী, আবাহাওয়াবিদ, কৃষিবিদ, স্থপতি ইত্যাদি শ্রেণি ও পেশাজীবীদের যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি সেটি হলো ভৌগোলিক তথ্য। এই বিষয়টির সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব । ভৌগোলিক তথ্য জানা থাকলে ভবিষ্যৎ আমরা MDG এর মতো SDGকেও সফল করতে পারব।

ভৌগোলিক তথ্য বা জি আই এস :

ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জি আই এস বলে। ভৌগোলিক তথ্যগুলোর সংরক্ষণ বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানিক ও পারিবারিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ মানচিত্রায়ণ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। ১৯৬৩ সালে Roger Tomlinson কানাডা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা করেন Canada Geographic Information system (CGIS)। ১৯৬৪ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম জিআইএস কৌশলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে এর কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হয়ে ভূমি জরিপ ও পরিসংখ্যান পত্র সংক্রান্ত অসংখ্য কম্পিউটার সৃষ্ট মানচিত্র উদ্ভাবন ও প্রকাশ করেন। তিনি কম্পিউটারে মানচিত্র অঙ্কনের জন্য ড্রাম স্ক্যানার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জিআইএস এর প্রচার ও প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অবদানের জন্য Roger Tomlison কে জিআইএস এর জনক বা Father of GIS বলা হয়ে থাকে। ১৯৮০ সালে থেকে সারা বিশ্বে GIS ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

জিআইএস (GIS) এর প্রয়োজনীয়তা : বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে জিআইএস বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে আলোচনা করা যায়। তবে জিআইএস এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নোক্ত মৌলিকভাবে ভাগ করে বলা যায়।

মানচিত্রে উপাত্ত উপস্থাপন : জিআইএস এর মাধ্যমে একটি মানচিত্রে অনেক ধরনের উপাত্ত উপস্থাপন ঘটিয়ে সেই উপাত্তগুলোকে মানচিত্রের মধ্যে বিশ্লেষণ করে মানচিত্রটির উপযোগিতা বাড়িয়ে দেয়া যায়। যেমন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা টপোগ্রাফি, ভূমি-ব্যবহার, যোগাযোগ, মৃত্তিকা, রাস্তা ইত্যাদি জিনিস দেখিয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সম্পূর্ণচিত্র সম্বন্ধে জানতে পারি।

উত্তম নথি: ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য উদ্ধার, সংযোজন, নতুন তথ্য সংরক্ষন, তথ্য মুছে ফেলা বা দ্রুত ব্যবহারের এর মাধ্যমে করা যায়। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যাতে পরবর্তীতে এ তথ্য ব্যবহার করে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, গবেষক ও সংস্থা প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে।

তথ্য ভৌগোলিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা: জিআইএস এর মাধ্যমে তথ্য ভৌগোলিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেননা, GIS এর প্রত্যেকটি Dataset এর একটি করে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে যা ঐ Dataset কে অন্যান্য ভৌগোলিক তথ্য স্তরের সঙ্গে একটি সাধারণ স্থানাঙ্ক কাঠামোর আওতায় একীভূত।

উত্তম যোগাযোগ: বর্তমানে বিশ্ব বাজারে অসংখ্য বাণিজ্যিক এবং মুক্ত সোর্স GIS সফটওয়ার রয়েছে। এটি বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

উত্তম সিদ্ধান্ত : এর পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই প্রযুক্তি সুফল বয়ে আনছে। GIS দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্লেষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মহা-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০২০ সালের ঢাকা শহরের ভবিষ্যত পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি অনেক কিছু করা সম্ভব। সুতরাং আমি বলতে পারি কানাডার মতো বাংলাদেশও এর উন্নত গবেষণা ও প্রয়োগের মাধ্যমে একদিন উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে। বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি পরিকল্পনা হলো বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন। এটি একটি দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের ভাবনা। যেমন আমাদের দেশের নয়টি বিভাগের মধ্যে সব বিভাগের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সমান নয়। তাই দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন অঞ্চল ভিত্তিক গবেষণা ও পরিকল্পনা।

অঞ্চল ভিত্তিক উন্নতির জন্য সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদ, কৃষিবিদ, স্থপতি ইত্যাদি শ্রেণি ও পেশাজীবীদের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি তা হলো ভৌগোলিক তথ্য এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

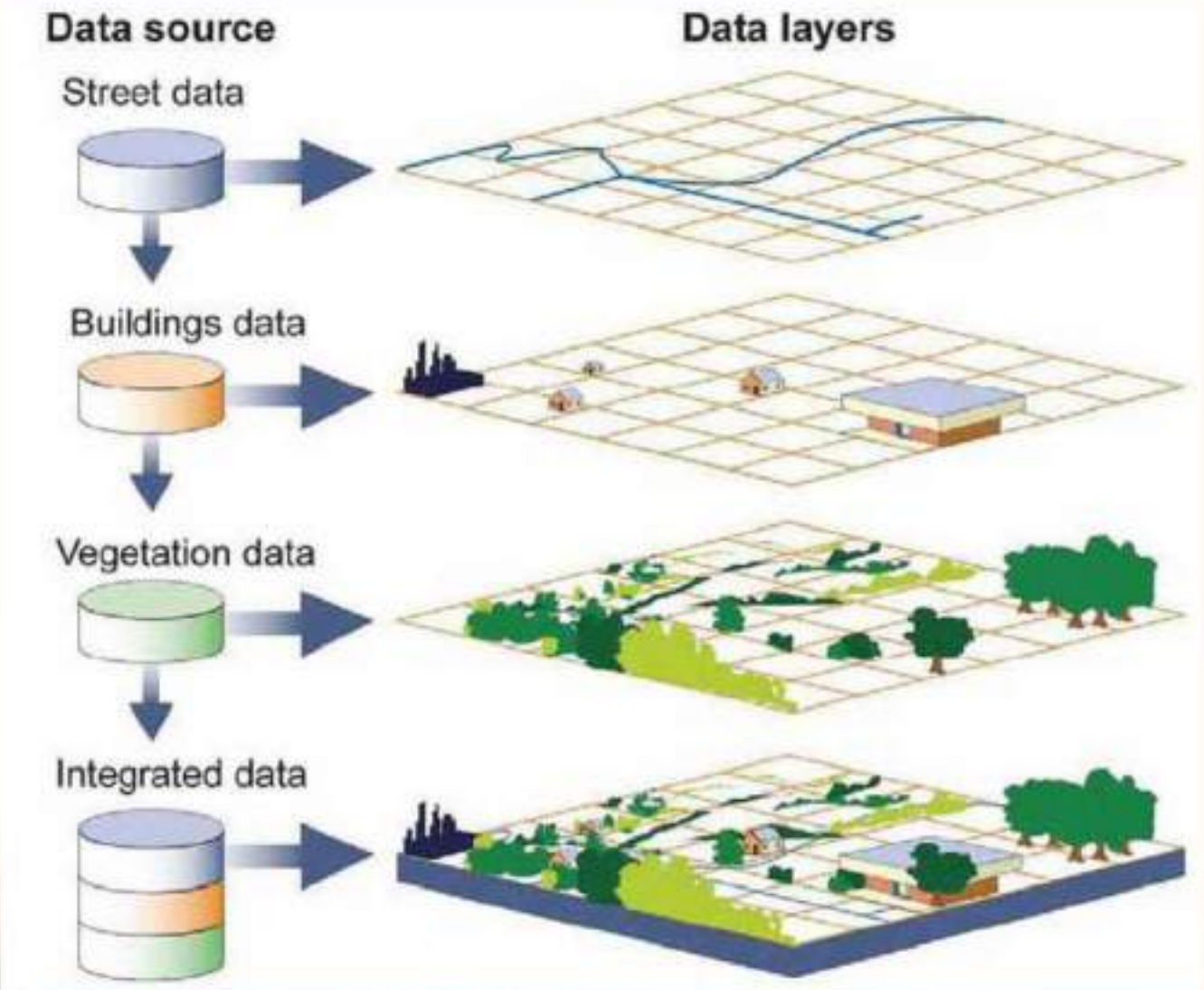

নামাজ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

জি.এম. এনায়েত আলী
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

নামাজ শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। ফারসি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কি এবং বাংলা ভাষায় একে নামাজ বলা হয়। কিন্তু এর মূল আরবি-নাম সালাত। বাংলা ভাষায় সালাত এর পরিবর্তে সচরাচর নামাজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সালাত এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। নামাজ ইসলাম ধর্মের প্রধান ইবাদত। "অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত।" (সুরা আল মুমিনুন, আয়াত: ১-২)।

নামাজের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। এর আত্মিক, শারীরিক, সামাজিক ও পরকালীন উপকারিতা ও ফজিলত রয়েছে। আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্যের বাস্তবরূপ হচ্ছে নামাজ। আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য চরম ধ্যান ও নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করলে মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সফলতা আসে। আমি এখানে শুধু ইসলাম ধর্মের প্রধানতম এবাদত নামাজের সাথে বিজ্ঞান তথা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সম্পর্কটা তুলে ধরছি। আমার জানা মতে সব ধর্মের ধর্মীয় বিধিবিধান কম-বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। অন্য ধর্মে ধ্যান বা মেডিটেশন ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের আসন, উপবাস, ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষার উপাদান। সুস্থতার জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক। নামাজের জন্য পরিধেয় কাপড়, শরীর ও নামাজের স্থান পাক-পবিত্র হতে হবে। অজু-গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পাক পবিত্র করা যায়। কিশোর বয়সে নামাজ আদায় করলে মন পবিত্র থাকে এর ফলে নানা প্রকার অসামাজিক কাজ থেকে সে বিরত থাকে। নামাজের পূর্বে দাঁত ব্রাশ করার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (স.) বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেউ যদি দিনে পাঁচবার দাঁত মেসওয়াক করে তাহলে সে যাবতীয় দন্তরোগ থেকে মুক্ত হতে পারে।

১। অজুর মাধ্যমে ত্বক ও নাকের রোগ প্রতিরোধ:

ত্বক আমাদের দেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। এই ত্বকের উপর একটা মোমের প্রলেপ এর মতো আস্তরণ আছে। এটি রোগ প্রতিরোধে প্রতিরক্ষা বুহ্য হিসেবে কাজ করে। সারাদিনের যত ময়লা, আবর্জনা, দূষিত বায়ু যা কিছু আমাদের শরীরের অনাবৃত অংশের উপর পড়ে। সেই রোগ জীবাণুগুলো সংক্রমণ হতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগে। এর মধ্যে ওযুর মাধ্যমে আমরা সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলি। ওযুর মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের অনাবৃত অংশকেই পরিষ্কার করি। ফলে সংক্রমণের হাত হতে রক্ষা পাই। দেহের প্রতিরক্ষা বুহ্যের মধ্যে ত্বক যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি নাকও। আমাদের দেহের মধ্যে খাদ্যের মাধ্যমে ছাড়া যত প্রকার রোগ জীবাণু প্রবেশ করে তার মধ্যে ত্বক ও নাক প্রধান। নাসারন্ধ্রের মধ্যে লোম, লোমগ্রন্থি, গাত্রত্বকে এক ধরনের মিউকাস নিঃসরণ করে। যার কারণে রোগজীবাণু শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে না। আমাদের ওযুর সময় নাকের অভ্যন্তর পরিষ্কার করতে হয় যা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। নাকের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার না করলে সেখানে অবস্থিত রোগজীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে।

২। কুরআন/সূরা তেলাওয়াতের মাধ্যমে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি :

নামাজ আদায় করলে মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমরা জানি আমাদের শরীরের আদর্শ পালস এর গতি প্রতি মিনিটে ৭২ বার। সাথে সাথে একথাও জানা উচিত যে আমাদের শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি কত? আদর্শ হিসেবে ধরা হয় ১৬ থেকে ২০ বার। যদি এই গতি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে, সে দুর্বল রোগগ্রস্থ, আর যদি এই গতি কম হয় তাহলে শরীর ভালো আছে। তবে এই গতি খুব কম- বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। Breathing exersice বলে একটা কথা আছে। সেখানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ধীরভাবে চালনা করার নিয়ম আছে, কারণ এটা স্বাস্থ্যসম্মত। আমরা যখন নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করি তখন কিন্তু এইভাবে লম্বা শ্বাস নিতে হয়। যদি কেউ পাঁচবার এইভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে নামাজ পড়ে, তাহলে সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত যাবতীয়রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

৩। দেহের কাঠামোগত উন্নতি:

নামাজ পড়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরের বেশকিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া হয় যা এক প্রকার ব্যায়াম। এই ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। এটি এমন একটি ব্যায়াম যা ছোটো বড়ো সবাই করতে পারে। নামাজ সকল মানুষের দেহের কাঠামো বজায় রাখে। ফলে শারীরিক বিকলঙ্গতা লোপ পায়। নামাজ মানুষের দেহের কাঠামোগত ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে স্থূলতা ও বিকলাঙ্গতার হার কমে যায়। অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪। রুকু:

কোমর, হাঁটু ও ঘাড় ব্যথার প্রতিকার। নামাজী ব্যক্তি যখন রুকু করে এবং রুকু থেকে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন মানুষের কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে কোমর, ঘাড় ও হাঁটু ব্যাথা উপশম হয়।

৫। মুখমন্ডলের ত্বকের উপকারিতা:

নামাজের জন্য মানুষ যতবার অজু করে, ততবারই মানুষের মুখমণ্ডল ম্যাসেজ হয়ে থাকে। যাতে মুখমন্ডলে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানুষের চেহারার লাবণ্যতা বৃদ্ধি পায়, মুখের বলিরেখা ও মুখের দাগ কমে যায়। নামাজের জন্য মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার অজু করতে হয়। আর এতে মানুষের ত্বক পরিষ্কার থাকে। ওজুর সময় মানুষের দেহের মূল্যবান অংশগুলো পরিষ্কার হয়, যা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জীবানু হতে মানুষ সুরক্ষিত থাকে।

৬। পেটের চর্বি ও গ্যাস থেকে পরিত্রাণ:

নামাজের সময় নামাজী ব্যক্তিকে দাঁড়ানো, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে স্থির দাঁড়ানো, আবার সিজদায় যাওয়া, সিজদা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসা, আবার সিজদা দিয়ে দাঁড়ানো বা বসা। এ সবই মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম। এতে মানুষের শারীরিক বহুবিদ উপকারসহ পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৭। সিজদা: সিজদার মাধ্যমে মস্তিষ্ক ও ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যার উপশম:

নামাজে যখন সিজদা করা হয় তখন আমাদের মস্তিস্কে রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হয়। ফলে আমাদের স্মৃতি শক্তি অনেকবৃদ্ধি পায়। আবার সিজদা থেকে উঠে যখন দুই সিজদার মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু ও হাঁটু সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে। এতে করে মানুষের হাঁটু ও কোমরের ব্যথা উপশম হয়। আমাদের দেহে বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত রক্তসঞ্চালন পাম্প বা হৃদপিণ্ড অবস্থিত যা সাধারণত সব সময় মস্তিষ্কের নিচে অবস্থান করে। এই হৃদপিণ্ডকে রক্ত পাম্প করে উপরে মস্তিষ্কে পাঠাতে হয়, কিন্তু একমাত্র সিজদা করার সময় মস্তিষ্ক নিচে এবং হৃদপিণ্ড উপরে অবস্থান করে। সুতরাং এই সময়ে রক্ত খুব সহজেই মস্তিষ্কের শিরা, ধমনী, কৌশিক জালিকায় রক্তের চাপ বেড়ে যায় ফলে মাথার সাইনোসাইটিস, মাইগ্রেনসহ অনেক ধরনের রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থা ফুসফুসের সম্পূর্ণ বায়ু বের হয় না। এক-তৃতীয়াংশ বায়ু থেকে যায়। কিন্তু শুধু সেজদার সময় ফুসফুসের সব বায়ু বের হয়ে যায়। এ কারণে সবার উচিত একটু বেশি সময় নিয়ে সিজদা করা।

এছাড়াও সিজদার ফলে পায়ুপথের অর্শ, গেজ, ভগন্দরসহ অনেক ধরনের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কারণ সেজদারত অবস্থায় মলদ্বার বা পায়ুপথের বেশি অংশ উন্মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসে, যা স্বাস্থ্যসম্মত। সবাইকে অনুরোধ করছি কিছুটা দীর্ঘ সময় ধরে সিজদারত অবস্থায় নত থাকার জন্য। নামাজ হার্টের রোগীদের জন্যও বিশেষ উপকারী। নামাজ মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে প্রতিরোধ করে। অন্ত্ররোগ ও আলসার থেকেও বাঁচা যায়। সিজদার সময় মস্তিষ্কে রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে চোখ, মুখ, কান, নাকসহ বিভিন্ন রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেবল নামাজের মাধ্যমেই চোখের নিয়মমত যত্ন নেওয়া হয়। ফলে অধিকাংশ নামাজ আদায়কারী মানুষের দৃষ্টিশক্তি বজায় থাকে। মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন তাদের চোখ সিজদার স্থানে স্থির রাখার নিয়ম। ফলে মানুষের একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। মূলত, 'প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আল্লাহর ভয়ে ও তার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময় মত আদায় করা।'

৮। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ের গুরুত্ব :

ফজরের সময় নামাজ আদায় করলে সারা রাত ঘুমের পর হালকা অনুশীলন হয়ে যায়। এ সময়ে পুরুষ নামাজিরা হেঁটে মসজিদে যায় বিশেষ করে ঘুম থেকে উঠে খুব ভোরে মৃদু বাতাসে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আর আত্মা পরিচ্ছন্ন, প্রশান্ত পরিবেশ থেকে সুখানুভূতি লাভ করে, অত্যাশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.) জোহরের সময় মানুষ জীবিকার জন্য দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ করে। এতে ধুলা, ময়লা, বিষাক্ত কেমিকেল শরীরে লাগে। দেহে জীবাণু আক্রমণ করে। ওজু করলে এসব দূর হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়ে দেহ পুনর্জীবন লাভ করে। আসরের সময় নামাজ আদায় করলে অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ততা, অবচেতন অনুভূতির আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। মানসিক চাপ ও অস্থিরতা কমে। সারাদিন মানুষ জীবিকার জন্য শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায়। মাগরিবের সময় ওজু করে নামাজ আদায়ের ফলে আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি লাভ হয়। এশার নামাজ পড়লে শরীর ও মন শীতল হয়ে যায়ে। ঘুমানোর পূর্বে ওযু করে বিছানায় গেলে ভাল ঘুম হয়।

৯। মানসিকতার পরিবর্তন:

নামাজের মাধ্যমে মানুষের মন ও মানসিকতায় অসাধারণ পরিবর্তন আসে। গুনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদি দুর হয়। ফলে বিশুদ্ধ মন নিয়ে সব কাজে সম্পৃক্ত হওয়া যায়। নামাজ সামাজিক উন্নতি ঘটায়। নামাজ মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যবোধ শেখায়। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়, তার ফলে মানুষ সমাজের অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। নামাজ মানুষের মানসিক, স্নায়ুবিক, মনস্তাত্ত্বিক, অস্থিরতা, হতাশা-দুশ্চিন্তা, হার্ট অ্যাটাক, হাড়ের জোড়ার ব্যথা, ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ, পাকস্থলীর আলসার, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস, চোখ এবং গলা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

জীবনের প্রতি-ভালবাসা

আব্দুল কুদ্দুস
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ

একটি গল্প দিয়ে শুরু করছি। শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর নজরুল তার জামা কাপড়গুলো একটি সুন্দর বাক্সে ভর্তি করে আলমারিতে রেখে দেন, মাঝে মাঝে বের করে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, অশ্রুসিক্ত হয়ে চুমু খেয়ে আবার সযত্নে ঢুকিয়ে রাখতেন। একদিন পুলিশ সরকার বিরোধী কবিতার পাণ্ডুলিপি মনে করে আলমারি থেকে বাক্সটি নিয়ে যায়। নজরুল বাইরে ছিলেন। ঘরে ফিরে যখন শোনেন দৌড়ে বাইরে গিয়ে দূরে ওদের দেখতে পান। চিৎকার করে ডাকলেন ওটা নিওনা, ওটা আমার খোকার স্মৃতি। ওদের বিশ্বাস হয়নি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। লিখলেন-

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ড, আমিই কি বুঝি তার কিছু
হাত উঁচু আর হলো না তো ভাই, তাই লিখি করে ঘাড় নিচু!
বন্ধু তোমরা দিলে না'ক দাম
রাজ সরকার রেখেছেন নাম!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন। আর কিছু-
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

একদিন জনতার সম্মিলনে গাইলেন, "আমার ছেলে মরেছে আমার মন তীব্র পুত্রশোকে যখন ভেঙে পড়ছে ঠিক সেদিন সে সময়ে আমার বাড়িতে হাসনাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণভরে সেই হাসনাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম।" ফুলের সৌন্দর্যে ও ঘ্রাণে নব জীবনের স্পন্দন পেলেন তিনি, জীবনকে আবার ভালোবাসতে উপভোগ করতে শুরু করলেন। নিত্য বাধার সাথে লড়াই করা মহামানবদের একজন ছিলেন তিনি। শত বর্ষ পরে কিংবা হাজার বছর পর তার একখানা কবিতা কোনো ভীত বিহ্বল, শোকাতুর, ব্যাধি-জরা ও বার্ধক্যগ্রস্ত জাতিকে প্রচণ্ড শক্তিতে বলীয়ান করতে পারবে। তিনি বড় হয়েছিলেন-রুটির দোকানের কাজ শেষে রাতের নিস্তব্ধতায় পড়ালেখা করে।

আরেকটি গল্প, (আশাকরি কর্মে বিশ্বাসীগণ গল্পে বিরক্ত হবেন না)। দারিদ্র্যের কারণে বাবা-মা'র সাথে চার বছরে অজপাড়া গ্রামে ফিরে আসেন শিশু আব্রাহাম লিংকন । ছয় বছর বয়সে মাকে হারিয়ে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। সৎ মায়ের দয়ায় লিখতে ও পড়তে শিখলেন। মায়ের মৃত্যুর কষ্টের চেয়েও তার মনে আঘাত করেছিল গরু-ছাগলের সাথে মানুষ বিক্রির দৃশ্য দেখে। নিজে নিজে আইনের বই পড়ে এক সময় আইনের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। এর পর ঘৃণ্য এই দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করে ইতিহাসের নায়ক হলেন।

এক সময় দারিদ্র্যের কষাঘাতে ছেলে বেলাতেই পড়ালেখার সমাপ্তি ঘটত অনেকের। স্কুল ছুটির পর গরু-ছাগলের যত্নে সন্ধ্যা হত। বিদ্যুৎবিহীন রাতে কেরোসিনের স্বল্পতার কারণে দিনের পড়া না শিখেই ঘুমিয়ে পড়তে হত। ফল দাঁড়াত পরীক্ষায় ফেল, ছাত্র জীবনের ইতি। এখন আর সে সমস্যা নেই। তবে, ছুটির পর আড্ডা, স্মার্ট ফোন নিয়ে ব্যস্ততা আর আনন্দফূর্তিতে পার হয়ে যায় অর্ধরাত। পড়ালেখার সময় কোথায়? এ ধরনের ছেলেদের লাইফ স্টাইলের প্রভাব পড়ে অন্যদের উপরেও। সব মিলে ভর্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া কিছু ছেলে নিজ 'কর্মগুণে' অকালে ঝরে পড়ে। অনেকে আবার বলে সবার পক্ষে কি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, মিনিস্টার হওয়া সম্ভব? মানলাম সে কথা। কিন্তু আমার পক্ষে ভালো রেজাল্ট করা, ভালো মানুষ হওয়া, অসৎ বন্ধুদের ত্যাগ করা কি খুব কঠিন কাজ? মোটেই না। "বেশি পড়লে অন্যরা কী বলবে", যদি বলে আমাদের সাথে তুই চলবি না, খেলবি না। তাহলে কী হবে? এই চিন্তা অত্যন্ত হীনম্মন্যতার পরিচয়। শয়তানের 'সু- পরামর্শ'। নজরুল এদের উদ্দেশে বলেন-

আগে চলি অনুরাগে, সহসা কে পিছু হতে টানে।
একি শয়তান, একি অজ্ঞান, কি জানি কে জানে।

'শয়তান-শিরে' লাথি মেরে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলার উপদেশ দেন নজরুল। পত্রিকার পাতায় মানুষের জীবন সংগ্রামের কত ছবি আসে। গাছের সাথে বেধে নিজের শিশু সন্তানের সামনে যে মাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হতো সেই মা মানুষের বাসায় বাসায় কাজ করে ছেলেদের পড়ালেখা শিখিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে ওরা এখন চাকুরি করে মাকে সম্মান করে। কিংবা রিকশাওয়ালার ছেলে অসাধারণ ফলাফল করেছে। এ ধরনের ছবি থেকে প্রেরণা নিতে হবে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সাথে মিল রেখে জীবন যুদ্ধে জড়াতে হয়। ফসলের মাঠে আগাছা জন্মালে যে কৃষক তা উপড়ে ফেলেন, তিনিই কেবল ভালো ফসল পেতে পারেন। খারাপ বন্ধুত্বের চেয়ে একা থাকা লক্ষ-কোটিগুণ ভালো । অলসতা, হীনম্মন্যতা দূর করা, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া ছাত্র জীবনে সফলতার জন্য ঐচ্ছিক নয়, অত্যন্ত আবশ্যিক।

নিজের বাবা মায়ের, শিক্ষকের, ভালো মানুষদের উপদেশগুলোকে সম্মান করা, নেশা-ধূমপান, অন্ধকার জগৎ থেকে নিজেকে রক্ষা করা কষ্টকর নয়। মনে রাখতে হবে অন্ধকার জগৎ মানুষকে ক্রমাগত গভীর অন্ধকারে নিয়ে ছেড়ে দেয়, যেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। একটা শলাকার টান যা প্রত্যেকেই জানে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে কেন সেটার প্রতি কৌতূহল থাকবে? আমার জীবনের মালিক কি আমি? আমার পক্ষে কি সম্ভব ছিল একটি চোখে দৃষ্টি শক্তি সৃষ্টি করা? তাহলে অন্যের মালিকাধীন একটি জিনিস ধ্বংস করার, নষ্ট করার অনৈতিক দুঃসাহস কেন এল? ফুসফুসের ক্ষতি করে, ক্যান্সারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষণিকের জন্য যে সুখ আসে তা যে দীর্ঘ জীবনে দুঃখ হতাশা-ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যের কারণ সেটি বোঝার জন্য বেদ-বাইবেল পড়তে হবে? নিজের যৌবনকে পরিচ্ছন্ন রাখার যে কত বড় পুরস্কার বিশ্বজগতের স্রষ্টা নিজ হাতে দেবেন তা শত নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বেশি খ্যাতি ও মর্যাদার। এই জগতে কোনো ক্ষমতাধর দাম্ভিক ব্যক্তিও মাত্র ৫০ বছরের বেশি স্থায়ী ছিল না। তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণের প্রশ্নই আসে না। এমনকি অন্যের জন্য তৈরি ফাঁদে নিজেই পড়ে, আর্তনাদ করতে করতে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে হয়েছে অনেককে। কী দরকার অন্যকে অসম্মান করার? বাবা-মা শিক্ষক ও আইনের অবাধ্য হয়ে নিজেকে হিরো বানানোর চেষ্টা করা? নিজেকে সুন্দর মানুষ করতে ধর্মের বিধানগুলো মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে কিয়ামতের বিচারের দৃশ্য এখন একেবারে প্রমাণিত সত্যের মত অনিবার্য বিষয়। এটাকে সন্দেহ করা দিনের আলোকে সন্দেহ করার মতই।

জালালুদ্দিন রুমীর একটি গল্প দিয়ে শেষ করছি। (যদিও গল্পটির অর্থ অনেক গভীর।) মসনবিতে তিনি লেখেন-একজন শিকারি গভীর বনে অনেক কষ্ট করে একটি সুন্দর পাখি শিকার করে। শিকারের পর পাখিটি তাকে বলল আমাকে দিয়েতো তোমার কোনো কাজে লাগবে না বরং আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি তিনটি উপদেশ দেব যা তোমার কাজে লাগবে। পাখির কথায় বিশ্বাস করে লোকটি পাখিটিকে ছেড়ে দেয়। পাখি যে তিনটি উপদেশ দিয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমার পেটে দুইটি হীরকখণ্ড আছে; তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলতে তাহলে সেগুলো পেয়ে যেতে। তুমি মস্তবড় বোকা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছো। যারা ছাত্র জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে ঐ বোকা শিকারির মত হাত ছাড়া করে ফেলে তাদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কি কিছু থাকতে পারে?

সন্তান ও মা

মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

তুমি এসেছো বসুন্ধরাতে মায়ের বুকে শ্রান্তির হাসি নিয়ে। মর্তের লক্ষী পেঁচা লজ্জা পেয়ে লুকোচুরিতে মশগুল হয়েছিল তোমার আগমনী বার্তায়। পরম সুখে মায়াবী চাহনীতে পৃথিবীর সত্তাকে আপন করেছো। আমার গর্ভধারিনী মা তোমার প্রতিচ্ছবি বুনে গিয়েছে। মায়ের পেটে থেকে বারবার আগমনী বার্তা পৌঁছে দিতে। তোমাকে প্রথম দেখার ও কোলে তুলে নেয়ার অনুভূতির আন্দোলিত ভাষাহীন আবেগ সারাজীবন আনন্দ দিবে। তুমি এসেছো স্বাধীন এই দেশে। তুমি পেয়েছো শিক্ষক বাবাকে। কিন্তু আমরা আজ সমাজটা তোমাদের জন্য কতটুকু প্রস্তুত করে রেখেছি? জ্ঞানবোধ হবার পর মাকে পেয়েছি শিক্ষক হিসেবে, যাকে বলে প্রকৃতির শিক্ষক। বাবাকে পেয়েছি সরল প্রকৃতির শাসক হিসেবে। আমাদের লেখাপড়ার প্রতি তাদের ছিল স্বাধীনতার চেতনাবোধ। গ্রামের মুক্ত পরিবেশে প্রকৃতির দানে বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এক ভাই ইঞ্জিনিয়ার এবং তিন ভাই শিক্ষকতা পেশায় আছি। নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে সম্মান বোধ করি। কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে সমাজে আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের বিরাট অভাব। নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসার অভাব নেই। কিন্তু পৃথিবীর সকল উপাদান দিন দিন এমনভাবে কলুষিত হচ্ছে যেখানে সন্তানকে মানুষের মত সত্যিকারের 'মানুষ' করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মায়ের ভালোবাসাই সন্তানের পৃথিবী। সকল মায়ের সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। পৃথিবীর সকল সন্তানেরা ভাল থাকুক।
এই কামনা।

স্বপ্নলোকের স্বপন

মোঃ আরিফুল হক
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ক্লাসে ঢুকেই দেখি তুমুল হাস্যরসিকতা। বন্ধুদের জটলার মাঝে বসে আছে নতুন একটি ছেলে। ছেলেটা দেখতে ভালোই। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় সেটা হলো ওর হাত, ডান হাতটা ঠিকই আছে কিন্তু বাম হাতটা ঠিক কাঠির মতো! গাছের ডাল কেটে রোদে ফেলে রাখলে যেমন চিমসে মরে যায়, অনেকটা সেরকম। শুকনো ডালের আগায় মরা কাঠির মতো আঙ্গুলগুলো ঝুলছে। যেন একটু চাপ দিলেই ভেঙ্গে যাবে।

স্যার চলে এসেছেন, ফার্স্ট পিরিয়ড শুরু হয়ে গেলো, স্যার একে একে ক্লাসের আটচল্লিশ জনের রোল কল করে নতুন রোল ডাকলেন, "রোল নাম্বার ফোরটি নাইন?"

-ইয়েস স্যার।

নতুন ছেলেটি দাঁড়ালো।

সাথে সাথে ক্লাসে হাসির রোল।

স্যার চোখ গরম করলেন।

সব ঠাণ্ডা।

স্যার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নতুন ভর্তি হয়েছো?"

-জ্বী, স্যার।

-নাম কী তোমার?

-শাহনেওয়াজ্জামান স্বপন।

স্যার রেজিস্টার খাতায় নাম তুললেন। তারপর সহানুভূতি নিয়ে তাকালেন ছেলেটির দিকে। বললেন, "তোমার তো... একটা হাতে একটু সমস্যা, তাই না?"

না স্যার, আমি একটা হাত দিয়ে একটু কম কাজ করতে পারি।

হাসিতে ফেটে পড়লো পুরো ক্লাস। কাঠি দিয়ে কী লাঠি খেলে নাকি ছেলেটা?

স্যার অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, "একটু কম কাজ করতে পারি- মানে কী? তুমি ঐ হাত দিয়ে কাজ পারো?"

-জ্বী স্যার, করতে পারি।

-কী কাজ করতে পারো?

-প্রায় সব ধরনের কাজ স্যার।

-যেমন...?

-যেমন স্যার, আমি লেখার সময় খাতার উপর এই হাতটা রাখি, তাতে লিখতে সুবিধা হয়। ব্যাগে বই রাখার সময় এই হাত দিয়ে ব্যাগের জিপারটা ধরি, ব্যাগ গোছানো সহজ হয়। ক্রিকেটে আম্পায়ারিংয়ের সময় ডান হাতের সাথে এই হাতটাও একটু তুলে ছক্কা দেই, খেলায় মজা হয়।

আবারো হেসে উঠলাম আমরা। এবার অবশ্য বিদ্রুপ করে নয়, সত্যিকারের মজা পেয়ে।

ছেলেটা হাসি মুখে একবার আমাদের সবার দিকে তাকালো। তারপর স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, "এভাবে প্রায় সব কাজেই এই হাতটা আমার অন্য হাতের সাপোর্টিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করে স্যার।"

স্যার স্মিত হেসে বললেন, "বাহ, তুমি তো অনেক কিছুই পারো দেখছি। কথাও বলো খুব সুন্দর করে। গুড, বসো।"

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমাদেরই বয়সি একটি ছেলে এত গুছিয়ে কথা বলে কীভাবে?

বায়োলজি অলিম্পিয়াডের দর্শক সারিতে বসে আছি। মন যথেষ্ট খারাপ। ইচ্ছে করছে জারিফটাকে কাঁচা খেয়ে ফেলি। এতো ছটফট করতে হবে কেন উত্তর দেবার জন্য? অতি উৎসাহী হয়ে উত্তর দিতে গিয়েই তো অঘটনটি ঘটল। জেনেটিক্স এর জনক নাকি অ্যারিস্টটল!

লজ্জা! লজ্জা!!

"কী করলি এটা?"

প্রবল বিরক্তি নিয়ে জারিফকে প্রশ্ন করতেই ওর উত্তর, "আবেগে বলে ফেলছি দোস্ত।" এরপর আর কী বলার থাকতে পারে?

ইচ্ছে করছে পিটিয়ে ওর আবেগ ছুটাই। ইস.... কী চান্সটাই না ছিলো আমাদের ফার্স্ট হবার। কেউ যা পারেনি, সেই "ডিএনএ রেপ্লিকেশন আর প্রোটিন সিনথেসিস" সম্পৃক্ত জটিল প্রশ্ন দুটোর উত্তর কী সুন্দর করেই না স্বপন দিয়েছিলো! অথচ এই জারিফটার জন্য ...

গেলো, সব গেলো।

কী আর করা। বিধি বাম। বাধ্য হয়েই তাই তালি দেবার প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছি আর জারিফের তারিফ করছি (কল্পনায় আবেগ ছুটাচ্ছি)।

যথারীতি পুরস্কার বিতরণ শুরু হলো এবং স্বাভাবিকভাবেই তালি দিতে দিতে আমাদের হাত ব্যথা হয়ে গেলো। ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ লাউড স্পিকারে আমাদের গ্রুপের নাম শোনা গেলো। প্রথমটায় মনে হলো ভুল শুনেছি, কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম, সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে হাততালি দিচ্ছে।

ভুল শুনিনি তাহলে। অনুষ্ঠানের চমক হিসেবে সবশেষে ঘোষণা করা প্রথম পুরস্কারটি আমাদের গ্রুপেরই!

আমি আনন্দে স্বপনকে জড়িয়ে ধরলাম।

কয়েক মাস কেটে গেলো ক্লাস আর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। চলে এলো আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট।

গত দুবছরের মতো এবারও আমরা ফাইনালে উঠে গেলাম। চ্যাম্পিয়ন হবার হ্যাট্রিক চান্স।
ম্যাচ চলছে।
ফার্স্ট হাফেই আমরা বীরদর্পে দুটি গোল দিয়ে দিলাম।
মাঠের বাইরে উৎসাহ আর আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। জয়োৎসব ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু সেকেন্ড হাফেই তাতে ভাটা পড়লো। আশ্চর্যজনকভাবে আমরা পরপর তিনটি গোল খেলাম। তার মধ্যে আবার মড়ার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো আমাদের টিম ও ডিফেন্স লিডার জারিফের পা মচকে গেলো।
খেলার বাকি আছে আট মিনিট।
আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ সেই সর্ষের মধ্যেই ভূত দেখার বদলে স্বপনকে দেখলাম। সে দৌড়াতে দৌড়াতে মাঠে ঢুকছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। জিতি বা না জিতি, অন্তত সমতা ফেরানো চাই।

হলোও তাই। দুই মিনিটের মাথায় আমরা একটা গোল দিয়ে দিলাম। আবার জেগে উঠলো মাঠের বাইরে আমাদের সিনিয়র-জুনিয়াররা। আমরা আবার খেলায় ফিরে এলাম।

হাড্ডা-হাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে পরবর্তী পাঁচ মিনিট খেলায় সমতা রেখেই কাটলো। লাস্ট মিনিটে পড়লো খেলা। মরিয়া হয়ে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে মিডফিল্ড থেকে হঠাৎ একটা হাই শট দিলাম। আর সেই শটে কোত্থেকে উড়ে এসে স্বপন মাথা ঠুকে দিলো। বল চলে গেলো প্রতিপক্ষের জালে। আমরা চ্যাম্পিয়ন হিসেবে হ্যাট্রিক করলাম।

স্রোতের মতো আমাদের টিচার-স্টুডেন্টরা মাঠে ঢুকছে। আনন্দোচ্ছ্বাস হয়ে আছড়ে পড়ছে আমাদের উপর।

জারিফ ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে স্বপনকে কাঁধে তুলে নিলো। তারপর আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাঠের মধ্যে পাক খেতে লাগলো।

প্রবল আনন্দ মনে হয় দুঃসহ বেদনাকে ভুলিয়ে দেয়। একটু আগেই যে ভয়ানক ভাবে জারিফের পা মচকেছে, তা ওর এই আনন্দনৃত্য দেখলে কে বলবে?

শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চললো । আজ ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেবার দিন। অন্য কিছুতে স্বপন যেমনই থাক, ক্লাসে যে একেবারে ফার্স্ট হয়ে বসবে এমনটা ভাবিনি। রেকর্ড ভেঙে ফার্স্টবয় সাচীকে টপকানো অত সহজ নয়। খবরটা শোনার পর সাচীর মনের অবস্থা কী হবে তাই ভাবছি। আমি স্বপনের দিকে তাকালাম, আর কতভাবেই না জানি ও বিস্মিত করবে আমাদের।

বাসায় ফিরবো।
স্বপন বিদায় নিতে হাত নেড়ে বললো "আসি বন্ধুরা..."
বলে ঘুরতেই সাচী ওর কাঁধে হাত রাখলো। "দাঁড়া।"
স্বপন অবাক চোখে দাঁড়ালো।
সাচী বলল, "আমরাও যাবো তোর সঙ্গে।"
এবার আমি আর জারিফ অবাক হয়ে সাচীর দিকে তাকালাম। সাচী একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে স্বপনের দিকে ফিরে বলল, "তোর বাসা এক দিকে। আর রোজ তুই স্কুল ছুটির পর যাস অন্য দিকে। জিজ্ঞেস করলে বলিস কাজ আছে একটু। তোর সেই একটু কাজটাই আজ দেখতে চাই।"

বিষয়টি নিয়ে আমাদের ও একটু কৌতূহল ছিলো। স্বপনকে বললাম, "কোনো সমস্যা আছে?"
স্বপন মৃদু হেসে বলল, "না কোনো সমস্যা নেই। সবাই চাচ্ছিস যখন .... চল্।"

আমরা স্বপনের সাথে চললাম। মেইন রোড, আবাসিক এলাকা ছাড়িয়ে শহরের ঘিঞ্জি একটা এলাকার চিপা-চাপা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

হঠাৎ, গোলাপ জল- আগরবাতির ঘ্রাণ নাকে এলো।

সাচী বলল, "কী রে স্বপন, কোনো ফকির বাবার দরবারে যাচ্ছিস নাকি?"

জারিফ একটা লাফ দিলো। হাতে একটা তালি দিয়ে বলল, "হক মাওলা... । যা ভাবছি ঠিক তাই। সব ফকির বাবার কেরামতি। তাইতো বলি, একটা স্বপনের মধ্যে একসাথে

এত গুণ আসে কোত্থেকে?"
আমার ও কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো।
স্বপন শব্দহীন হাসি হাসছে। কিছু বলল না।

আমরা মাজার গোছের একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। গোলাপজল আর আগরবাতির ঘ্রাণ ওখান থেকেই আসছে। এখানে ওখানে কিছু মাজারপ্রিয় লোক দেখতে পেলাম। আর দেখতে পেলাম অদ্ভুত একদল শিশু। এদের কারো হাত নেই তো কারো পা, কারো ঠোঁট কাটা তো কারো কান। সবারই তো কোনো না কোনো শারীরিক সমস্যা আছে।

আমাদের দেখেই ওরা লাইন হয়ে দাঁড়ালো।

ব্যাপারটা কী?

জারিফ বলল, "গার্ড অব অনার দিচ্ছে মনে হয়।"

আমরা হেসে উঠলাম। স্বপনও হাসলো। হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলো বাচ্চাগুলোর দিকে। ব্যাগ থেকে একটা চকলেটের প্যাকেট বের করলো।

প্রত্যেকের হাতে একটা করে চকলেট দিলো। তারপর ব্যাগ থেকে পুরানো পত্রিকা বের করে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিলো। এবার বের করলো আরো দুটো প্যাকেট। একটি থেকে বের হয়ে এলো মুড়ি, অন্যটি থেকে চানাচুর।

ওয়াটার বোতলের পানি দিয়ে হাতটা একটু ধুয়ে মুড়ি চানাচুর মাখালো বেশ করে। তারপর ইশারায় বাচ্চাগুলোকে ডাকলো।

বাচ্চাগুলো লাইন ধরেই এগিয়ে এলো। তারপর মুড়ি-চানাচুর ঘিরে গোল হয়ে বসে খেতে লাগলো।

এবার স্বপন আমাদের দিকে ফিরল। বলল, "বন্ধুরা, এই হল আমার একটু কাজ, প্রতিদিন ছুটির পর এখানে আসি।" টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে কেনা কিছু খাবার ওদেরকে দিয়ে যাই। অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে। কেন যেন ওদেরকে খুব আপন মনে হয়।

একটু থেমে নিজের বাম হাতটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে "হয়তো এই হাতটির জন্যই।"

তারপর তাকালো বাচ্চাগুলোর দিকে। হাসিমুখে বললো, "ওদের কষ্টটা বোঝার মানুষ তো খুব কম, তাই একটু ওদের কাছে আসি।"

আমাদের মুখে কোনো কথা বেরলো না। অবাক চোখে তাকিয়ে আছি স্বপনের দিকে। দেখতে দেখতে চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। চোখ দুটো হঠাৎ কেন যেন ভিজে উঠেছে।

বাকি দুজনের অবস্থাও দেখলাম তাই। সাচী চশমা দিয়ে চোখ আড়াল করার চেষ্টা করছে। জারিফের চোখে আমি কখনো পানি দেখিনি। তারও চোখ দেখলাম ভেজা। আচমকা সে এগিয়ে এসে স্বপনকে জড়িয়ে ধরলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেলো প্রিন্সিপাল স্যারের কথাটি। স্বপনের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি বলেছিলেন "অন্ধকার মানেই কালো নয়; কালো ঠিকরেই ছড়িয়ে পড়ে আলো।"

আকাশের দিকে তাকালাম।

স্বপন আমাদের বন্ধু। গর্বে আমার বুকটা ভরে উঠলো।

পরক্ষণেই মনে হলো, এমনটাই তো স্বাভাবিক। ডিআরএমসির ছেলেরা তো এমনই হয়। ডিআরএমসির মতো স্বর্গলোকেই তো দেখা মেলে এমন স্বপনদের।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

হোযায়ফা
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- যার বিশাল অস্তিত্ব পড়ে আছে বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইল জুড়ে, যার জন্ম না হলে স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ- দুটি নাম, একটি ইতিহাস। এক এবং অভিন্ন সত্তা। যেন মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস রচনায় রাখেন অগ্রণী ভূমিকা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট গঠন, আটান্নর সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা স্মর্তব্য।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দেন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়রা খাতুন। দুই ভাই আর চার বোনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো কাটে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। বাবা-মা আদর করে ডাকতেন 'খোকা'। বাল্যকাল ও কৈশোর থেকে সংগ্রাম শুরু করা বঙ্গবন্ধু সারাজীবন একটিই সাধনা করেছেন-আর তা হচ্ছে বাঙালি জাতির মুক্তি। নিজের মধ্যে লুকায়িত রাজনীতির বীজ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে দ্রুত অঙ্কুরোদগম হয়। তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ করলেই বুঝতে পারি কী অসীম সাহসী, গভীর স্বদেশপ্রেমিক, সুনিশ্চিত লক্ষ্যভেদী এক জনদরদীর জন্ম হয়েছিল এই অভাগা দেশে।

'তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?' সোহরাওয়ার্দীর এমন প্রশ্নের জবাবে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া শেখ মুজিব সেদিন বলেছিলেন, 'কোনো প্রতিষ্ঠান নাই, মুসলিম ছাত্রলীগও নাই। ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী', শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ, ১১)। সংগ্রামের শুরু- বাকি জীবন জেল-জুলুম আর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি বলেছেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।'

১৯৪৭ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ও অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, এই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাঙালিরা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হবে। তাই ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন গ্রেফতার ও কারাবন্দি হন-যা ছিল মাতৃভাষার আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ।

বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে পূর্ববঙ্গ পরিষদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে-এ মর্মে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের নাজিমউদ্দিন সরকার চুক্তিবদ্ধ হলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে তিনি যুগ্ম সম্পাদকের পদ লাভ করেন এবং ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। প্রাণপ্রিয় এ নেতা ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করলে তাঁর ওপর নেমে আসে দুঃসহ কারাজীবন, অমানুষিক নির্যাতন। শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলে জনগণের আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার, ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল গণসংবর্ধনায় ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৭০ সালে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলেও সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল

ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেদিনই তিনি ঘোষণা করেন, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকেই ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। এরই মধ্যে ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক এ ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।"

১৯৭১ সাল ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত। এই রাতে প্রায় ৫০,০০০ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল'-এর তথ্যমতে, গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ঘোষণাটি ইপিআর এর ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হন শেখ মুজিবুর রহমান, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে দ্রুত দেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করা, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি করা এবং মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়-যা 'মুজিবনগর সরকার' নামেও পরিচিত। দেশের বীর জনতা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। পাকিস্তানের মিওয়ানওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করে ১১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর এরই মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পথচলা। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান অসীম দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার অসাধারণ বজ্রকণ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য জাতি তাঁকে 'জাতির জনক' হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর খুব বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার সুযোগ না পেলেও যতটুকু সময় ক্ষমতায় ছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনে অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি ক্ষমতা লাভের পর কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর দেশত্যাগ করা এবং মুক্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ করায় তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ (United Nations, ১৯৭৪), জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM, ১৯৭২) ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC, ১৯৭৪) সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৭৪ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রদত্ত 'জুলিও কুরি' পদক লাভ করেন।

দেশ যখন সকল বাধা দূর করে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন একদল বিপদগামী সেনা সদস্যের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহিদ হন। তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। লাল-সবুজের পতাকায় তিনি হয়ে আছেন চির স্মরণীয়-বরণীয়। আজ বিশ্বব্যাপী যেখানেই মুক্তির সংগ্রাম, সেখানেই অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধু।

ফিদেল কাস্ট্রোর চোখে বঙ্গবন্ধু ছিলেন হিমালয়ের মতো। ২০০৪ সালে বিবিসির বাংলা রেডিও-সার্ভিসের জরিপে শেখ মুজিব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবেচিত হন। ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শোকদিবসের অনুষ্ঠানে তাঁকে 'বিশ্ববন্ধু' (ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

তিনি সময়ের এক চুল হেরফের করতেন না। ঘড়ি ধরে অনুষ্ঠানে যেতেন। নীতির প্রশ্নে ছিলেন অটল। মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে আপন করে নেওয়ার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। শিশুদের প্রতি ছিল অপার ভালোবাসা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অনন্য নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনক। তাই আজও তিনি দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান।

স্টুডেন্টস
কর্নার

ছড়া ও কবিতা

রেসিডেনসিয়াল স্কুল

মোঃ ফাহিম শাহরিয়ার
কলেজ নং: ১১১৫১
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ক (দিবা)

ক্লাস থ্রি-তে পড়ি আমি
রেসিডেনসিয়াল স্কুলে।
দুপুর বেলা স্কুলে যাই
ব্যাগটি কাঁধে তুলে।
নীল, সাদা ড্রেস পড়ে
রঙিন ব্যাগ পিঠে
স্কুলেতে ছুটে যেতে
লাগে দারুণ মিঠে।
পড়ালেখা করে আমি
রাখবো দেশের মান
বড় হয়ে বাড়াবো এই
স্কুলের সম্মান।

আমায় খেলতে দাও

আফ্‌ফান ইবনে মুনাজ্জাম
কলেজ নং: ১১১৬২
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

বাবা বলেন ডাক্তার
চাচা বলেন কবি
মা বলেন ইঞ্জিনিয়ার
তুই যে হবি ই সবি।
আমি বলি খেলব আমি
ব্যাট বল নিয়ে
বন্ধুদের সাথে ঐ
সবুজ মাঠে গিয়ে।
শুনে বাবা চোখ পাকায়
মা আসে তেড়ে
"পড়াশোনায় তোর কি
মন লাগে না ওরে!!"
আমি বলি করব খেলা
এটা আমার ছেলেবেলা।

কর্মফল

রাইয়ান বিন রাশেদ
কলেজ নং: ১১২১৬
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

লেখাপড়া করে যে,
জ্ঞান বৃদ্ধি করে সে।
খেলাধুলা করে যে,
স্বাস্থ্য ভালো রাখে সে।

আল্লাহকে ভয় করে যে,
নামাজ, কোরআন পড়ে সে।
সত্য কথা বলে যে,
বিশ্বাস অর্জন করে সে।

সময়ের মূল্য দেয় যে,
জীবনে বড় হয় সে।
মা-বাবাকে সম্মান করে যে,
সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভ করে সে।

দেশকে ভালোবাসে যে,
দেশের সাহায্য করে সে।
যেমন কর্ম তেমন ফল,
রেখো শক্ত মনের বল।

মুজিব

মুত্তাকিন সামিউন হাক্ব
কলেজ নং: ১১২১১
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

বঙ্গবন্ধু মুজিব তুমি
তুমি জাতির জনক,
তুমি হলে বঙ্গজাতির
সাহসের সঞ্চারক।
স্বাধীনতার ঘোষক তুমি
তুমি সবার সেরা,
তোমার জন্যে নির্মূল হয়েছে
পাকিস্তানি শত্রুরা।
তুমি হলে সবার প্রিয়
সবার সেরা নেতা,
তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়
বিচক্ষণ জনতা।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা

সামাউন সাইফ সরদার
কলেজ নং: ১১১৭৪
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা : গ (দিবা)

বাংলা আমার প্রাণ।
বাংলা ছাড়া বাজে নাতো
কোনো সুরের গান
বাংলায় হাসি বাংলায় কাঁদি
বাংলায় কথা বলি বলে
তৃপ্তি অনেক পাই-

বাংলা ভাষার মিষ্টি সুরে,
আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
বাংলা ভাষার ছন্দ ছায়ায়
ফিরে আসি শিশুবেলায়।
বাংলা ভাষার ভালোবাসায়
আদর দিও তুমি আমায়।

দুষ্টু ছেলে হীরু

আইমান হামিদ দীপ্ত
কলেজ নং: ১১২৪৬
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে
নাম ছিল তার হীরু,
পড়তে বসলে খেলার খবর
ভূতের ভয়ে ভীরু।
অংক কষতে বললে তাকে
বাংলা বই মেলে,
ইংরেজিটার কথা শুনলে
সমাজের বই খোলে।
বিজ্ঞানে অতি পাকা
একশতে পায় ছয়,
ধর্মের বই পড়তে গেলে
হা করেই রয়।
ছাত্র ভালো হীরু মোদের
খারাপ মোটেও নয়,
হীরুর বাবা পাড়ায় পাড়ায়
সবার কাছে কয়।

আমার মা

আদিব মাহমুদ
কলেজ নং: ১৭২৩১
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

আমার দিনগুলো চলে যায়,
প্রিয়জন নাই যে দুনিয়ায়।
যে তোমায় এত ভালোবাসত
তাঁর কথা কি যায়রে ভোলা যায়?
তাঁর স্মৃতি আমার চোখে ভাসে
আমার দুঃখ পানি হয়ে ঝরে।
যখন আমি ভর্তি হই স্কুলে
মা মারা যায় তার দুমাস আগে।
মা আমার মা,
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।
আমি তোমার ছেলে মাগো
থাকি তোমার সঙ্গে,
তোমার সঙ্গে থাকতে আমার
স্বপ্নের মতো লাগে।
আমি যেন চিরদিন মনে রাখি
মাগো তোমার স্মৃতিগুলি।

তাদের মাঝে

আতিকুল হক সৌরভ
কলেজ নং: ১৫১০৪২৩
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

আজকে যারা শিশু-কিশোর
ছোট্ট খোকা-খুকু,
তাদের মাঝেই হতে পারে
কেউবা রবি-দুখু।
তাদের মাঝেই হতে পারে
কেউবা এডিসন,
তাদের মাঝেই লুকিয়ে আছে
কত না গুণিজন।

দেশপ্রেমিক

আবতাহি বখতিয়ার রোহান
কলেজ নং: ১০২৪৫
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

বাংলাদেশের মানুষ মোরা
বাংলাতে কথা বলি,
দেশের মায়া ভরা দৃশ্যগুলো
ভালোবেসে চলি।

দেশকে ভালোবেসে আমি
নদী হতে চাই,
সারা বাংলা ঘুরবো আমি
কোন বাধা নাই।

দেশকে ভালোবেসে আমি
বাউল হতে চাই,
অনেক অনেক গান শুনাবো
মনে-প্রাণে গাই।

দেশকে ভালোবেসে মরণ
যেন হয়,
বুঝাবো এটা মরণ নয়
দেশপ্রেমিকের জয়।

মুজিব মানে বাংলাদেশ

মেহেরাজ হোসেন
কলেজ নং: ১৫১০১৮৬
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

যতদিন এই দেশের মাটিতে
একটি মানুষ থাকবে
ততদিন বঙ্গবন্ধু
তোমাকে মনে রাখবে।

পাখিদের গানে, বাতাসের সুরে
তোমার নামটি আসে ঘুরে ঘুরে
সাগর-নদী ও ঝরনাধারায়
চিরদিন তুমি ভাসবে।
দূর থেকে দূরে, ঘুরে ঘুরে ঠিকই
ফিরে ফিরে তুমি আসবে।

নীল আকাশের তারা হয়ে তুমি
সবার হৃদয়ে ফুটবে,
তোমার নামেই মানুষ ঘুমাবে
তোমার নামেই উঠবে।

বিভেদ দেয়াল

জাহিদ হাসান কাব্য
কলেজ নং: ১৪৬১৫
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (প্রভাতি)

ভূপতি, তোমার অর্চনা করি
কনক বদনে দাগ লাগিয়ে লুটেছ সোনার তরী।
সেজেছ ইন্দ্র ইন্দ্রজালে, হওনি ইন্দ্রজিৎ
করেছ আশা ইন্দ্রপুরীর, না চেয়েই নরের হিত।

ললাটে তোমার অট্টালিকা, সৈন্য দেখনি কভু
ক্ষুধার দহন প্রজার রোদন, করনি শ্রবণ তবু।
শয্যা তোমার নরম তুলোয়, বুঝতে মাটির মেঝে?
তাতেই হর্ষ তাতেই বিষাদ, কী লাভ বাদশা সেজে।
নৃপতি, তোমারি চরণ চুমি।

হেসে কুটি কুটি লুটিয়া দেদার কিষাণ স্বর্ণভূমি।
ছিনেছ আবাস হাজার কয়েক গেয়ে স্বার্থের গান
বক্ষে প্রজার চরণ রাখিয়া, হয়েছ মহিয়ান।

শোকগাঁথা গায় আজারি ফকির, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
উদরে বাঁধিয়া কঠিন শিলা, ভাত চাই মোর ভাত চাই।
কর্ণপাত কভু করনি স্বামী বুঝনি ক্ষুধার ধরন
কার খাবারে মিটেছে ক্ষুধা, করনি তাদের স্মরণ।

পরিশেষে, গাই তাদেরই গান-
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা, করে হাসিমুখ দান।
তারাই দেবতা তারাই ঠাকুর তাদেরই চিরখ্যাতি
তাদেরই শ্রমে পূর্ণ হয়েছে বিশাল এ মানবজাতি।

চাষাভুষার মিছিল থেকে

এস.এম. ইবনুল ওয়াসিফ
কলেজ নং: ১৬৩৭০
শ্রেণি: দশম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

চাষাভুষার মিছিল থেকে
মিছিলের মাঝে পা ঠেলেছি
উদ্দাম বেগে ঝড়ের মতো,
কণ্ঠে আমার স্লোগান তুলেছি
পুড়িয়েছি পাপ-ভীরুতা যত।

কামারের ঐ হাতুড়ির ঘায়ে
কঠোর করেছি মুখের ভাষা,
কুলির মতো খাটিয়েছি দেহ
রাজপথ মাঝে হয়েছি চাষা।

যাদের রক্তে বিশ্ব রাঙা
বলো তাদের শ্রেষ্ঠ সবার
এই দাবিতে চলছি মোরা
রাত্রি দিন অনর্গল;
সত্য পথের পথিক হ সব
এবার মোদের সঙ্গে চল।

ইচ্ছে

তানভীর হোসেন শিশির
কলেজ নং: ১১৪৪২
শ্রেণি: একাদশ, শাখা : ঙ (দিবা)

ইচ্ছে করে পাখির মতো
দূর গগনে জমাই পাড়ি
ইচ্ছে করে দূরে যেতে
কোলাহলময় শহর ছাড়ি;
ইচ্ছে করে প্রজাপতি হয়ে
ফুলে ফুলে বেড়াই উড়ে
নিখিল জগৎ আসি ঘুরে।
ইচ্ছে করে আলোর মাঝে
কালোর কষ্ট নিতে খুঁজে
আলো কালোর রঙ্গশালায়
জীবনটাকে নিতে বুঝে।
ইচ্ছে করে ইচ্ছে যত
আছে মনের মাঝে,
সবগুলো তার সাজিয়ে রাখি
পদ্য পাতার ভাজে।

গুজব

তানভীর আহমেদ (রিফাত)
কলেজ নং: ১১৭৩০
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ক (দিবা)

মাটির মানুষ করলো কবেই
চাঁদ মামাকে জয়,
তবুও আজও তারাই নাকি
পায় জুজুকে ভয়!

কান নিয়েছে চিলে বলে
করছে তাকে তাড়া,
সেতুর জন্য সবার মাথা
কেটে করেছে সারা।

পাগলা পদ্মা জয় করে
গড়ছি যখন সেতু,
ছড়িয়ে গুজব লাভটা যে কার
না জানি তার হেতু।

আর কর না এমন ভুল
কান-দিয়ো না গুজবে,
দেখ চেয়ে বিশ্ব ছুটছে
মঙ্গল জয়ের সুযোগে।

গুজবে কান না দিয়ে
মাথাটাকে খাটাও-
চলার পথের সকল বাঁধা
শক্ত হাতে হটাও।

জাগ্রত কণ্ঠস্বর

অমিত কবিরাজ
কলেজ নং: ১৭৩৬৮
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

লজ্জার চাদরে আচ্ছাদিত আজ, লজ্জিত স্বাধীনতা
মুক্তির নামে কারারুদ্ধ তাই, নিষ্পেষিত জনতা।
সাম্যের নামে লড়াই করে, কতো না ধরনের নেতা
সবাই তো নয় আত্মত্যাগী, যেমন জাতির পিতা!

মনুষ্যত্বের নামে যারা শ্লোগান দিয়ে যায়
অত্যাচারের প্রথম আঘাত তারাই ফিরে পায়।
দুর্নীতি আর কালোবাজারি নেতার হাতে বন্দি
আইন-আদালত করছে আজ তাদের সাথে সন্ধি।

প্রতিবাদের শব্দগুলো মানুষ ভুলে যায়,
গরিব, দুঃখী পায় না খুঁজে শেষ আশ্রয়, সহায়!
কবির লেখা-লেখা হয়েই মুছে যাবে ভাই
সারা দেশে পাঠক আছে-জাগ্রত মানুষ নাই...

হাজার রকম বই পড়ে যে ছাত্রের দিল শেষ
পাইনি খুঁজে অন্তঃপুরের মানবতার লেশ
হায় হায় শিক্ষা, নাই সত্যের দীক্ষা
দিনের শেষে শব্দহীনের করতে হবে ভিক্ষা।

কোথা থেকে এসেছিলে

সুমন কুমার দাস
কলেজ নং: ১১৪৫৯
শ্রেণি : একাদশ, শাখা: ক (দিবা)

কোথা থেকে এসেছিলে, কোথায় যাবে চলে?
কোথায় তোমার শেষ ঠিকানা, কেবা তোমায় বলে?
সময় তোমার ফুরিয়ে গেল, নেইতো তার খোঁজ,
দিনের পর দিন তুমি, করেছ শুধু ভোজ।
এইতো সময় এখনি মনে হয় যেতে হবে ছাড়ি
কেন তুমি করলে এত সম্পদ বাড়ি-গাড়ি?
জীবনটাকে চালিয়ে নিলে, নিজের ইচ্ছে মতো,
করলে তুমি সকল কিছু, যা ছিল হিত।
কত নিদ্রায় গেলে তুমি–উঠলে হাসিমুখে,
দিন ফুরালে যাবে চলে, দেখবে না তো চোখে।

মা

হোসাইন আল জাহীন
কলেজ নং: ১৭৩২১
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

আমার জীবনের আদর্শ তুমি, অনুসরণীয় অনুকরণীয়
তোমার আদর্শ, তোমার স্থান, আমার জীবনে বরণীয়।
ছেলেবেলা হতে দেখেছি তোমায় কতই নানানভাবে
কঠোর শান্ত দৃঢ়, নরম সবই ছিল স্বভাবে।
ভুল করলে হয়তো খুবই কঠোর হয়ে যেতে
একটু পরেই আদর করে মুখে খাবার দিতে।
হায়রে সেই সোনালি দিন, আজও চোখে ভাসে
আজীবন এভাবেই তুমি থেকো আমার পাশে।
তোমায় যে কত ভালোবাসি বলতে পারি না মুখে
শুধু বলি, সবসময় থেকো পাশে সকল সুখে-দুঃখে।

নিহত নক্ষত্রের রাত অথবা দু একটি হাসনা হেনা

রাইদ রাফসান
কলেজ নং: ১৭৬৪৭
শ্রেণি: একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

স্নিগ্ধ একটা হাওয়ার শীতল ঝাপটায়
হাসনা হেনার ডালটা আরেকটু ঝুঁকে পড়ে
নক্ষত্ররা বড়ই নিষ্ঠুর।
দূর নিশাচরদের বাড়ি ফেরার সময় হয়
হাসনা হেনার কোমল গন্ধে আকুল দু একটি
শিশির ঘাসের ডগায় ঝরে পড়তে ভুলে যায়-
মন্ত্রমুগ্ধ শ্বাপদের আগমনে
হাসনা হেনার মায়াময় জীবন সার্থক হয়।
ধূসর বিষণ্ন আরেকটি রাত কেটে যায়
সভ্যতার লালিমার বুকে আরেকটি আঁচড় কেটে।
শরতের বুনো জ্যোৎস্নায়
গভীর রাতের মৃতপ্রায় স্বপ্নরা জীবন্ত হতে
বাদুড়ের পাখা ঝাপটানিতে জেগে ওঠে কয়েকটি পাখি
পাতার মর্মর ধ্বনি ছাপিয়ে যায় ঝিঁঝির আর্তচিৎকার।
ঘুমিয়ে থাকা নিস্তব্ধতা সজাগ হতে থাকে
ইজিপ্সিয়ান নাচের সুর ছাপিয়ে ভেসে আসে মুহুর্মুহু
নির্ঘুম জেগে থাকা প্রবীণ বৃদ্ধে ঘোলাটে হলুদ চোখ
জানান দেয় মৃত্যুর তাগিদ।
নীরবে-নিভৃতে ক্ষুধিত লোক চক্ষুর অগোচরে
একের পর এক তারারা খসে পড়ে।
ঝরতে থাকে হাসনা হেনারা-
ঝিঁঝি পোকার ডাক হঠাৎই থেমে যায়
হিমশীতলতা বয়ে বেড়ানো বায়ু থমকে দাঁড়ায়
নীরব নিস্তব্ধতা আঁধারের টুটি চেপে বিলীন হতে থাকে।
এ রাত নীরবতার, এ রাত শোকের
এ রাত নিহত নক্ষত্রের
এ রাত ঝরে পড়া গুটি কয়েক হাসনা হেনার।

রেমিয়ানের অর্থ

আকিব সুলতান অর্নব
কলেজ নং: ১৭৪৩১
শ্রেণি: একাদশ, শাখা : খ (প্রভাতি)

রেমিয়ান চার অক্ষরের একটি শব্দ নয়
বরং এটা সহস্রজনের মাঝ থেকে উচ্চারিত একটি শব্দ।
জানতে চাও রেমিয়ানের অর্থ?
তবে জানতে হবে বায়ান্ন একরকে
জানতে হবে এর ইতিহাস।
রেমিয়ানের মধ্যে আছে সততা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতা
সর্বোপরি দেশের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা।
রেমিয়ান অর্থ-বায়ান্ন একরের মাঠে ঘুরে বেড়ানো নয়
বরং ঐ মাঠগুলো থেকে উঠা আসা
একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নেতা।
রেমিয়ান অর্থ-বিপদে সংগ্রামে পিছিয়ে যাওয়া নয়
বরং বিপদে অন্যকে সাহায্য করা, সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়া।
তুমি দেখেছ রেমিয়ানরা সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত
এর অর্থ জানো তুমি?
এর অর্থ রেমিয়ানরা যেকোনো সময় জীবন দিতে প্রস্তুত
তার দেশের জন্য বা তার অন্য ভাইয়ের জন্য।
বায়ান্ন একরে ঢুকতেই দেখবে দুটি তেজী ঘোড়ার ভাস্কর্য
এর অর্থ জানো তুমি?
এর অর্থ এখানকার সবাই উৎকর্ষ উদ্যমে তেজী।

অবিসংবাদিত নেতা

তানজির রহমান
কলেজ নং: ১৭৬৪৮
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

অবিসংবাদিত নেতা
দিয়েছি তোমায় নিবেদিত প্রাণ
হে দেশমাতা
হয়েছি অমর মানুষের কাছে
লেখা আছে বীর গাঁথা।
আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
দিয়েছি আমার জান
কেড়ে নিতে দিইনি তোমার ভাষা
ফিরিয়ে এনেছি তোমার প্রাণ।
দুশো বছরের উপনিবেশে ছিল শোষণ পরাধীনতা
মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে আজ ভারত পেয়েছে স্বাধীনতা।
ম্যান্ডেলা জানায় ধিক্কার তাদের যারা বর্ণবাদী
যার কারণে অহংকারীর উঠে যায় চামড়ার খাদি।
সাতাশ বছর জেল খেটে যায় তারপর পায় ছাড়া
স্বাগতম জানায় লুথারকিং তাঁকে
নিধন করে অত্যাচারীরা।
ফিদেল কাস্ট্রো, চে গুয়েভারা ছিল প্রাণের দোসর
সশস্ত্র সংগ্রামে থুবড়ে পড়ে শত্রুদের অনুচর।
চে গুয়েভারার সংগ্রামে শত্রুদের হয়েছে পরাজয়
স্বাধীনতা পেয়েছে কিউবা, বলিভিয়া জাতিদ্বয়।

জীবনের গান

এম এ মুনঈম সাগর
কলেজ নং: ১৭২৭৬
শ্রেণি: একাদশ, শাখা : চ (প্রভাতি)

দুঃখ যদি আসে তবে
মনকে দিবি সান্ত্বনা,
বলবি, ও মন দুঃখটাকে
ভাবিস না তুই যন্ত্রণা।
সুখ-দুঃখতেই মানবজীবন
থাকবে না সুখ আজীবন,
এই নিয়ে কাঁদলে রে মন
কাঁদতে হবে আমরণ।
জীবন যদি সুখের হতো
দুঃখকে তুই চিনতি না,
অনাহারীর অন্ন বিনে
দুঃখ কী তা জানতি না।
সুখ দুঃখতেই জীবন গড়ি
সবার তরে যুদ্ধ করি,
এই আশাতেই বুকটি বেঁধে
জীবন নদের হালটি ধরি।
স্বার্থটাকে মুখ্য করে
থাকবি না আর অন্ধকারে,
স্বার্থত্যাগী মানুষ হয়ে
চিনবি আলোর পথটারে।

আমি বলছি

দীপ শেখর দত্ত
কলেজ নং: ১৭৭০৮
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

আমি আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারা বলছি
আমি এই পৃথিবীর সৌন্দর্য বলছি
বন্ধ কর নির্মমতা, বন্ধ কর তোমাদের শোষণ-নির্যাতন।
আমি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের একটি শিশু হয়ে বলছি–
বন্ধ কর এই অসুর নৃত্য।
আমি আর্ত কান্নার ধ্বনি হয়ে বলছি–
আমাকে আঁকড়ে ধরে মানুষকে ভালোবাসো।
আমি শাসককে বলছি, শোষককে বলছি–
দুঃখ-দুর্দশা, কান্না ঘুচাতে বলছি।
আমি আনন্দকে ডাকতে বলছি–
আমি পৃথিবীকে নতুনভাবে সাজাতে বলছি।

ভালবাসার বায়ান্ন একর

মৃন্ময় হাসান নিরব
কলেজ নং: ১১৮৫৫
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ক (দিবা)

আমি হারিয়ে যেতে চাই ডিআরএমসির মনোমুগ্ধকর প্রাঙ্গণে
আমি হারিয়ে যেতে চাই নতুন জীবনের নতুন মোড়ে
আমি মিশে যেতে চাই হাজার পাঁচেক রেমিয়ানের মাঝে
আমি ডুবে যেতে চাই শিক্ষক-শিক্ষিকার স্নেহের বাহুডোরে।
আমি অবসর কাটাতে চাই-
ভালোসার বায়ান্ন একরের প্লে গ্রাউন্ডে
বাস্কেট বল, ফুটবল আর ক্রিকেট খেলে
অংশ নিয়ে কবিতা আবৃত্তি আর গানে।
আমি দীক্ষিত হতে চাই-
ভালোবাসার ডিআরএমসির মূলমন্ত্রে
শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, দেশপ্রেম আর সেবার মহীমায়।
আমি বার বার ফিরে আসতে চাই-
আমার ভালোবাসার সবুজে ঘেরা বায়ান্ন একরে।

প্রপঞ্চ

মোহাম্মদ নাফিস ইব্রাহিম
কলেজ নং: ১৬৬৩০
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: চ (প্রভাতি)

দুচোখ আমার যদ্দুর যায় দেখি হলুদ জমিন
চোখে দেখি সরষেফুল চকচকে রঙিন।
আলপথ ধরে কার পায়ের ছাপ অনুসরণ করি,
ব্যস্ত ভ্রমর আমায় ডাকছে, বাইব সোনার তরী।
সরষে বাগানে এক ছটকি স্বর্গ যেন উপচে পড়ে,
আমি স্বপ্ন দেখি হাজারবার, আমার আঁধার ঘরে।
আবার দেখি নীলাকাশ, মেঘহীন নীলের চাঁদর
সরষেবীজে বুনব আগামী, সরষের বড় কদর।

হঠাৎ ভাঙে জমাটবাঁধা অন্ধকারের প্রদীপখানা
দুঃখ আমায় দেখিয়ে দেয়, সুখ-স্বপ্ন দেখতে মানা
চোখের নিচে কালশিটে, পাঁজর খাঁচা ভাঙা
কোথায় গেল সরষেফুল সব যে ছিল হলদে রাঙা?
দুচোখ আমার পুড়ছে আবার, সরষে ফুলের আগুনে,
স্বর্গ আবার আসবে হয়ত, এ জীবনের ফাগুনে।

স্বাগত নতুন তোমায়

শেখ সাদী হাসান (নাবিল)
কলেজ নং: ১০৬৭৫
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা : ঘ (দিবা)

স্বাগত জানাই তোমাকে আমি
সবার মাঝে থাকতে
স্বাগত জানাই তোমাকে আমি
সবুজের মাঝে বাঁচতে।
স্বাগত হে নতুন তোমায়-
বায়ান্ন একর জমিতে
স্বাগত তোমায় হৃদভূমিতে।
বুকভরা নানা স্বপ্ন নিয়ে
এসেছ নতুন তুমি,
স্বাগত, তোমার স্বপ্নকে
তোমায় বরণ করবো আমি।

মৃত্যু-আনন্দ

লাবিদ আল আহাদ আরাফ
কলেজ নং: ১৬৫৯৩
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ঘ (দিবা)

কিশোর আলো অনেক ভালো
আনিসুল হক তাই বলে,
তড়িতাহত হয়ে ভাইটি আমার
কালঘুমে ঢলে পড়ে।

দ্বিতীয় ঘণ্টার নিরবতায়
ভাইয়ের জানটি নিলে,
এক মিনিটের নিরবতা
জাতিকে কেন দেখালে?

ন্যাকামিটা ছেড়ে এবার
আসল কথায় আসো।
অবহেলা ছিল অনেক
এ দায়টা স্বীকার করো।

যাদের জন্য কি'আনন্দ
তারাই সেখানে মরে।
অনুষ্ঠানটির নামটি এবার
বদলিয়ে ফেলো তবে।

কী আসে যায় তোমাদের ভাই
জীবনতো তোমাদের নয়,
অনুষ্ঠানটাই সবচেয়ে বড়
মানবিকতা নয়।

কবিতা নাহি লিখতে জানি
বলেছি মনের কথা,
তোমরা কি করে বুঝবে রে ভাই
ভাই হারানোর ব্যথা।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি

ছোটভাই 'রাজিন'

মেজবাহ উল আলম তাসিন
কলেজ নং: ১১২৭৩
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিতে যেন আমার চেয়ে এগিয়ে। দুষ্ট হলেও চালাক। বাসার সবাই আমাকে তাসিন বলে ডাকে। এর সাথে মিল রেখেই ছোটভাইটির নাম রাখা হয়েছে 'রাজিন'। আমার ছোটবেলায় মায়ের কাছে আবদার ছিল, আমার যদি একটা ভাই থাকত তাহলে আমি খেলতে পারতাম। প্রতিবেশী অর্ক তার ছোট ভাই অর্ণবের সাথে বাসায় বসে খেলে। তানিমের ভাই তিহাম আছে। জন্মের পর থেকেই দেখতে দেখতে কেমন করে ছোট ভাইটার ৩ বছর পার হয়ে গেল। ভাবতেই পারি না।

ছোটভাইটির খেয়াল খুশি এত বেশি যে, কোন কিছুতেই কোন অমনোযোগ নেই। বাবা-মা আমাকে কোনো অর্ডার করলে ও শোনামাত্রই খুব দ্রুত কোন কিছু এনে দিত। ও আমাকে সব সময়ই কাছে পেতে চায়। আমি কী করি, কেমন করে কথা বলি, কেমন করে ঘুমাই সব কিছুতেই অনুকরণ করে। ওর বয়স যখন দুই বছরের মধ্যে ছিল তখন মা আমাকে ইংরেজি গ্রামার 'Parts of Speech' সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে ওকে বলা হতো ভাইয়া এটা কী বলত? এটা কী বলত? মোটামুটি সবই দেখে দেখে পারত।

তারপর আমি আমার মাকে বলতাম, মা ওতো সবই চিনতে পারে। মা বলত, আরে বাবা ও সবই চিনে কিন্তু একটা জিনিসই চিনে না সেটা হলো 'Adjective' এ কথা শুনেই বেশি হাসি পাচ্ছিল। তখন ও কোনো কিছু না বুঝেই হাসছিল। বেশ মজাই লাগত। ছোটভাইটির ৩ বছরের বার্থডে হওয়ার আগে থেকেই বলত 'Happy Birthday' হেপি বার্থ ডে টু ইউ। হেপি বার্থ ডে টু রাজিন। যদি ওকে বলতাম ভাইয়া তোমার বয়স কত? ও বলত তিন বতর (বছর)। আমি বলতাম তোমার বয়স ৩ বতর (বছর)? ও বলত, আরে না তুমি ভুল বলছো, তিন বতর হবে। মুখে আসছে না বছর কথাটা এমনকি এখনো আমাকে তাতিন (তাসিন) ভাইয়া বলে ডাকে।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে চান্স পাওয়ার পেছনে আমার ছোটভাইটির অবদান অনেক। এমন একটা ছোটভাই না থাকলে এরকম কোনো অনুভূতিই হতো না। মিষ্টি মধুর ছোটভাইটি সারাজীবন সুস্থ থাকুক, ভাল থাকুক। জীবনে ও যেন বড় কিছু হতে পারে। আমি সবসময় ওর জন্য দোয়া করি। আমি ওকে অনেক অনেক ভালোবাসি।

ঈগলের শিক্ষা

ফাহিম হোসেন সিয়াম
কলেজ নং: ১৬১৩২
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

এক ঈগল আর এক শেয়ালীর মধ্যে খুব ভাব। ঈগল বাসা বাঁধে অশ্বত্থ গাছের এক উঁচু ডালে। সেই গাছের নিচে বাস করে শেয়ালী। দিনের শেষে দুজনে বাসায় ফিরে আসে। এমন করেই দুই বন্ধুর দিন কাটছিল। শেয়ালীর ছিল তিনটা শাবক। ঈগলের ছিল কয়েকটা ছানা।

দুই মা বাচ্চাদের লালন পালন করতে ব্যস্ত। একদিন শেয়ালী খাবারের জন্যে বনের বাইরের গ্রামে গেল। ঈগলও তার বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে আসল। তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ভর করল। ঈগল শেয়ালীর একটা শাবক নিয়ে নিল তার বাচ্চাদের জন্য। এদিকে শেয়ালীও ফিরে এল। সে এসে দেখল তার একটা শাবক কম। সে বুঝতে পারল এটা কার কাজ।

সে ঈগলকে বলল, "এরকম কেন করেছ?" শেয়ালী আরও বলল, "এখনি আমার শাবক দিয়ে দাও।" ঈগল বলল, "নিজে এসে নিয়ে যাও।" শেয়ালী কিছুতেই গাছে উঠতে পারত না। তাই সে বুদ্ধি বের করল। সে শুকনো কাঠ, ঘাস, পাতা জড় করল এবং গাছের নিচে আগুন ধরিয়ে দিল। জায়গাটা ধোয়ায় ভরে গেল। তাতে ঈগল ও ঈগলের বাচ্চাগুলো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ঈগল শেয়ালীর কাছে ক্ষমা চাইল। শেয়ালী তাকে মাফ করল। তারপর তারা সুখে শান্তিতে সারা জীবন বাস করল।

ক্রিকেটের ইতিহাস

তানজিল ইসলাম
কলেজ নং: ১৬০৭৮
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

আধুনিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ খেলা ক্রিকেট। বর্তমানে ক্রিকেট অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অতি প্রাচীন খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেটের একদম সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও বিভিন্ন বিষয় থেকে জানা যায় ইংল্যান্ডের মাটিতে এর জন্ম। সেখান থেকেই এর বিস্তার। প্রাচীনকালে নিজেদের বাড়ির উঠানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পারিবারের মা, বাবা, ভাই, বোন একসাথে ক্রিকেট খেলতেন। এই প্রক্রিয়াটি ১৩৫০-১৩৫২ কোনো এক সাল থেকে শুরু হয়। ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিরাও খেলা শুরু করেন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরা এই খেলাটির উদ্ভাবন করে। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশেও জনপ্রিয়তা শুরু হয়। ধীরে ধীরে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ক্রিকেটকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক্রিকেটের তিনটি ভাগ হল যথাক্রমে- টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি। নিচে এর সামান্য ইতিহাস উল্লেখ করা হলো-

টেস্ট: ১৮৭৬-১৮৭৭ সাল। ক্রিকেটের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা পাড়ি জমায় সুদূর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। এইভাবেই শুরু হয় টেস্ট ক্রিকেট। তবে তখনকার টেস্ট ক্রিকেটের নিয়ম ছিল ভারি মজার। তখন কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া ছিল না। ১৯৮৪ সালে টেস্টের আধুনিক নিয়ম শুরু হয়।

ওয়ানডে: ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মধ্যকার ৩য় টেস্টটি হয়নি। ফলে দর্শকরা টিকেট কিনে হতাশ বোধ করে। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি হয়নি। তখন উত্তেজিত দর্শকদের শান্ত রাখার জন্য আইসিসি ৪০ ওভারের একটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ উদ্ভাবন করে। প্রতি ওভারে ছিল ৮ বল। পরে অবশ্য এই নিয়ম বদলে দেয়া হয়। ম্যাচটিতে অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জিতে ইতিহাসে মাইল ফলক স্থান করে।

টি-টোয়েন্টি: ২০০৭ সালের ৫ই জানুয়ারি টি-টোয়েন্টি শুরু হয়। টি-টোয়েন্টি একটি উত্তেজনাকর ফরম্যাট। কারণ ২০টি ওভার ভালো রান করার জন্য খেলোয়াড়েরা উদগ্রীব থাকে। তাই টি-টোয়েন্টিও বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

লোভী লোক

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ মাহির
কলেজ নং: ১০৩৯৫
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

এক গ্রামে তমাল নামে এক লোভী লোক বাস করতো। একদিন তার একটা নারিকেল কেনার ইচ্ছা হলো। কাছেই একটা নারিকেলের দোকানে গিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করলো। ''একটা নারিকেল চার টাকা সাহেব,'' দোকানদার বললো। ''চার টাকা কিরে? আমি তোকে তিন টাকা দিতে পারি,'' তমাল বললো। দোকানদার বললো, ''না সাহেব কম দামে আমি দিতে পারবো না। আপনি বরং এক কাজ করুন, মাইল খানেক পথ এগিয়ে যান, সেখানে তিন টাকায় নারিকেল পাবেন।''

লোভী তমাল মনে মনে ভেবে দেখলো ''আমার কাছে টাকার দাম অনেক বেশি, তাই এক টাকা বাঁচাবার জন্য আমি এক মাইল পথ হেঁটে যেতে রাজি আছি।'' এই কথা ভেবে সে চলতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সে আর একটা নারিকেলের দোকান দেখতে পেলো। দোকানিকে সে নারিকেলের দাম জিজ্ঞাসা করলো। দোকানি বললো, ''তিন টাকায় একটা নারকেল পাবেন সাহেব।'' ''তিন টাকা তো অনেক দাম। আমি তোকে একটা নারিকেলের জন্য দুই টাকা দিতে পারি।'' ''না, বাবু। দুই টাকায় দিতে পারবো না।'' দোকানি বললো ''আপনি আর মাইলখানেক রাস্তা এগিয়ে গেলেই দুই টাকায় নারিকেলে পাবেন।''

তমাল ভেবে দেখলো একটা টাকা বাঁচাতে হলে আর একটু হেঁটে গেলেই তো হয়। কাজেই সে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেল এবং আর একটা নারিকেলের দোকান খুঁজে পেলো। দোকানিকে নারিকেলের দাম জিজ্ঞাসা করায় সে বললো ''দুই টাকা।'' ''দেখ আমি এক টাকা দিতে পারি, দিবি তো দে।'' দোকানদার হেসে বললো ''না, সাহেব। আপনি বরং কষ্ট করে একটু এগিয়ে যান। সেখানে গেলেই এক টাকায় একটা নারিকেল পেয়ে যাবেন।'' তমাল তাই শুনে খুশি মনে এগোতে লাগলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে অনেকগুলো নারিকেলের দোকান দেখতে পেলো। একটা দোকানে ঢুকে সে নারিকেলের দাম জিজ্ঞাসা করায় দোকানি বললো যে একটার দাম এক টাকা মাত্র। তমাল অবাক হয়ে বললো ''একটার দাম এক টাকা? কী বলছিস রে ব্যাটা? আট আনা করে দে।''

দোকানদার হেসে বললো এক কাজ করুন সাহেব আপনি বরং নারিকেল গাছে চড়ে নারিকেল পেড়ে আনুন। তাহলে এক পয়সাও দিতে হবে না।

কথাটা তমালের খুব পছন্দ হলো। মনের আনন্দে সে নারিকেল গাছে চড়তে শুরু করলো। গাছের অনেক উপরে উঠে সে যখন শুধু মাত্র দুই হাত দিয়ে আর দুই পা দিয়ে গাছ আঁকড়ে ধরে আর দুই হাত দিয়ে যেই একটা নারিকেল পাড়তে গেল তখনই হঠাৎ করে তার পা ফসকে যাওয়ায় সে গাছের উপর থেকে ছিটকে নিচে বালির উপর পড়ে গেল। যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠলো। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হলো আর তার পাও ভেঙ্গে গেল, তবুও বিনা পয়সায় নারিকেলটা সে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো।

রস ও চার চরণ

রাফি-নূর বেনজীর রুহান
কলেজ নম্বর: ১৬৯৩৩
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন রাজসভায় এসে বললেন, আমি এক দুই তিন করে বিশ পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে কে পারবেন মুখে মুখে একটা কবিতা বানিয়ে আমাকে শুনিয়ে দিতে। কবিতায় আগাগোড়া রস থাকবে, চারটে চরণও থাকবে, আর অর্থেরও অভাব হবে না। যিনি পারবেন, তাঁকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা নগদ পুরস্কার দেব।

এতটুকু সময়ের মধ্যে কবিতা বানিয়ে শোনানো! কার সাধ্যি! ব্যাপারটা অসম্ভব মনে করে সবাই চুপ করে রইল। কিন্তু মহারাজ এক দুই তিন করে যেই না গুনেছেন, অমনি গোপালভাঁড় উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'মহারাজ, আমার কবিতা রচনা করা হয়ে গিয়েছে, শুনুন-

'ভাঁড় ঢুকে বিকালে
খেয়েছে ক্ষীর বিড়ালে'-

একি কবিতা! রাজসভায় লোকজন গোপালের কবিতা শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'এ কেমন কবিতা হলো গোপাল, এতে রস কই? চার চরণ কই, তার ওপরে অর্থই বা কই?'

গোপাল বলল, 'হুজুর, আপনি যে রকম কবিতা চেয়েছেন এতে তো তার কোন কিছুরই অভাব নেই। প্রথমে ধরুন রসের কথা। আপনি বলেছেন কবিতায় আগাগোড়া রস থাকা চাই। সে রস ক্ষীরের চেয়ে বেশি আছে কীসে? আমার কবিতায় সেই ক্ষীরের কথাই তো রয়েছে। তারপর চরণ? সে বিড়ালের কথাও তো আমার কবিতায় আছে। বাকি রইল অর্থ? মহারাজ, সে অর্থ তো আপনি নিজেই জোগাবেন বলেছেন। আপনার সেই ১০০ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হলেই অর্থের ও অভাব হবে না। সবই তো আপনার দয়া।'

গোপালের কবিতার ব্যাখ্যা শুনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হাসতে হাসতে তাঁকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার হুকুম দিলেন।

স্বপ্নের বিদ্যালয়

আজমাঈন ফায়েক চৌধুরী
কলেজ নং: ১০২৫৫
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: খ (দিবা)

২০১৭ সাল। আমার জীবনের স্বপ্ন পূরণের বছর। তখন আমি বরিশাল শহরে থাকতাম। আমি বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ একদিন মামনি আমাকে বলল, আমাকে ঢাকার একটি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। আমি তো হতবাক, আমি তো বরিশালে জিলা স্কুলের জন্য পড়ছি। ঢাকার স্কুলে কীভাবে ভর্তি পরীক্ষা দেব? মামনি বলল, 'তুমি পারবে'। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ আমি ঢাকায় নানা ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে আসলাম। ১৭ তারিখ আমি প্রথম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে আসি। এই স্কুলের গেট দিয়ে আমি যখন প্রবেশ করি তখন স্কুলের মাঠ, গাছপালা, প্রকৃতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই।

এত বড় স্কুলে আমি পড়বো! এত বড় মাঠে আমি ইচ্ছে মত খেলতে পারবো! এই ভেবে আমার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এক বুক আশা নিয়ে আমি বরিশাল ছেড়ে চলে আসি। এরপর ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখ আমি বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। এদিন দুপুরে আমি গ্রিন লাইন ওয়াটার বাসে করে ঢাকায় আসি। পরের দুই দিন আমি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেই। ২৬ তারিখ রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে দেওয়া হয়। মামনি ওই দিন ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল না দেখে আমাকে বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। বাবা আর আমার নানুর অনুরোধে মামনি একদিন পর অনলাইনে আমার ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল দেখে। আমি সত্যিই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমার স্বপ্নের স্কুলে পড়ার স্বপ্ন পূরণ হলো। শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়ের।

জগতের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ প্রাণী

তাইহান আনান
কলেজ নং: ১৪৪৯০
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

এ মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃসঙ্গ প্রাণী একটি তিমি। কেউ তাকে দেখেনি। কেউ জানে না সেটা কোন ধরনের তিমি। নীল তিমি নাকি হ্যাম্পব্যাক নাকি হ্যাম্পারহেড নাকি অন্য কিছু? না দেখা গেলেও সেই তিমির ডাক বা আওয়াজ শোনা যায়। সাগরের অতল থেকে আসা সেই ডাক যন্ত্রপাতি দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে বহুবার কিন্তু তা শুনে তিমিবিশারদদের কেউ এখনো এটির জাত বুঝে উঠতে পারেনি। অন্য কোন জাতের সাথে এটির মিল নেই।

তিমির ডাককে আমরা যদি তিমি ভাষা হিসেবে দেখি তাহলে বলতে হবে এ তিমি ভিন্ন এক ভাষায় কথা বলছে। আর এটাই তার নিঃসঙ্গতার কারণ। এই ভাষা অন্য তিমিরা বুঝতে পারে না। তার ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। কেউ তার কাছে আসে না। প্রায় ৩০ বছর ধরে মহাসাগরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একা একা নিষ্ফল ডেকে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা তিমিটির নাম দিয়েছে ৫২ হার্টজ তিমি। তিমিটির ডাকের কম্পাঙ্ক ৫২ হার্টজ তাই নাম এ রকম। অন্য তিমিদের ডাকের থেকে এটি অনেক বেশি যেমন ধরা যাক নীল তিমির ডাকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০-৩৯ হার্টজ। ফিন হোয়েল ডাকে ২০ মেগাহার্টজ।

এই তিমির কথা প্রথম জানা যায় ১৯৮৯ সালে। সমুদ্রের তলদেশে দিয়ে কোন শত্রুদেশের ডুবোজাহাজ সন্তর্পণে আসছে কিনা সেটা শনাক্ত করার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে মার্কিন নৌবাহিনী এক সারি গোপন শব্দগ্রাহক যন্ত্র পেতে রেখেছে। এগুলোকে বলে 'সোসাস'। তখন যন্ত্রগুলোতে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ রেকর্ড হলো। বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল এগুলো তিমির গান। নীল তিমির গান বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা আওয়াজ বেশ খটকা লাগল বিল ওয়াটকিস নামের এক গবেষকের কানে।

বিল সাগর তলের প্রাণীদের নাড়ি-নক্ষত্র জানেন। তিনি দেখলেন এই আওয়াজ কোন পরিচিত তিমির আওয়াজের সাথে মিলছে না। কেননা এই আওয়াজ ৫২ হার্টজের উঁচু তারে বাধা। এ বিশেষ প্রাণীকে খোঁজা বিলের নেশায় পরিণত হলো। সাগর থেকে সাগরে টো টো ঘুরেছেন। তিনি ২০০৪ সালে ৭৮ বছর বয়সে মারা যান। এর কয়েক মাস আগে বের হয় তার

একটি গবেষণা নিবন্ধ। ১২ বছর ধরে তিনি যেই গান রেকর্ড করেছেন তার বিশ্লেষণ। তার সিদ্ধান্ত ৫২ হার্টজের এই আওয়াজ যে অস্বাভাবিক তাই নয় এটি-অনন্য।

বিলের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে আরও বহু সমুদ্র বিজ্ঞানীর নেশায় পরিণত হয়েছে এই তিমি। একসময় সেটা একটা সাংস্কৃতিক আইকনে পরিণত হয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একাকী লোকজনের বন্ধনের যোগসূত্র হয়ে উঠেছে তিমি। অনেকে এ নিয়ে গান লিখেছেন। অনেকে হাতে ট্যাটু এঁকে লিখেছেন ৫২ ব্লু। এক সাগর থেকে আরেক সাগরে অধিবাসী জীবন যাপন করছে যে তিমি প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশিতে কখনো কি তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে? তার প্রথম ডাক শোনার পর ৩০ বছর কেটে গেছে। যদি সে তার ভাষা ত্যাগ করে তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কয়েক বছর তার ডক রেকর্ড হয়নি।

আজরা ও রবিনহুড ভূতগুলো

শেখ মোহাম্মদ জাকারিয়া হোসেন
কলেজ নং: ৮৫৯৯
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা: গ (দিবা)

বিকাল ৫টা বেজে ৩৫ মিনিট। আজরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে। ওর স্কুল বেলা ১২ টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। ওদের বাড়ি থেকে কিছু মাইল দূরে একটি মোবাইলের টাওয়ার। আজরা রোজ স্কুল থেকে এসে টাওয়াটার লাল বাতি দেখে। পড়াশোনায়ও খুব ভালো। তবুও মন খারাপ হলে ওই টাওয়ারটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজরার মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আজরা ওর মামা, ভাই ও বাবা-মার সাথে থাকে। একদিন ওর মামা বলল টাওয়ারটাতে নাকি ভূত থাকে। ভূত কোথায় থাকে ওর মামা বললেন। রডের ওপর বাসা করে থাকে ওরা। আজরা অনেকটা থমকে গেল। সে মনে করল মামা হয়তো মজা করছে। সে খুব সাহসী। সে মামাকে বলল , "চলো মামা ওই টাওয়ারটার কাছে যাই।" মামা বলল এখনই যাবে? ওদিকে মা একদমই ওকে যেতে দিবে না।

একদিন দুপুরে মা ঘুমিয়ে গেলেন। স্কুল বন্ধ। আজরা ও মামা গেলেন টাওয়ারের কাছে। তারা গিয়ে দেখলো ভূতের বাচ্চা গুলো পরমানন্দে খেলা করছে। প্রথমে দেখে একটু ভয় পেল সে। কিন্তু ভূতগুলো ছিল বন্ধুপ্রিয়। তারা আজরার কাছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। আজরাও বন্ধুবৎসল। তখন থেকে ও এবং মামা ভূতগুলোর বন্ধু হলো। তারা বাসায় ফিরে দেখল মা এখনও ঘুমাচ্ছেন। কোনো শব্দ না করে ঘরে ঢুকে মামা ও ভাগনে তাদের রুমে চলে গেল। শীতকাল চলে এসেছে। সেবার দেশে খুব জমিয়ে শীত পড়েছিল। শীতের এক রাতে বাবা ও মা এক অতিথির আমন্ত্রণে বেড়াতে যান। তারা সেখানে দুদিন থাকবেন। মামা ও আজরা বাসায় থাকবে। রাত তখন সাড়ে ৭টা। আজরা মামার কাছে বসে অংক শিখছিল। ঐ সময় দুটি বাচ্চা ভূত জানালায় খেলা করছিল। একটু পরে ভূতের দল এসে আজরা ও মামাকে ডাকলো। আজরা ও মামা তখনি গেল জানালার ধারে। ভূতেদের হাতে অনেক শীতের কাপড়। তারা সেগুলো কিনে এনেছে। এনে দিয়েছে ওর হাতে। মামা ও আজরা জিজ্ঞেস করল, "আমরা কী করতে পারি?" তখন ভূতগুলো বলল, "এগুলো তোমরা কিছু গরিব বা অসহায় পথশিশুদের বিরতণ করবে।" আজরা ও মামা তখনই চলে গেল সেগুলো বিতরণ করতে। সবাইকে তারা শীতের গরম কাপড় বিতরণ করল। সবাই অনেক খুশি হলো এবং তাদের ধন্যবাদ জানাল। সবাই বলল, মামা ও আজরা হিরো। কিন্তু আজরা ও মামা জানে কে আসল হিরো। এছাড়াও তারা আরও অনেক বীরত্বের কাজ ভূতগুলোর সাথে করল।

বাণী: যারা মানুষকে সাহায্য করে তাদের স্বয়ং আল্লাহ সাহায্য করেন।

একটি ভয়ঙ্কর রাত

মুশফিকুর রহমান লাবিব
কলেজ নং: ১৫২০১৯৪
শ্রেণি: সপ্তম শাখা: গ (দিবা)

আমরা ছিলাম ৪ জন সাংবাদিক। অনেক কাল ধরে একটি রহস্যময় ভবনের কথা শুনে আসছি। ভবনটি ছিল ডুপ্লেক্স করা। এই ভবনে কিছু রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে যার কারণে কেউ ভবনের কাছে যেতে চায় না। অনেক সাহস করে আমি এই রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব নিলাম। আমার দেখাদেখি আরও ৩জন এগিয়ে আসল, এরা হলো ঈশান, ফখরুল ও রাকিব। সবার মধ্যে রাকিবের স্বাস্থ্য একটু বেশি ছিল তাই আমরা তাকে বুঝিয়ে বললাম সেই ভবনে ভূত প্রেত থাকতে পারে। তাই দৌড়াতে তার কষ্ট হবে। কিন্তু রাকিব সাহসের সাথে বলল, তাতে কিছু আসে যায় না ভূত আমার সামনে আসলে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে আকাশে পাঠিয়ে দিব। তাই চিন্তার কিছু নেই। পরের দিন রাত। সবার মধ্যে ফখরুল একটু ভয় পাচ্ছে। সবাই আমার বাসায় আসল। সেই ভবনে যাবার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিলাম। একটি নাইট ভিশন ভিডিও রেকর্ডার প্রত্যেকের জন্য অর্থাৎ মোট ৪টি রেকর্ডার, অনেক ব্যাটারি এবং একটি গাড়ি।

তো রাত ১১.১৩ মিনিটে আমরা রওনা হলাম গাড়ি নিয়ে। গাড়ি চালালাম আমি এবং অবাক কাণ্ড ঠিক ১২.০০ বাজতেই আমরা

সেখানে পৌঁছালাম। গাড়িটা এক পাশে রেখে আমরা ৪ জন প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সামনে আসলাম। জায়গাটা খুব নির্জন। শুনেছি এই ভবনে কেউ থাকে না কিন্তু কেন জানি ভবনের ৩ থেকে ৫টি রুমের লাইট জ্বলছে। আমরা আসার পরই লাইটগুলো জ্বলে উঠল। এরপর আমরা একটু একটু করে হাঁটলাম। কিছুক্ষণ পরেই ভয়ের অধ্যায় শুরু হলো । হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল। এই দরজাটি ভবনের দরজা না। ভবনের আগে কিছু খালি জায়গা আছে। সেখানের দরজা। ভয়ে ভয়ে আমরা ভেতরের দিকে এগোলাম। ভীতু ঈশান তো প্রায় কেঁদেই দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার বলে আমরা আমাদের নাইট ভিশন ব্যবহার করলাম। এরপর ভবনের মূল দরজার দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি দরজা লক করা। এরপর অন্য দরজায় গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার হলো ভবনের কোন দরজাই খোলা ছিল না। এরপর রাকিবের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমরা সবাই জানালা দিয়ে প্রবেশের চিন্তা করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জানালা খোলা ছিল না। এরপর আমি ও ঈশান লক্ষ করলাম ভবনের পিছন দিকে কিছুটা উপরে একটা জানালা খোলা আছে। আমরা সবাই সেখানে যেতে চাইলাম। কিন্তু ফখরুল ভয়ে চলে যেতে চাইল। কিছুক্ষণ পর আমরা সবাই লক্ষ করলাম জানালার পাশেই একটা গাছ আছে। সে গাছ বেয়ে আমরা জানালায় পৌঁছে যাব। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার এই যে হঠাৎ করে সেখানে কে জানি লাইটটা অফ করে দেয়। আর গাছের ডালে কাকে যেন আমি দেখলাম। কিন্তু উপায় তো নেই আমাদের সেখান দিয়েই যেতে হবে। একটু এগোতেই গাছে যে ছিল সে উধাও হয়ে গেল। সবাই চমকে গেলাম। এরপর আমরা গাছ বেয়ে জানালার মধ্যে দিয়ে সবশেষে ভবনে উঠলাম।

এরপর আমরা সবাই আস্তে আস্তে কথা বললাম কী কী করতে হবে এই নিয়ে। ভবনে অনেক ফাইল আছে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। আর যেসব অলৌকিক জিনিস দেখছি তা রেকর্ড করতে হবে। আমরা দুই দলে বিভক্ত হলাম। সবাই এগোলাম। দেখলাম ভবনটি মোট তিন তলা। আমরা তখন দ্বিতীয় তলায় আছি। এরপর কারও পায়ের আওয়াজ পেলাম। ফিরে দেখি এক বড় দানব আমাদের পেছনে। অথচ কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম আমাদের রুমে কেউ নেই। সবাই মিলে দৌড় দিলাম জোরে। দানবটি আমাদের পিছে দৌড়াতে লাগল। তার পা ছিল শিকল দিয়ে বাধা। কিন্তু শিকলটা হঠাৎ ছিড়ে গেল। সে আরও জোরে দৌড়াতে লাগল এরপর আমরা এক রুমে ঢুকে দরজা লক করে দিলাম। এরপর এক জায়গায় লুকিয়ে থাকলাম। দানবটি দরজা ভেঙে ফেলল আর ভিতরে ঢুকল। আমাদের দেখতে পেল না। এরপর আমরা আরেকটা শব্দ শুনলাম। দানবটি শব্দের দিকে ছুটল। কিন্তু আমাদের সবার এক মারাত্মক সমস্যা হয়েছে। আমাদের নাইট ভিশনের চার্জ শেষ। তাই এখন আমরা কিছু ব্যাটারি লাগালাম রেকর্ডারে। কিন্তু সবাই একসাথে ব্যাটারি লাগানোতে অনেক শব্দ হয় আর এই শব্দ শুনে দানবটি আবার আসে। কিন্তু আবার আমাদের খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। এরপর আমরা অন্য রুমে যাই। সে রুমে কিছু ফাইল পাই। আমরা মোট ৪টি ফাইল পেলাম কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে আমাদের মোট ১২টি ফাইল যোগাড় করতে হবে। আর এই ভবনে ১২টির বেশি ফাইল নেই। এরপর আমরা আরেক রুমে গেলাম সেখান থেকে আরও ৬টি ফাইল পেলাম। অতএব আমাদের আর ২টি ফাইল লাগবে। আমরা সবাই মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু ২ তলায় আর কোন ফাইল নেই। তাই আমরা নিচতলায় গেলাম। আর সেখানেই পেলাম রহস্য। দেখলাম দানবটি যে শুধু এখানে একা তা না। তার সাথে আরও অনেক মানুষ আছে যারা পাগল। কিন্তু তাদের পোশাক নেই। এই পাগলের দলের কারও কোন আঙুল নেই। আর সবার একটা করে চোখ। কিন্তু এরা সবাই আগে সুস্থ মানুষ ছিল। দেখলাম তারা সবাই একে অপরের মাংস ছিড়ে খাচ্ছে। কিন্তু কেউ মারা যাচ্ছে না। কেউ কেউ শুধু কংকাল হয়ে পড়ে আছে। আমরা আর কেউ থাকব না এখানে। আর ভাগ্যের জোরে নিচ তলায় আমরা আমাদের বাকি ২টি ফাইল পেয়ে যাই। কিন্তু এবার আমাদের কাছে ফোন ব্যাটারি অবশিষ্ট নেই তবে পাশের আরেকটি রুমে একটি টর্চলাইট আছে। কিন্তু এসব স্থানে টর্চলাইট ব্যবহার করা বিপজ্জনক। কেননা এখানে টর্চলাইট ব্যবহার করলে দানবটি তা লক্ষ করবে এবং আমাদের দিকে দৌড়ে আসবে। তারপর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। টর্চলাইট এর ব্যাটারি খুলে লাইট ভিশনে ভরলাম।

এরপর যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম সেখানে গেলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি দরজাটা খুলে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন দরজা বন্ধ। তাই আমরা নিচে গেলাম গিয়ে সব দরজা খুলার চেষ্ট করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। চাবি ছাড়া খোলা সম্ভব না। তখন মনে হলো ৩ তলা খোঁজা বাকি আছে। সেখানে সন্ধান করলে নিশ্চিত চাবি পাওয়া যাবে। কিন্তু তখনই আমাদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর পাগলের দল। এরপর সবাই অনেক ভয় পেলাম। কিন্তু রাকিব ভয় পেল না। সে সবার সামনে দাঁড়াল। এবং তাদেরকে ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু রাকিব তাদের মধ্যে দিয়ে ঢুকে দূরে গিয়ে পড়ে গেল। পরে আমি বুঝলাম এটা আসলে একটা ছায়া। পরে আমরা সবাই দৌড় দিয়ে তৃতীয় তলায় চলে গেলাম। গিয়ে তন্ন তন্ন করে চাবি খুঁজলাম। এবার একটা বাথরুম বাদে বাকি সব জায়গা খোঁজা শেষ। সেখানে যেতেই দেখলাম পুরো জায়গায় শুধু রক্ত আর রক্ত। আর এই রক্তের মধ্যে নাইট ভিশনের আলোতে চকচক করছে এক সোনালি চাবি। সেই চাবি নিয়ে দৌড়ে নিচে গেলাম। এ সময় আমাদের পিছে দৌড় দিল বিশাল ভয়ংকর দল আর ডানপাশে ছিল এক অচেনা অদৃশ্য ভূত যা নাইট ভিশনে দৃশ্যমান। আর বামে ছিল একটি খোলা জানালা । নিরুপায় হয়ে সেই জানালা দিয়ে সবাই লাফ দিলাম। আর নিচে রক্তে ভরা কংকাল ও মানবদেহের উপর পড়লাম। আমাদের পুরো দেহ রক্তে ভরে গেল। এরপর সেই প্রথম দরজায় গেলাম। চাবি দিয়ে দরজা খুলে আমাদের সেই গাড়ি নিয়ে অনেক দ্রুত ভবন থেকে বের হয়ে চলে গেলাম। সত্যিই রাতটি খুবই ভয়ংকর ছিল।

কোরআন সুন্নাহর আলোকে পারিবারিক বন্ধন

বি এন তাইনীন সাজনান
কলেজ নং: ১৫৪০৩৫০
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ক (দিবা)

একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবারই পারে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ দেশ ও জাতিকে উপহার দিতে। আমরা সাধারণত পরিবার বলতে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বজন-পরিজন গঠিত একটি কাঠামোকে বুঝায়। এখন আমাদের বুঝতে হবে পারিবারিক এই কাঠামোর সূচনা কখন থেকে হয়?

হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) এর মাধ্যমেই দুনিয়ায় পারিবারিক প্রথার সূচনা হয়। তারা দুজন মহান রাব্বুল আলামিনের হুকুমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিবারের সূচনা করে। তাই তো ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন নারী-পুরুষের মাঝে পরিবার সৃষ্টিতে অবদান রাখে। তেমনি দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও অনেক বড় ভূমিকা রাখে। পরিবারগুলোতে যারা পরিবারের দায়িত্বশীল আছেন তারা যদি আপন পরিবারের ব্যাপারে একটু যত্নবান হন আদর্শ পরিবার গঠনে জোড়ালো ভূমিকা রাখেন সবসময় পরিবার দীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করেন। তাহলে সুন্দর সুশৃঙ্খল একটি পরিবার তৈরি হবে।

আদর্শ পরিবার গঠনে রাসুল (সাঃ) হলেন উম্মতের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক অভিভাবক। তিনি সবসময় উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্য। পারিবারিক বন্ধন সুন্দর সুশৃঙ্খল রাখার জন্য পরিবারের দায়িত্বশীলদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। এর জন্য প্রথমে পরিবারের দায়িত্বশীলকে দীনদার, আমানতদার, আদর্শবান ও পরিবারের সবার কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। কারণ পরিবারের অন্য সদস্যরা তাকেই সবচেয়ে বেশি অনুকরণ অনুসরণ করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি পরিবার একজন শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক হলেন বাবা-মা। সন্তানরা বাবা-মায়ের কাছে থেকে পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সুন্দর জীবন যাপনের প্রশিক্ষণও নিয়ে আসে। শিশু-কিশোররা পরিবার থেকেই দীন (ইসলাম), মায়া, মহব্বত, পরোপকারিতা, শ্রদ্ধাবোধ ও সাহসিকতার মতো মহৎ গুণগুলো আত্মস্থ করে। যা তার পরবর্তী জীবনের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকে। এ কারণে সন্তানদের প্রকৃত দীনদার এবং তাদের আদর্শবান সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে এবং তাদের থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে হলে নিজেদের প্রথমে প্রকৃত দীনদার হতে হবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে অন্যকে সম্মান করা শেখাতে হবে।

যে পরিবারে সন্তানরা তাদের বাবা মাকে শ্রদ্ধা করে না, সম্মানের আসনে সমাসীন করে না, সেই পরিবারে কখনো প্রকৃত সুখ-শান্তি আসে না। পক্ষান্তরে ওই পরিবারে বাবা-মা যদি অন্যদেরকে সম্মান করেন তাহলে পরিবারের শিশুরা তা দেখে শেখে এবং ভবিষ্যতে তারা বাবা মায়ের প্রতি যত্নবান ও অন্যদের সম্মান করে। আর এভাবেই একটি পরিবারে সুখ ও শান্তির সুবাতাস প্রবাহমান থাকে।

পরিবারে সুখ-শান্তি বিরাজ করলে সন্তানরা কখনো পরিবার বিমুখ হয় না এবং তাদের বিপথে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। তাই তো শরিয়তে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে দীনদারিতা বিষয়ের প্রতি অতীব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা সবাই মনে প্রাণে একটি সুখী পরিবার চাই। সুখী পরিবার পেতে হলে আমাদের ইসলামি রীতিনীতিগুলো পুরোপুরি জানতে হবে। জানতে হবে রাসুল (সাঃ) এর পরিবারনীতি। সে অনুযায়ী পরিবারে চলতে হবে। আমাদের মাঝে পারস্পরিক ছাড় দেওয়া ও সমঝোতার মনোভাব থাকতে হবে।
বিজ্ঞ মনীষীরা একমত যে সুস্থ ও সুন্দর পরিবার পাওয়ার জন্য দীনদারিতা, আমানতদারিতা, ধৈর্য, পরোপকারিতা, মানসিকতা ও প্রেমভালোবাসার মতো সুন্দর সুন্দর গুণের সম্বনয় থাকা খুবই জরুরি।

রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার তাওফিক দান করেন।

Remian and old Remian

ফায়েজ আফনান নাহিন
কলেজ নং: ১৬১৯৯
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (প্রভাতি)

Remian: আজ আমার সেই ক্যাম্পাসে প্রতিদিনের মতোই রয়েছি। কিন্তু প্রকৃতি ভিন্নরূপ বেশ ধারণ করেছে। আহা! প্রকৃতি দেখে মন জুড়িয়ে যায়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে পাখি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে সদ্য আগমনরত শীতের কুয়াশায় দূরের গাছগুলো দেখা যাচ্ছে না। সূর্যহীন সেই মেঘলা আকাশ। আমি ডিআরএমসির সেই ক্যাম্পাসে ঘাসের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে যেখানে চোখ যায় সেখানে চলে যাই। কিন্তু এখানকার ৫২ একরের বাইরে এই রকম প্রকৃতি তো দূরে থাক গাছ মেলাই ভার। এই সুন্দর নিসর্গ আমার মনকে সুন্দর করে দিচ্ছে।

old Remian: অবশেষে এত কষ্টের পর প্লেনটাকে টেকঅফ করলাম। উপর থেকে এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে ভালই লাগে। এ যে আমার চিরচেনা ক্যাম্পাস। এই ঢাকার মধ্যে একটি গাছের রাজ্য। এখানে আবার সাদা সাদা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। অনেক সুন্দর এই বাংলাদেশের প্রকৃতি। আমিও একসময় ডিআরএমসিতে পড়তাম। সেই দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে।

১ দিন পর, old Remian: আজ আমার মন খুব খারাপ। সূর্য আকাশে বড় ভাবে রয়েছে। আশেপাশে পরিবেশ ভ্যাপসা গরমে ভরপুর। আমি অবিকল এক যন্ত্রের মতো হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখটা ঝাপসা হয়ে এল। চোখটা বন্ধ করার আগে দেখলাম সবাই আমার দিকে ছুটে আসছে।

old Remian: আমি নেপালের কাঠমুন্ডুতে। এখানে গাছ থাকলেও বাংলাদেশের চেয়ে এখানে কিছুটা ফাঁকা লাগছে। কিছুতেই ভাল লাগছে না।

পো পো পো...কী হলো?

: ২০০০ মিটার ইন ডেনজার।

: হোয়াট? ফুয়েল শেষ। এ কী করে সম্ভব?

: ১৫০০ মিটার। নো ফুয়েল।

: কন্ট্রোল রুমে খবর দিতে হবে। হ্যালো, আমার প্লেনের ফুয়েল শেষ। ইমার্জেন্সি।

: হ্যালো ইউএস বাংলা ওয়ান থার্টি ফাইভ। আমাদের কিছু করার নেই।

: করার নেই মানে। এতগুলো যাত্রীর জীবন-মরণের ব্যাপার।

বিজ্ঞানী জন ডাল্টন

আব্দুন নূর খান ওয়াসি
কলেজ নং: ১৫২০০২২
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ঘ (দিবা)

প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষি কণাদ 'কণাবাদ' তথা পরমাণুবাদ প্রথম প্রচার করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, প্রত্যেকটি পদার্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। গ্রিক বিজ্ঞানী ডেমক্রিটাসও ওই একই মত পোষণ করেছিলেন। তবুও তাঁদের মত ঠিক বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না। কারণ এঁরা মূলত ছিলেন দার্শনিক। যদিও দর্শন থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, তথাপি কণাদ, ডেমক্রিটাস উভয়েই জড় বস্তুর উপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ করেননি। বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল একেবারে গৌণ। তাঁদের প্রত্যেকের লেখা পুস্তকে যুক্তি অপেক্ষা কল্পনাই লাভ করেছিল প্রাধান্য। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে জন ডালটনকেই প্রকৃত পরমাণুবাদের প্রবর্তকরূপে আখ্যা দেওয়া যায়।

১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে ইগলসফিল্ড নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডাল্টন। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম পড়াশোনা শুরু হয়। অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। কথিত আছে, বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তিনি গ্রিক ও ল্যাটিন নামক দুটি দুরূহ ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বিজ্ঞান এবং অংকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করার পর ডাল্টন বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হন কলেজে। সেখানেও রেখেছিলেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অবশেষে বিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি লাভের পর ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন অধ্যাপক পদে। সেই থেকেই তাঁর আরম্ভ হয় গবেষণা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।

জন ডাল্টনের মৌলিক গবেষণাগুলো প্রথম ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছিলেন গ্যাস প্রসারণ সূত্র এবং গ্যাসের আংশিক চাপ সূত্র। এই সূত্র দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহু বিজ্ঞানী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ডাল্টনের সূত্রগুলোকে যাচাই করতে। শেষে তাঁরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন সূত্রগুলোকে এবং ডালটনও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে।

গ্যাস আয়তনের সূত্র আবিষ্কারের পর ডাল্টনের মনে পদার্থের গঠন সম্পর্কে চিন্তা আসে। সেই চিন্তা থেকেই অচিরে জনুলাভ

করেছিল 'পরমাণুবাদ' নামক ডাল্টনের বিখ্যাত মতবাদটি। তাঁর এই মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য কণা নিয়ে গঠিত। সে অন্তিম কণাগুলোর নাম পরমাণু বা অ্যাটম (atom)। এই কণাকে ভাঙাও যায় না কিংবা গড়াও যায় না। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে এক কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের ওজনে এবং ধর্মে স্বাতন্ত্র্য আছে। মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা আবার সরল ও সুনির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হতে পারে।

ডাল্টন অবশ্য মৌলিক বা যৌগিক যেকোনো পদার্থের সূক্ষ্মতম অন্তিম কণাকে পরমাণু নামে অভিহিত করেছিলেন। এইখানে ছিল তাঁর কল্পনার বড় রকমের ত্রুটি। সেই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছিল অনেক পরে। তাছাড়া পূর্ববর্তী কল্পনা আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞান স্বীকার করছে না।

ডাল্টনের উপর্যুক্ত সূত্র ও মতবাদগুলো ছাড়া আরও অনেক আবিষ্কার আছে। তিনি পরমাণুর সাংকেতিক চিহ্ন এবং পরমাণুর ওজন সম্পর্কে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গ্যাসের তরলীকরণের উপায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, উচ্চচাপে এবং নিম্ন তাপমাত্রার সমস্ত গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ডাল্টন জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন, তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসেবে। জীবনে বহু সম্মান এবং পুরস্কার লাভ করেছিলেন তিনি। লন্ডনের বিখ্যাত রয়্যাল সোসাইটি ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ সুবর্ণপদক প্রদান করেন।

আজীবন অধ্যাপনা এবং গবেষণার পর ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান বিজ্ঞানী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাবাস বাংলাদেশ

এহসানুল হক রাতুল
কলেজ নং: ১১৩৮৫
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (দিবা)

বাংলাদেশ। সোনালি আবেশ দিয়ে ঘেরা এই দেশ। নানা রকম পাখি ও তাদের গান এই দেশকে মনোমুগ্ধকর করেছে। বাংলাদেশে ফলে সোনালি ধান। বাতাসে আন্দোলিত সেই ধান কত সুন্দর দেখায় প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মাঝেই আমি বড় হয়ে উঠেছি। এই দেশের রয়েছে ছয়টি ঋতু। এক এক ঋতুর এক এক রূপ। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে হয় নানা রকম অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন ধরনের আয়োজন। সেই রূপেই আমার বসবাস। আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সব দেশের কাছেই পরিচিত। ১৯৭১ সালে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়। লাল সবুজের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে এক জাতীয় দল। বাঘের প্রতীক দিয়ে করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। তারা বাঘের মতো শক্তিশালী বলে আজ তারা ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশকে পরাজিত করে কাপ ছিনিয়ে নিয়ে আসছে।

আজ এই বাংলাদেশ এতই শক্তিশালী বলে মিয়ানমারের মতো দেশ বাংলাদেশকে নিয়ে খুব ভয়ের মধ্যে আছে। আজ আল্লাহ তায়ালার কাছে অসীম শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দান করেছেন। গর্ব করে বলতে পারি যে, আমি বাংলাদেশের সন্তান। স্বাধীন দেশের ছেলে। এই দেশকে নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসি। মা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসেন, ঠিক তেমনি আমি আমার দেশ বাংলাদেশকে ভালোবাসি। কবির ভাষায়–

ধন ধান্য পুষ্প ভরা,
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।

ভবিষ্যতে আমি আমার বাংলাদেশকে উন্নত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকব। নিজের দেশকে সোনার অলংকার দিয়ে গড়ে তুলতে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করব না।

অদম্য সংগ্রাম

মাজহারুল ইসলাম আবিদ
কলেজ নং: ১১৩৬৪
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (দিবা)

আমার নাম সবুজ। আমি গ্রামেই থাকি। বয়স হয়তো ১৫ বা ১৬ হবে। আমার বাবা আমার জন্মের আগেই মারা যান। আমার দশ বছরের সময় মা মারা যান। সারাদিন হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়াই। কখনো সমবয়সীদের সাথে খেলি। শহিদ আলীর বাড়িতে কাজ করি গরু চরানো, ধান কাটা প্রভৃতি। কাজের বদলে তারা দুবেলা খেতে দেয়। তাদের কাঠ রাখার ঘরটায় রাতে থাকি। গ্রামের সবাই খুশি মনে থাকে। হঠাৎ কী যেন হলো! গ্রামবাসীরা একে একে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। বাড়ির পাশের জীবন দাদুর কাছ থেকে শুনেছি আমাদের দেশে নাকি পাকিস্তানিরা হানা দিয়েছে।

যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই মেরে ফেলে। জীবন দাদু একজন কৃষক। তার বাড়িতে তেমন কিছু নেই। একদিন জীবন দাদু আমায় বলল তার সাথে ক্ষেতে যেয়ে ধান কাটতে। আরো কয়েকজন কৃষক আমাদের সাথে যোগ দিল। মাঠে সোনালি ফসল। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবাই ধান কাটতে লাগল। দূরে কিছু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বিকট শব্দে ক্ষেতের ওপাশ থেকে গুলি আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। আমি হঠাৎ বসে পড়ায় আমার গায়ে কোনো গুলি লাগেনি। শব্দ থেমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি উঠলাম। দেখলাম জীবন দাদুসহ সবাই শহিদ হয়ে রয়েছে। সবার শরীর রক্তে ভিজে আছে। আমি যেন আমার ভার সামলাতে পারছিলাম না এদৃশ্য দেখে।

আমার এবার বোধ হলো যে ওদের (পাকিস্তানিদের) উপর পাল্টা আঘাত না করলে ওরা দমবে না। আমি ওদের দাফন শেষে এগোলাম কবিরের বাড়ির দিকে। কারণ আমি জানি ওর সাথে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে। মুক্তিবাহিনীরা এদেশকে মুক্ত করতে চায়। কবিরের সহযোগিতায় ক্যাম্পেও পৌঁছে গেলাম। ক্যাম্পে ট্রেনিং নিলাম কীভাবে রাইফেল, মেশিনগান চালাতে হয়। গেরিলা আক্রমণ সম্পর্কেও শিখলাম।

এবার একটা মিশনে যেতে পারলেই হলো। কমান্ডার শরিফ আমাকে বললেন প্রস্তুত হতে। মিশনে বের হতে হবে। আমিও খুব উৎসুক ছিলাম ওরকম একটি মুহূর্তের জন্য। আমরা ৮ জন যাব। পর্যাপ্ত খাবার নিয়ে ২ দিনের হাঁটার পর পৌঁছালাম গন্তব্যে। একটি দোতলা স্কুল। আমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। সবাই ইশারা পেয়ে আক্রমণ শুরু হলো। পাকিস্তানি সেনাদের গায়ে গুলি লাগতেই তারা কুকুরের মতো চেঁচাচ্ছে। বাকি সেনারা অস্ত্র নিয়ে লেগে গেছে। তারাও পাল্টা আক্রমণ করছে। তবে আমাদের আক্রমণের কাছে তারা অসহায়। ওরা হয়তো ভাবতেও পারেনি এ রকম কিছু ঘটবে। আমাদের দলের খালেদের গায়ে হঠাৎ গুলি লাগল। তাকে সাহায্য করতে আরাফাত গেল। আমরা এখন ছয়জন। সব পাকিস্তানিরা মারা গেছে। শুধু কমান্ডার বাকি। কমান্ডারকে একটা দেয়ালের সাথে বাঁধা হলো। তারপর বন্ধুকের সবগুলো গুলি তার বুকে ঢুকিয়ে বুক ঝাঁঝরা করে দিলাম আমরা। এবার সবাই জয় বাংলা, জয় বাংলা বলতে বলতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

মেডুসার কাহিনি

সালমান রহমান
কলেজ নং: ১১৩৬১
শ্রেণি: নবম, শাখা: খ (দিবা)

গ্রিক পুরাণে (পুরাণ মানে কাল্পনিক কাহিনি) রয়েছে অনেক রহস্যময় ও মজাদার গল্প এবং কল্পকাহিনি। এইসব গল্প মূলত দেব-দেবীর কাহিনি দ্বারা বেষ্টিত। এই রকম অনেক ঘটনা রয়েছে সেখানে দেব-দেবীরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ বর্ণনা করেছে। দেবতারা খুব অল্পেই ক্রুদ্ধ হয়ে যান। সামান্য এক কথা কিংবা ঘটনার কারণে তারা মানুষকে অভিশপ্ত করে ফেলেছিল। এই একই ঘটনা ঘটেছিল মেডুসার গল্পে। গ্রিক পুরাণের এই নায়িকা সবচেয়ে রহস্যময়ী এবং কৌতূহলী। তাকে নিয়ে নানা ঘটনা রয়েছে। মেডুসা অভিশপ্ত এক নারী ছিল। যার সারা শরীর সাপের দেহ দ্বারা বেষ্টিত এবং চুল ছিল জীবন্ত একগুচ্ছ সাপ।

তার শীতল চোখে যার দিকে দৃষ্টি রাখত সে পাথরে পরিণত হয়ে যেত। অন্যসব দানব-দানবীর মতো মেডুসার জন্ম হয়েছে দানব দম্পতি টাইফন ও একিডোনার মাধ্যমে। মেডুসার তিন মতান্তরে দুইজন বড় বোন ছিল। সে ছিল সবার ছোট। তাদের তিনজনকে গর্গন বলা হতো। মেডুসার বড় দুই বোন ছিল অমর। কিন্তু মেডুসা ছিল মরণশীল। অন্য সূত্রে বলা হয় যে মেডুসার জন্ম দিয়েছিলেন সাগরের দেবতা ফার্সিস আর দেবী সিটো। আবার মতান্তরে বলা হয় যে মেডুসা প্রথমে দানবী ছিল না। মেডুসা আসলে ছিল দেবী এথেনার সেবিকা। মেডুসা বাস করত পৃথিবীর একবারে উত্তরে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতো না। একদিন মেডুসা দেবী এথেনার কাছে আবদার করল যে সে সূর্যোদয় দেখতে চায়। কিন্তু দেবী এথেনা তা সরাসরি মানা করে দেয়। মেডুসা বিরক্ত হয়ে বলে যে সে এত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন তার সেবা করে গেল কিন্তু বিনিময়ে সে কিছুই পেল না।

এতে দেবী এথেনা ক্রুদ্ধ হয়ে মেডুসাকে অভিশাপ দেয় এবং

সুন্দরী থেকে সোজা তাকে কুৎসিত দানবী বানিয়ে ফেলে। মেডুসা তখন মন খারাপ করে গহীন জঙ্গলে যায় তার মন শান্ত করতে। তখন তার মাথায় থাকা বিষাক্ত সাপ খসে পড়ে যায়। মনে করা হয় যে মেডুসা আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েছিল। যার কারণে আজ আফ্রিকা বিষাক্ত সাপের আবাসস্থল। কিন্তু মেডুসা যেহেতু ছিলেন তাকে বধ করার জন্য হিরোর আবির্ভাব তো ঘটবেই। সেই হিরো ছিল পার্সিয়ার্স। সে ছিল ডেমিগড। অর্থাৎ অর্ধেক দেবতা ও অর্ধেক মানুষ।

সে ছিল দেবরাজ জিউসের পুত্র। তো একবার অর্গেস রাজ্যের রাজা সিদ্ধান্ত নেয় যে সে এবং তার প্রজারা দেবতাকে বিশ্বাস করবে না। এই জন্য দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে ডারটারাস থেকে ক্রেগব্রেনকে পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়। এই বিশাল জলজ হিংস্র প্রাণিকে কীভাবে তারা বধ করবে তা নিয়ে আর্গস রাজা চিন্তিত হন। তখন এক পাদ্রী রাজাকে পরামর্শ দেয় মেডুসার মাথা আনার জন্য। তখন রাজা পার্সিয়ার্সের উপর এই দায়িত্ব প্রদান করেন। এই কাজে পার্সিয়ার্সকে সাহায্য করে এথেনা ও হার্মিস। তারা যথাক্রমে জ্ঞানের দেবী ও দেবতাদের বার্তাবাহক ছিলেন। তারা পার্সিয়ার্সকে একটি স্বচ্ছ বর্ম, তরবারি, উড়ন্ত জুতো ও জাদুর থলি দেয়। মেডুসা যে দ্বীপে থাকে সেই দ্বীপে পৌছে এথেনা তাকে চিনিয়ে দেয় কোনটি মেডুসা কারণ সেই দ্বীপে তার দুই বোনও ছিল।

পার্সিয়ার্স তার স্বচ্ছ বর্মের প্রতিফলনের সাহায্য নিয়ে মেডুসার চোখে চোখ না রেখে তার গলা কেটে ফেলে এরপর সেই মুণ্ড জাদুর থলিতে ভরে ফেলে। তারপর সে তার উড়ন্ত জুতোর সাহায্যে তাড়াতাড়ি আর্গস রাজ্যে প্রবেশ করে ক্রেগব্রেনকে পাথর বানিয়ে সবাইকে রক্ষা করে।

উইলিয়াম শেক্সপিয়র

মোস্তফা তাহজীব
কলেজ নং: ৭৪২০
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (দিবা)

উইলিয়াম শেক্সপিয়র একধারে অভিনেতা, নাট্যকার ও কবি। তিনি ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল ইংল্যান্ডের স্টার্টফোর্ড আপন আভন নামক মফস্বল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম তারিখটা অনুমান নির্ভর। স্টার্টফোর্ড হলি ব্রিনিটি চার্চে ২৬ শে এপ্রিল (১৫৬৪) তাঁর ব্যপ্টিজম হয় সেই প্রমাণ নথিতে আছে। ইংল্যান্ডে কোনো শিশু জন্মানোর তিন দিন পর তার ব্যপ্টিজম বা আকিকা হতো। সেই হিসেবে শেক্সপিয়রের জন্ম তারিখ ২৩ শে এপ্রিল ধরা হয়। তাঁর বাবার নাম জন শেক্সপিয়র এবং মায়ের নাম মেরি আর্ডেন। তিনি ছিলেন আট সন্তানের মধ্যে তৃতীয়। শেক্সপিয়রের সময় ইংল্যান্ডের ভাষা ছিল ল্যাটিন। সেজন্য শেক্সপিয়রের জন্ম নিবন্ধনকৃত নাম ছিল গুলিমাস ফিলিয়াস জোহান্স শেক্সপিয়র। অর্থাৎ উইলিয়াম হলো জন শেক্সপিয়রের ছেলে। শেক্সপিয়রের পিতামহ রিচার্ড শেক্সপিয়র স্টার্টফোর্ডের গ্রামের পাশে স্নিটারফিল্ডে বাস করতেন। তিনি রবার্ট আর্ডেন নামক জনৈক ধনী লোকের বাসায় ভাড়া থাকতেন। আর্ডেনের মেয়ে মেরি আর্ডেনকে বিয়ে করেন উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বাবা জন শেক্সপিয়র। তাই শেক্সপিয়র বাবার দিক থেকে সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান হলেও মায়ের দিক থেকে ধনী পরিবারের ছিলেন। উইলিয়াম শেক্সপিয়র স্টার্টফোর্ডের কিংস নিউ স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। স্কুলটি তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল দুরে ছিল।

১৫৮২ সালে উইলিয়াম শেক্সপিয়র ২৬ বছর বয়সী অ্যানি হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ে করার ছয় মাস পর শেক্সপিয়র অ্যানি হ্যাথাওয়ে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন, যার নাম সুজানা। দুই বছর পর শেক্সপিয়র দুটি যমজ সন্তান অর্থাৎ হ্যামনেট নামক পুত্র এবং জুডিথ নামক কন্যার জন্ম হয়। হ্যামনেটের মৃত্যু হয় ১১ বছর বয়সে। হ্যামনেটকে সমাধিস্থ করা হয় ১৫৯৬ সালের ১১ই আগস্টে। ১৫৮৫ সাল থেকে ১৫৯২ সাল পর্যন্ত শেক্সপিয়রের জীবন যাপন সম্পর্কে জানা যায়নি। ই.এ.জে হনিগম্যানের মত শেক্সপিয়র এই সময়টিতে কোনো ধনী লোকের গৃহে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। শেক্সপিয়র সম্ভবত প্রথমে ফিলিপ হেনসোলের অধীনে নাট্যজগতে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তিনি ছিলেন ১৫৮৭ সালে স্থাপিত দ্য রোজ থিয়েটারের মালিক । সম্ভবত প্রাথমিক অবস্থায় দ্য রোজ থিয়েটার হলে শেক্সপিয়র যুক্ত ছিলেন । এর অল্প সময় (১৫৯৪) পরে শেক্সপিয়র জেইমস বারবেজের অধীনে দ্য থিয়েটার হলে অভিনয়কারী দল লর্ড চেম্বারলেইনস মেন দলে যোগ দেন। ১৫৯৯ সালে শেক্সপিয়রের নাট্যগোষ্ঠী টেইমস নদীর পাড়ে সাউথ ব্যাংক নামক জায়গাটিতে দ্য গ্লোব নামক একটি নতুন থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠা করে নাট্যমঞ্চ হিসেবে দ্য গ্লোব অনন্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা ঋদ্ধ ছিল। কিন্তু এর কোনো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। ১৬০৩ সালে রানি এলিজাবেথ মারা গেলে পরবর্তী রাজা জেইমস দ্য ফার্স্ট শেক্সপিয়রের দলটিকে রাজার একান্ত দল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং দলটির নাম দ্য কিংস মেন।

নাটকগুলো মঞ্চায়নে নিজের অভিনয়কে গুরুত্ব দিতেন তিনি। অভিনয় আর সাহিত্যকর্মই ছিল তাঁর পেশা-নেশা শেক্সপিয়রকে ইংরেজি ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিশ্বের একজন অগ্রণী নাট্যকার মনে করা হয়। তৎকালীন যুক্তরাজ্য সরকার তাঁকে ইংল্যান্ডের জাতীয় ও চারণকবি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ৩৮টি নাটক, ১৫৪টি সনেট এবং বেশ কিছু বিশেষ কবিতা। তাঁর অধিকাংশ নাটক স্থানীয়ভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৫৮৯ থেকে ১৬১৩ সালের মধ্যে। ওথেলো ম্যাকবেথ, রোমিও এন্ড জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার, কিংলেয়ার

প্রভৃতি নাটক তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৬১১ সালে তিনি তাঁর শেষ নাটক 'দ্য টেম্পেস্ট' রচনা করেন।
উইলিয়াম শেক্সপিয়র ১৬১১ সালে লন্ডন হতে স্ট্রাটফোর্ডে ফিরে আসেন। তিনি ১৬১৬ সালের ২৩ শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি

১) মন যদি প্রস্তুত থাকে তাহলে সব কিছুই প্রস্তুত আছে।
২) সবাইকে ভালোবাসুন। খুব কম লোকের উপর ভরসা রাখুন।
৩) সত্যিকার ভালোবাসার পথ কখনোই মসৃণ হয় না।
৪) সৎ হওয়া মানেই দুনিয়ার হাজারো মানুষের ভীড়ে বাছাইকৃত একজন হওয়া।

মহাবিশ্বের জন্ম ও শেষ পরিণতি

সামিউল হাসান (রাতুল)
কলেজ নং: ১৪৫৯৮
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (প্রভাতি)

স্টিফেন হকিং

স্টিফেন হকিং একজন ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ, যিনি আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। 'দ্য থিওরি অব এভরিথিং' বইটিতে স্টিফেন হকিংয়ের সাতটি বক্তৃতা তুলে ধরা হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে, ইংরেজি ভাষায়। বর্তমানে বইটিকে বিশ্বের অনেকগুলো ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য বইটি লেখা হয়েছে। লেখক বইটিতে জটিল গাণিতিক সমীকরণ যোগ করেননি। তিনি ভাষাকে সহজ ও বোধগম্য রেখেছেন। তিনি বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের মিল ঘটিয়েছেন। 'থিওরি অব এভরিথিং' হলো একটি চূড়ান্ত তত্ত্ব ও আনুমানিক ধারণা যার মাধ্যমে মহাবিশ্বের সমস্ত দিক পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে ও সংযুক্ত করা যাবে। বিংশ শতাব্দীর দুটি বড় আবিষ্কার 'আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব' এবং 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স'। তবে দুটি তত্ত্ব তাদের বর্তমান রূপে একইসঙ্গে ঠিক হতে পারে না। আর থিওরি অব এভরিথিং হলো সেই প্রত্যাশিত তত্ত্ব, যার উত্তর পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বইটিতে খুঁজেছেন।

বইটি কম পৃষ্ঠার হলেও এর মধ্যে সাতটি ধারাবাহিক বক্তৃতার মাধ্যমে মহাবিস্ফোরণ, মহাবিশ্ব, কৃষ্ণগহ্বরসহ আরও নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম বক্তৃতায় মহাবিশ্ব সম্পর্কে অতীত ধারণা পাব আমরা। দ্বিতীয় বক্তৃতায় মহাবিশ্বের প্রসারণশীলতাসহ এর বর্তমান তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতায় কৃষ্ণগহ্বর এবং পঞ্চম বক্তৃতায় মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও শেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ বক্তৃতায় সময় এবং পরিশেষে সপ্তম বক্তৃতায় একীভূত তত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এটি কীভাবে খুঁজে পেতে পারি তা বলা হয়েছে। আর যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে সত্যিকার অর্থে আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারব।

আমি এই বইটি পড়তে পছন্দ করেছি কারণ এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা কম। আর বইটি পড়তে হলে অবশ্যই একজনের যথাযথ কৌতূহল থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত এটি মহাবিশ্বের যেকোন নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিবে না, বরং মহাবিশ্বের উৎস এবং এ সম্পর্কে যুক্তি, বর্তমান অবস্থা, কৃষ্ণগহ্বর, সময় ও দিক এবং সমস্ত কিছুর তত্ত্বের সন্ধানে বইটির উৎসাহিত করবে। আর এটি আপনার পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেবে।

প্রিয় প্যালিনড্রম

এম এম ফাহাদ জয়
কলেজ নং: ১৬৩৪৫
শ্রেণি: দশম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

গুরু গাউসের মতে, গণিতকে বলা হয় সকল বিজ্ঞানীদের রানি। কাজেই গণিত আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চলুন, আজ প্যালিনড্রম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্যালিনড্রম! এটি আবার কী? নামটি খটমটে লাগলেও বিষয়টি মজার। যে সংখ্যাকে উল্টালেও একই সংখ্যা পাওয়া যায়, তাদেরকেই প্যালিনড্রম বলে।

যেমন: ১২৫২১, ৩৪৪৩ এদেরকে উল্টালেও আমরা একই সংখ্যা পাই।

এবার আসুন, এ প্যালিনড্রমকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো যাক। ১৫ই সেপ্টেম্বরের কথা মনে করুন। ৯.১৫.১৯ অর্থাৎ ৯ মাস ১৫ তারিখ, ১৯ সাল। প্যালিনড্রমের আভাস পাচ্ছেন কি? আরেকটু চিন্তা করলে দেখুন, এ মাসের ১১ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি তারিখই এক একটি প্যালিনড্রম সংখ্যা। তো, এ সপ্তাহটিকে আমার প্যালিনড্রম সপ্তাহ হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছি।
আমার বয়স ১৬ বছর। আমার জীবনে এমন একটি বছর ছিল যে বছরে কোনো প্যালিনড্রম সপ্তাহ ছিল না। বলুনতো সেটি কত সাল?

ভয়াল রাত

আবরার জাওয়াদ
কলেজ নং: ১৩১১৩
শ্রেণি: দশম, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটি টর্চলাইট থাকলেও তার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে বনের শেষ প্রান্তের পুরান আমলের বাড়িটায় একা একটি রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রবিন। বাড়িটার বিভিন্ন বদনাম আছে। সেগুলোর কথা মাথা থেকে ঝেড়ে দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। বাড়িটার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল।

সাবধানে বাড়িটায় প্রবেশ করল রবিন। চোখের কোনে কিসের যেন নড়াচড়া লক্ষ করল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে সে এক ঝাঁক বাদুরের পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেল। বাইরের চাঁদের আলো জানালাগুলো দিয়ে ভেতরে আসলেও তা যে ঐ অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগোতে থাকল রবিন। হঠাৎ কিছু ছোট ছোট আলোর বিন্দু লক্ষ করল সে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারল যে সেগুলো আসলে বিভিন্ন বন্য প্রাণীর মাথার অংশ। কিন্তু এগুলো তো এতটা জীবন্ত মনে হওয়ার কথা না। হয়তো উন্নত কোনো প্রযুক্তির সহায়তায় এগুলো তৈরি করা হয়েছে এ কথা ভেবে সে পুনরায় চলতে শুরু করল। করিডোরটা ধরে এগোতে এগোতে সে এই বাড়িতে প্রচুর রুম ও ছবির উপস্থিতি টের পেল। বোধহয় পূর্বে অনেক মানুষ থাকতো এখানে। রবিনের মনে হলো কে যেন তাকে আড়াল থেকে দেখছে। সে ইতোমধ্যেই ঘামতে শুরু করেছে। শরীরের হৃদস্পন্দনের হার যেন প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত সে বড় হলরুমটার জানালার পাশে বাকি রাতটা কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। বাড়ি থেকে আনা কিছু খাবার খেয়ে একটা মাদুর পেতে সে শুয়ে পড়ল। সময় যতোই যাচ্ছে তার কাছে যেন বাড়িটা আরো জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। এভাবে সে বিভিন্ন কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে সে কীসের যেন শব্দ শুনে হঠাৎ করে জেগে উঠল। শব্দটা শুনে মনে হলো কেউ যেন কিছু একটা টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। রবিন উঠে শব্দের উৎসটার দিকে এগোতে থাকলো। যাওয়ার সময় কি মনে করে যেন সে নষ্ট টর্চটা হাতে নিয়ে নিলো শব্দটা আসছে করিডোরের শেষ মাথার রুমটা থেকে। যাওয়ার পথে আচমকা একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। তবে একটা লাভও হলো। কীভাবে যেন পড়ে গিয়ে টর্চটা আবার জ্বলতে শুরু করেছে। রবিন মনে কিছু স্বস্তি পেল। রুমের দরজাটা কিছুটা খোলা। কিন্তু রবিনের স্পষ্ট মনে আছে সে এই দরজাটাকে বন্ধ দেখেছিল। ভেতরে কী আছে তা দেখার জন্য সে ধীরে ধীরে দরজাটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো কিছু একটা যেন জানালার পাশ থেকে অন্ধকারের দিকে সরে গেল। তার ভয় বাড়তে লাগলো।

সে রুমের এক কোণে আয়তকার বাক্স জাতীয় কিছু আবিষ্কার করল। কাছে গিয়ে বুঝতে পারল যে সেটা একটা কফিন। এই কফিনটা এই বাড়ির মধ্যে কেনো তা সে বুঝতে পারলো না। হঠাৎ সে তার পেছনে কারো উপস্থিতি অনুভব করল। সে পেছনে টর্চের আলো ফেলে যা দেখল তা দেখে তার পুরো শরীর কেঁপে উঠল। একটা জীবন্ত লাশ তার দিকে এগিয়ে আসছে। লাশটার কোনো চোখ নেই, তার জায়গায় কোটরগুলো কালো রক্তে ভরা। তার শরীরটা যেন পচে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হাঁড় বের হয়ে আছে, আবার কোনো কোনো জায়গা রক্তাক্ত। লাশটা তার দিকে একপা দুপা করে এগিয়ে আসতে লাগল। রবিনের পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। জায়গাটা থেকে পালানোর কথা সে যেন ভুলেই গিয়েছে। লাশটা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এরপর তার হাত দুটো বাড়িয়ে রবিনকে ধরে ঝাঁকাতে থাকলো। এই রবিন উঠ। সকাল ৮টা বেজে গেছে। স্কুলে যাবি না? হঠাৎ ধড়মড় করে রবিন তার বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তার মা তাকে উঠানোর জন্য হাত ধরে ঝাকাচ্ছিল। কীরে এতো ঘেমেছিস কেন? না মা কিছু না। বলে সে বাথরুমে চলে গেল। কী ভয়ঙ্কর একটা রাতই না সে কাটিয়েছে!

চেরনোবিল: এক বিষাক্ত সুন্দর মৃত্যুগাঁথা

সৌম্য সাহা
কলেজ নং: ৮৬৯১
শ্রেণি: দশম, শাখা: গ (দিবা)

মাত্র ৩৪ বছর আগের কথা।

তারিখটা ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬। রাতের প্রায় শেষ প্রহর। তখনো আকাশে কিছু শ্বেতরশ্মি এক দীপ্তিময় নতুন দিনের আভাস দিচ্ছে। সব ঠিকঠাক মতোই চলছে। কিন্তু কে জানতো মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ঘটে যাওয়া এক ভুলের কারণে চেরনোবিল সাক্ষী হয়ে থাকবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়ের। সদর্পে উচ্চারণ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অশনি হুশিয়ার বাণী।

চেরনোবিলের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দায়িত্বে তখন ছিলেন সুপারভাইজার আলেকজান্ডার আকিমভ। অন্যান্য দিনের মতোই তিনি বিভিন্ন রিঅ্যাক্টরের অংশগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলেন। তাকে নিয়ে একটি পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এজন্য সুপারভাইজার আকিমভকে রিঅ্যাক্ট ৪ এর কিছু স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমে তিনি রাজি হননি। কেননা এর পরিণাম ভয়াবহ ও হতে পারতো (সত্যিকার অর্থে তার কল্পনার চেয়েও আরও অনেক বেশি ভয়াবহ অবস্থা আসতে চলেছিল)। কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার পর তিনি ২০ সেকেন্ডের জন্য নিরাপত্তা সিস্টেমগুলো বন্ধ করতে রাজি হন। এরপরই মূল পরীক্ষাটি শুরু হয়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসকল নিয়ন্ত্রক বড়গুলোর ধীরে ধীরে বিক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তারাই আরও দ্রুতগতিতে বিদ্যুৎ টেনে বিক্রিয়ার হার বাড়িয়ে দিতে শুরু করে। আমরা জানি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিক্রিয়াগুলো মূলত উত্তপ্ত ইউরেনিয়াম থেকে যে তিনটি নিউট্রন প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে আসে। তার কারণে অন্য ইউরেনিয়ামগুলো গতি কমে আসার পর সেগুলো আবার নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে দেয় এবং এভাবে চলতেই থাকে। আর এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপশক্তি দিয়ে পাম্পের মাধ্যমে বাষ্প তৈরি হয় এবং সেটি দিয়ে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু সেদিন চেরনোবিলের উপর আছড়ে পড়া প্রবল বিদ্যুতের স্রোত চাপের পরিমাণ মুহূর্তের মধ্যে অনেক বাড়িয়ে দেয়। এতে ১০০০ টনের শীর্ষটুকু ভেঙে পড়ে এবং সাথে সাথেই শুরু হয় এর ধ্বংসলীলা। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে এর বিভিন্ন জায়গায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট হুংকার শোনা যায়। বিস্ফোরিত হয় চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৪ নং এর ২০০ টন পারমাণবিক কোরের মাত্র ৫% বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক হচ্ছে সিয়েভার্ট। কোনো পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের আশেপাশে ২ মিলি সিয়েভার্ট এর মতো তেজস্ক্রিয়তা থাকলে সেটিকে মোটামুটি নিরাপদ হলে গণ্য করা যায়। কিন্তু সেদিন একলাফে চেরনোবিলের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ২০০০ এ। এটি যে কতটা ব্যাপক তা বোঝানোর জন্য ছোট্ট একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা নাগাসাকিতে ফেলা লিটল বয় ও ফ্যাট ম্যান এর কথা আমরা ভাবতে পারি। সেই ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার তুলনায় প্রায় ৫০০ গুণ বেশি তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে। তবে সেদিন এই ভয়াবহ দুর্যোগ থামাতে রাশিয়ানরা কম চেষ্টা করেননি। সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চপদস্থ শাসনকর্তারা যখন নিজেদের তথা সমগ্র মানবসভ্যতার এক কলঙ্ক এড়াতে নৃশংসতা ও মৃত্যুর মিথ্যা ইতিহাস লিখতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিদ্যুৎ কর্মীদের সাথে একাত্ম হয়ে শত শত দমকল কর্মীরা নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিল। সেই সাথে এলাকা জুড়ে এর উপরে বিমান দিয়ে ঘন্টায় প্রায় ৩০০ টন পানি ঢালা হয়েছিল । পাইলটরা প্রায় ১৮০০ বার চক্কর দিয়েছিল এবং তেজস্ক্রিয়তা শুষে নিতে পারে এমন বস্তু ফেলা হয়েছিল। তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে ফেলা হয়েছিল লেড বা সিসা। তাপমাত্রা হ্রাসে ডেলোমাইট ফেলা হয়েছিল। সবশেষে বালু ফেলা হয়েছিল যা একটি পর্দা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বায়ুপ্রবাহের ফলেই সবকিছু উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আক্ষরিক অর্থেই আকাশ থেকে নেমে আসে মৃত্যুবাণ। প্রায় ২ লাখ বর্গকিলোমিটার জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে যদিও বড় হওয়ার দরুণ এটি বেশি দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েনি কিন্তু আয়োডিন সমগ্র ইউরোপজুড়ে তো বটেই এমনকি জাপানেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দেড় লাখ মানুষ মুহূর্তের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে যায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। দমকলকর্মীদের মধ্যে ২৩৭ জন ভয়াবহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১০ই মে আগুন নেভাতে তারা সক্ষম হন। এরপর নভেম্বরে এর চারপাশে এর শবাধার বানিয়ে একে কবর দেওয়া হয়। যদিও প্রায় ২০০ টনের মতো জ্বালানী এখনো ওখানেই পড়ে আছে। চেরনোবিলের বাকি ৩টি রিঅ্যাক্টর ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সচল ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে এ আগুন লাগায় কর্তৃপক্ষ সমগ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃক যে রহস্যের ধোয়াশা তৈরি হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়ে বেলারুশের একজন নাগরিক রচিত বইয়ের মাধ্যমে সমগ্র সত্যিটা প্রকাশ পায়। তিনি তাদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনেছেন। উল্লেখ্য তাঁর এ মহামূল্যবান কীর্তির জন্য ২০১৫ সাথে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

মানুষ ও প্রকৃতির চেষ্টায় এটি আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে শুরু করেছে। এখন সেখানে ব্যাপক বনাঞ্চলের পাশাপাশি হরিণ, কাঠবিড়ালী, বাইসন, বানর প্রভৃতির আনাগোনা পরিলক্ষিত হয়। তবে এর আশেপাশের জায়গা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সময় লাগবে আরও ২০,০০০ বছর।

পথ শিশু

সাদমান হক
কলেজ নং: ১৭৬০৮
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: খ (প্রভাতি)

খুব ভোরে গার্ডের লাথিতে অরণ্যের ঘুম ভাঙল। এই ওঠ ফকিন্নি পোলা যা ভাগ এই খান থেইকা। অরণ্য তার সদ্য ভাঙা ঘুম চোখে নিয়ে দৌড়ে পালাল। ছেলেটা ১২ কিংবা ১৩ বছর বয়সী হবে হয়তো। গতকাল রাতেই তো সে বস্তি থেকে পালাল। নতুন একটা এলাকার দোকানের সামনে ঘুমিয়ে ছিল সে। অনেকটা দূর পালিয়ে এসেছে ভেবে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ছিল। এখনও গতকাল রাতের কথা মনে পড়ে ভয়ে বুক কাঁপে অরণ্যের। বেড়ার আড়াল থেকে সে তাদের ভিক্ষুক দলের সর্দার কাসেম ভাইয়ের কথা শুনে ফেলেছে।

পোলাডা বেশি ভিক্ষা পাইতাছে না। অর চোখ কানা কইরা হাত ভাইঙ্গা লুলা কইরা দেওয়া লাগব। এই কথা শুনে সে আর দাঁড়ায়নি। সেখান থেকেই ছুট দেয় অরণ্য। রাস্তার পাশে একটা চাপকল থেকে হাত মুখ ধুতে ধুতে অরণ্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। আজ থেকে সে কাজ করে খাবে। কাছেই রেলস্টেশন। সেখানে কাজের সন্ধানে যায় অরণ্য। মাঝে মাঝেই ভয়ে শিউরে উঠছে। ভীড়ের মধ্যে আবার কাসেম ভাইয়ের লোক নেই তো? পাছে যদি ধরে ফেলে? কুলির কাজ খুঁজছে অরণ্য। এক সাহেব গোছের মানুষকে দেখে তার দিকে এগোতে গেলে তার বয়সী কিছু ছেলে তাকে পাকড়াও করে। একটু লম্বা মতন ছেলে তাকে বলে, "এই তুই কিডা? নতুন মনে হইতাছে। জানোস না এইডা আমাগো এলাকা?" অরণ্য ভয়ে প্রথমে কথা বলতে পারে না। কিন্তু কিছু সময় পরই সে তাদের দলের একজন হয়ে ওঠে। কারণ পথশিশুরা একত্র হতে জানে। একতার মর্ম তারা বোঝে। সেও তাদের পরামর্শ মেনে কাজ করতে থাকে।

এক মধ্যবয়স্ক লোকের কুলির কাজ নেয় সে। রিকশা থেকে প্লাটফর্মের কাছে ভারি ব্যাগ অনেক কষ্টে বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ব্যাগের ওজন ঠিক ভাবে সামাল দিতে না পারায় ব্যাগ নামানোর সময় একটু জোরে শব্দ হয়।

হারামজাদা এর ভেতর কাঁচের জিনিস ছিল। দেখে নামাতে পারিস না। সে অসহায় অরণ্যকে লাথি দিয়ে রেললাইনে ওপর ফেলে দেয়। উঁচু প্লাটফর্ম থেকে পড়ে গিয়ে বেশ আহত হয় সে। রক্তমাখা অবস্থায় কিছুক্ষণ পড়ে থেকে ট্রেনের হুইসেল শুনে অরণ্যের হুঁশ ফেরে। উঠে দৌড় দিতে যাবে তখন দেখল ওর পা লোহার পাতের নিচে আটকে গেছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও বেকায়দায় পড়ে গেল অরণ্য। ওদিকে ট্রেন এগিয়ে আসছে। সে নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে । ওদিকে ট্রেন থামছে না। ট্রেনটা হয়তো আজকে এই স্টেশনে থামবে না।

এক দেশ দুই নীতি

তুর্জয় বসাক অর্ক
কলেজ নং: ১৭৩৬৪
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

বিশাল জনসংখ্যা ও অর্থনীতির দেশ চীন বরাবরই তার বৈচিত্র্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী আলোচিত। ১৯৯৭ সালের ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং চীনের সাথে যুক্ত হয়। এরপর প্রায় দুই দশকের অধিক সময় পার হলেও, হংকংয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিস্তার অব্যাহত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক চীনের হংকং-এ প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চীনের শাসন প্রণালীতে এক বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। আর সে কারণে চীনকে 'এক দেশ দুই নীতি'র দেশ বলা হয়। প্রাচীনকালে হংকং চীনের অংশ ছিল। ১৮৪১ সালে প্রথম আফিম যুদ্ধের পর ব্রিটেন হংকং দখল করে নেয়। ১৮৪২ সালে 'নানকিন চুক্তি'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীপটি ব্রিটেনের অধিকারে আসে। সেই ১৮৪২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫৫ বছর হংকং ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটতে শুরু করে। এই সময় ব্রিটেন কৌশলগত কারণে হংকং-এ নিজেদের শাসন অব্যাহত রেখেছিল। ব্রিটেনের রানি নিজের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য হংকং-এ প্যান প্রস্তাবসহ বেশ কিছু সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন করেন। এর ফলে হংকংবাসী ঔপনিবেশিক শাসনে থেকে প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের স্বাদ নিতে শুরু করে। সেই সময় চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে চীন মূল ভূখণ্ড থেকে গণতন্ত্রপন্থী শরণার্থীরা হংকং আসতে শুরু করে। এই সব আগত শরণার্থীদের দক্ষতা এবং বিপুল মূলধন হংকং এর অর্থনীতিকে চাঙা করে তোলে। যার ফলে বিশ্বের বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর দপ্তর সাংহাই থেকে হংকং-এ স্থানান্তর হয়। হংকং এর অর্থনীতির উন্নতির পাশাপাশি ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৮০ দশকে চীন ও ব্রিটিশদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। সে সময় চীনের নেতা দেং জিওপিং সাংবিধানিক নীতির মাধ্যমে একক চীন গঠনের কথা বলেন। যেখানে হংকং এবং ম্যাকাউ নিজস্ব অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বজায় রেখে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হবে। এই নীতির মাধ্যম দুটি দেশ বহির্বিশ্বের সাথে আলাদা বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখতে পারবে। ১৯৮৪ সালে চীন ও ব্রিটেন আলোচনা সাপেক্ষে হংকং ইস্যুতে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র সাক্ষর করে। এই ঘোষণাপত্রই হংকং এ সার্বভৌমত্ব স্থানান্তরে ভীত হিসেবে কাজ করে। ১৯৯৭ সালে পহেলা জুলাই হংকং-এর জন্য গৃহীত আইনগুলো কার্যকর হয়। এর ফলে হংকং ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে চীনের বিশেষ

স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তখন থেকে চীনের অভিনব 'এক দেশ দুই নীতি' প্রথা কার্যকর হয়, যার মেয়াদ ৫০ বছর অর্থাৎ ২০৪৭ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে। সমাজতান্ত্রিক চীনে পুঁজিবাদী হংকং অর্ন্তভুক্ত হয়ে তাদের অতীত ঐতিহ্য বজায় রাখে। এই ব্যবস্থায় বেইজিং-এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকলেও হংকংকে এককভাবে চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

হংকং এর প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে হংকং চীনের অধীনে থাকলেও হংকং এর নিজস্ব বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব বজায় রাখার ঘোষণা ছিল চীন-ব্রিটেন ঘোষণাপত্রে। যার ফলে হংকং বর্তমানে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সংস্থা এপেক এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের সদস্য। দ্বি-পাক্ষীয় চুক্তির কারণে হংকং অন্যান্য দেশ এবং অঞ্চলগুলোর সাথে বিদ্যমান পরিসেবা পরিচালনা করে থাকে। এমনকি হংকং চীনের মধ্যে ফ্লাইট লো আন্তর্জাতিক ফ্লাইট হিসেবে গণ্য করা হয়। এমনকি হংকং চীনের মধ্যে সীমানাও আন্তর্জাতিক সীমানার মত নজরদারি করা হয়। তাছাড়া হংকংবাসী এবং চীনা নাগরিক একে ওপরের দেশে যাতায়াত এর জন্য ভিসা দরকার হয়। হংকংবাসীরা এখনও আগের দিনের মত ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে। হংকং এর মাতৃভাষা ক্যান্টোনিজ হলেও এখানকার বিদ্যালয়গুলোতে চীনা মান্দারিন ও ইংরেজি ভাষা শেখানো হয়। টেলিযোগাযোগের জন্য হংকং এর নিজস্ব আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড আছে (+৮৫২)। হংকং এর প্রধান নির্বাহী নির্বাচনের জন্য ১২০০ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়।

বর্তমানে হংকং-এ কিছু নিয়মের পরিবর্তন আনা হয়। আগে ব্রিটিশ নাগরিকরা বিনা ভিসায় হংকং গিয়ে ১ বছর কাজ করতে পারত। সেই নিয়ম এখন বাতিল করা হয়েছে। 'এক দেশ দুই নীতি' প্রথায় সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে চীন হংকং এর বিভিন্ন মতের প্রতি চীন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে। হংকং-এর স্থানীয় সরকার চীনের পুতুল সরকার বলে অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে চীন বৃহত্তর গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করতে ব্যর্থ হয়। মধ্যমপন্থীদের ধারণা দুই পক্ষের সমঝোতার অভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। হংকংবাসীর দাবি চীন হংকং এর স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ মর্যাদা দিচ্ছে না। হংকং হস্তান্তরের ২০ বছর পর এই সমাজব্যবস্থায় একটি টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে। হংকং ও চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে এই সমস্যা শেষ হওয়ার নয়। তাই হংকং এর রাস্তায় চীনবিরোধী বিক্ষোভ 'এক দেশ দুই নীতি'র ব্যবস্থার অন্ধকার দিক নির্দেশ করে।

আমার DRMC ও হাউস জীবন

রুহুল খান মুন
কলেজ নং: ১১৪৮৭
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: বি (দিবা)

স্বপ্ন পূরণের প্রায়োগিক বিষয়গুলো যদি তুলে ধরি তবে তার মূলে রয়েছে দৃঢ় উদ্দীপনা, চেষ্টা ও পরিশ্রম। ছেলেবেলা থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল একজন মিলিটারি অফিসার হওয়া। আমার বাবা আমার মনে এই অনুপ্রেরণা যোগাতেন। কিন্তু যতই বড় হচ্ছিলাম ততই আমার মনোবল দুর্বল হতে থাকে। তার একটাই কারণ আমি একজন নন-ক্যাডেট। তখন নিজের লক্ষ্যকে পুনরায় পরিপূর্ণভাবে স্থির করার জন্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করি DRMC কে নিয়ে। নবম-দশম শ্রেণির সেশন যা ছিল তাকে আমি সহজ ভাষায় বলবো Strive for get on opportunity to study in DRMC মহান আল্লাহর অশেষ কুদরতে অতঃপর আমি আমার স্বপ্নের কলেজে পড়ার সুযোগ পাই। শুরু হয় কলেজ জীবন।

জয়নুল আবেদিন হাউসে আমার এ্যালোট হয়। আব্বু, আম্মুকে রেখে যখন কেঁচিগেটের বেড়াজালের মধ্যে ঢুকে যাই তখন মনে হয়েছিলো হয়তো দুই এক মাসের মধ্যে আর দেখা হবে না। আমি বাবা-মায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। জীবনে প্রথম দেখা বাবার চোখের সেই অশ্রু আমায় সেদিন ভীষণ তাড়িত করে। শুরু হয় আমার হাউস জীবন।

আমার মনে পড়ে দীর্ঘ এক সপ্তাহ বাবা মায়ের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি। অতঃপর কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক শামসুজ্জোহা স্যার আমাকে বাবার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেন। বাবার মৃদু কান্নার স্বর ওপার থেকে ভেসে আসে আমার কানে। যেনো কত বছর পর তার সাথে আমার কথা। এভাবে বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কখনও কখনও ছুটির পর অনেক অভিভাবকের কাছেও ছুটে গিয়েছি। সেই একই বাক্য আন্টি একটা কল করতে দিবেন? বাড়িতে অনেকদিন কথা বলি না।

প্রথম প্রথম অনেক কষ্টে হাউসের দিনগুলো অতিবাহিত হয়। বাঁধা-ধরা কঠোর সেই নিয়মকে সংক্ষেপেই বলি- ভোরে ঘুম থেকে উঠে মর্নিং পিটি, তারপর ডাইনিং করে ৩-৪ ঘণ্টা সময় রাতে ডাইনিং করেই লাইন ধরে নাইট ক্লাসে যাওয়া। রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত নাইট ক্লাস করার পর হাড় জুড়াই। তারপরেই আবার ১১.০০ টায় লাইট অফ। এভাবে বিষাদগ্রস্ত দিন অতিবাহিত হতে থাকে। প্রতিদিন অন্তত ৬-৭ বার করে পোশাক পরিবর্তন করতে হয়। তবে এখানকার সুশৃঙ্খল পরিবেশ,

শিক্ষক, বড় ভাই ও বন্ধুদের ভালোবাসা আমার এই অবসাদকে দিনের পর দিন দূরীভূত করে। এই বাঁধা-ধরা নিয়ম ধীরে ধীরে আমার অভ্যাসে পরিণত হতে শুরু করে। এই জীবন এখন আমার নিকট আদর্শ স্বরূপ। মনে হয় যেনো আমার স্বপ্নের মিলিটারি জীবনের প্রাথমিক কিছু ধাপ আমি অতিক্রম করে যাচ্ছি যা প্রতিনিয়তই আমাকে প্রস্তুত করে তুলছে।

রাত যখন নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় তখন হাউসের পশ্চিম বারান্দায় এসে দাঁড়াই। তাকিয়ে থাকি আকাশে প্রজ্জ্বলিত তারকারাজির পানে। তারকারাজি যেমন অন্ধকার আকাশে জ্বলে উঠে, তেমনি রেমিয়ান সাদা ইউনিফর্মও আমায় শেখায় কীভাবে তিমির থেকে প্রজ্বলিত হতে হয়। রাতের এই নির্জনতায় মৃদুস্বরে জোর গলায় কখনও মনে মনে গান রচনা করতেও ইচ্ছে হয়। এই প্রকৃতি পরিবেশের মায়াজালে আটকা পড়ে বিভোর ব্যাকুল হয়ে খুব করে বলতে ইচ্ছা করে-ভালোবাসি DRMC কে, ভালোবাসি ৫২ একরের স্বর্গকে।

স্মৃতিচারণ

জুবায়ের আহমেদ
কলেজ নং: ১৬৫৯১
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: চ (প্রভাতি)

ফিরে দেখা পাঁচটি বছর।

মানুষ পেছনে ফিরে তাকাতে পছন্দ করে। বিশেষ করে স্মৃতিগুলো যদি সুখস্মৃতি হয়। আমি আজকে আর দশটি মানুষ থেকে ব্যতিক্রম হলাম না।

পাঁচ বছর আগের কাহিনি। অনেক কিছুই মনে নেই। তাই স্মৃতিকে পরিবর্তিত করে উপস্থাপনের জন্য আগেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। তবে চেষ্টা করব যাতে হৃদয়ের কথাটাই বেরিয়ে আসে। তাহলেই আমার আজকের কষ্ট সার্থক হবে।

২০১৫ সালের ৯ জানুয়ারি। কী বার ছিল মনে নেই। তবে ক্যালেন্ডার দেখেও বের করতে চাই না। কারণ বলেছি তো শুধু হৃদয়ের কথাটাই লিখার চেষ্টা করব।

৯ জানুয়ারি শুরু হলো জীবনের নতুন একটি অধ্যায়। আগেও হোস্টেলে ছিলাম তাই খুব কষ্ট হয়নি। যা হোক জয়নুল আবেদিন হাউসে ওঠার মাধ্যমে শুরু হয় আমার ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জীবন। এ জীবনের কিছু স্মৃতি প্রকাশ করার জন্যই আমার আজকের এ পরিশ্রম। প্রথম বৃহস্পতিবার : শুনলাম আজ নাকি ৩ নং শিক্ষা ভবনের ১০৬ নং রুমে মুভি দেখাবে। আরে ভাই, নতুন student-তো Residential এর বাতাস তখনও মনে লাগেনি। হাউজ টিউটর ছিলেন MSS Madam-আরে বাবা এ আবার কোন ধরনের নাম? আপনি প্রশ্ন করলে অবাক হবো না। DRMC এর প্রত্যেক টিচারকেই একটি সংক্ষিপ্ত নাম দেয়া হয়। যাই হোক ম্যাডামকে গিয়ে বললাম আমি যেতে চাচ্ছি না, ম্যাডাম ।

ম্যাডাম বললেন, তোমাকে যেতে হবে। দেখ সবাই যাচ্ছে। আর শোনো প্রতি বৃহস্পতিবার এভাবে মুভি দেখানো হবে। শুনে তখন কী রকম লেগেছিল তা খুব একটা মনে নেই। তবে এখন মনে হয় সে নিয়ম বহাল থাকলে ভালো হতো কারণ এখন আর সে নিয়ম নেই।

আরে বাবা এ দেখি কদিন পরপরই বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আমি একটু অন্য রকমই ছিলাম। সময় পেলেই পড়তাম। যদিও Result খুব একটা ভালো ছিল না। যা হোক Cultural সপ্তাহ ২০১৫-তে আমার মতোই নতুন আগত একটি ছেলে এবার অভিনয় করল এবং সেকেন্ড হলো। আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ ওরফে টমি কে নিয়ে আমরা অনেক মজা করলাম। House Life এ আমরা অনেকেই নাম পেয়েছিলাম। তার মধ্যে সাইদ পেয়েছিল টমি নামটি।

যা হোক সে বছর Cultural এ রানার আপ হয় আমাদের হাউস।

আমি কেমন ছিলাম? আমি হয়তো একটু ব্যতিক্রমই ছিলাম। পড়াশুনা করতাম অনেক। প্রমাণ চান? Cultural Program এর সময়ও বই নিয়ে যেতাম। জিজ্ঞেসা করবেন আমার রেজাল্ট কেমন ছিল?

DRMC এর প্রথম পরীক্ষাকে স্মরণ করে রেখেছি 1st CT তে ফেলের মাধ্যমে। 2nd CT তেও ফেল করেছি। যা হোক সব বাবার থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না আমার বাবাও। বাবা হয়তো ভাবতেন ছেলে আমার DRMC তে পড়ে কতই না সৌভাগ্যবান! বিস্কুটের প্যাকেটে ভর্তি থাকত লকার। না না sorry বিস্কুটের বাক্সে না বললে ভুল হয়।

আর আমি কেমন কিপটে ছিলাম তা শুনবেন? আমার একজন Classmate পানি চেয়েছিল। নতুন কেনা পানির বোতল তো, আমি বলেছিলাম "কেনা পানি, ভাই"। জানি না কথাটা কি Boring নাকি কিপ্টামির আদর্শ নিদর্শন। ও! দুঃখিত। বলাই তো হয়নি। আপনার মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল যে আমার নিক নেম কী? তার উত্তর দিচ্ছি। ... না দিতে লজ্জা হচ্ছে।...

আচ্ছা বলেই দিই, goga, Boring এই নামের কোনো অর্থ আমার জানা নেই। Boring এর অর্থ আপনারই ভালো জানেন। জুনিয়র হাউসে ছিলাম ২০ জনের রুমে। মাত্র Class-8 পড়াশুনার চাপও কম ছিল। মাঝে মাঝেই মুড়ি পার্টি ও গ্রিল পার্টি হতো। এসব পার্টির বর্ণনা মুখে দেয়ার ক্ষমতা আমার নাই।

যাক এক বছর পর Class-9 থেকে সিনিয়র হাউসে থাকতে হবে। কোন হাউসে থাকব বা আমাদের ভাগ্য কোন হাউসে তা নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিলাম। তবে সবাই একমত ছিলাম যে লালনে কেউ পড়তে চাই না। কারণ ওই হাউসে ছিলেন Don

স্যার। স্যারকে আমরা প্রথম থেকেই Don নামেই চিনি। কারণ বলা যেতে পারে তার ব্যবহার Don এর মতো। ভাগ্যের লীলাখেলায় তার সান্নিধ্যই পেলাম আমরা। পাঁচ জনের এক রুমে আমরা ছিলাম। এ হাউসে থাকতে কোনোই সমস্যা হয় নি। Don কে যতটা ভয় পেয়েছিলাম তার কিছুই না। কারণ তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদী ও ন্যায়ের সঙ্গী।

SSC পরীক্ষার সময় জয়নুলের প্রতিদ্বন্দ্বী কুদরতে থেকে পরীক্ষা দিলাম। ১৩ জন এক রুমে ছিলাম। পরীক্ষার শেষের দিকে কোনো একদিন Mako ভাই (মাকসুদ) এর জন্মদিন ছিল। Tradition রক্ষা করেই আমরা বাকি এক ডজন মিলে তাকে গণ দিই। যাক এভাবেই কেটে গেল স্কুল জীবন।

২০১৮ সালের ১ জুলাই কলেজ লাইফ শুরু হবে। আগের দিন নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছিল। N/H এর আবাসিক ছাত্র হিসেবে উঠলাম। এ হাউজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বাবা (MAH মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন স্যার বাবা নামেই পরিচিত)। তিনি হাউস মাস্টার ছিলেন। তার মহান বাক্য বাবা কলাটা খেয়ে নাও। আজও মনে পড়ে।

যাই হোক ২০১৮ সালে একটি মাত্র প্রতিযোগিতাই আমরা পেয়েছিলাম। ফুটবল প্রতিযোগিতা । এ Tournament এর ফাইনালটি ভোলার মতো না। First Half এ ১-০ গোলে পিছিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। এর মাঝ সময়ে Indirect Free Cick এ এবং আরেফিনের দুর্দান্ত হেডে বল শহীদুল্লাহ হাউসের জালে ঢোকে। মূল ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র। Tie Breaker এ মাহমুদ ভাইয়ের অসাধারণ Goal Keeping এ চ্যাম্পিয়ন Nazrul Islam House।

২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি MAH স্যার আমাদের হাউস মাস্টার পদ থেকে বিদায় নেন। তার পূর্বে একটি অনন্য রেকর্ড করে দিয়ে যান তিনি। একই বছরে সেবার Sports, Culture, Garden, Wall Magazine এ চ্যাম্পিয়ন হই। পরবর্তীতে আমরা ফুটবলেও চ্যাম্পিয়ন হই।

যা হোক আমরা কলেজ লাইফের শেষদিকে একজন রেমিয়ান প্রিন্সিপাল পেলাম যেটা ছিল আমাদের অন্যতম সেরা সৌভাগ্যের একটি।

কথা সেদিকে না আজ এ লেখাটি লেখার সময় মনে হচ্ছে আর ২ মাস পরই তো কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি জানি আমি মানি আমার আর থাকার অধিকার থাকবে না এখানে। কারণ নতুনকে জায়গা করে দিতে হবে।

কী দিতে পারলাম কলেজকে? কলেজকে অবশ্য দেয়ার মতে আমার কিছু নেই। কিন্তু এ কলেজ যে আমাকে শিখিয়ে দিল একজন ছোট ভাই হতে, একজন আদর্শ বড় ভাই হতে। DRMC ই আমাকে শিখিয়েছে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে। থাক... আর লিখতে পারছি না। চোখের পানিতে যেন খাতাটা ভিজে গেল। ভেজা খাতায় কি আর লেখা যায়?

মা

মাহির আবরার
কলেজ নং: ১৭৩২৬
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: চ (প্রভাতি)

মা ডাকটি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। এই একটি শব্দের মধ্যে রয়েছে সন্তানদের বিভিন্ন না পাওয়ার কষ্ট, তাদের খুশি ও হতাশার অনুভূতি। কারণ মা হলো সন্তানদের সবচেয়ে আপনজন। সন্তানদের খুশি মানেই মায়ের খুশি। কিন্তু আজকে এই মা নামক জনগোষ্ঠীরাই নানাভাবে অবহেলিত।

জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে যেখানে মাদেরকে আনন্দের সহিত তাদের সন্তানদের সাথে থাকার কথা সেখানে তারা বাস করছে বৃদ্ধাশ্রমে। আর মায়েদের এই বৃদ্ধাশ্রমে থাকার মূল কারণ হলো আজকের এই সন্তান জনগোষ্ঠীরা। কিন্তু কেন? কী কারণে তাদের এই অবস্থা, এই পরিণতি? ১০ মাস ১০ দিন ধরে গর্ভে ধারণ করে মা হাজারো কষ্ট সহ্য করে তার সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন এটাই কী তার অপরাধ?

নানা কষ্ট সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করে মা তার সন্তানকে লালন পালন করে বড় করেছেন। বৃদ্ধাশ্রমই কী সেই কষ্টের, সেই ত্যাগের প্রতিদান? আমার এই প্রশ্নগুলো সেই মনুষ্যত্বহীন পশুর ন্যায় সন্তানদের প্রতি রইল যারা তাদের সেই মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, যেই মা তাদেরকে কখনও একলা হতে দেয়নি-সর্বদা ছায়ার মতো মাথার উপর ছিল।

আজকাল বৃদ্ধাশ্রমে থাকা মায়েদের নানান করুণ অবস্থা দেখে আমরা ব্যথিত হই। কিন্তু শুধু ব্যথিত না হয়ে তারা যেন তাদের বাকি জীবন আনন্দে অতিবাহিত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের মায়েরা গাড়ি-বাড়ি-টাকা চান না। তারা শুধু চান তাদের সন্তানরা তাদেরকে এক গ্লাস পানি এনে দেবে, তাদের চশমা খুঁজে দেবে। তাই আমাদের আজকের এই সন্তান জনগোষ্ঠীদের উচিত আমাদের মায়েদের সেই সকল ইচ্ছা বাস্তবে রূপদান করা।

নীরবতাই মহা অভিশাপ

চন্দনকুমার রায়
কলেজ নং: ১১৮৮৬
শ্রেণি : একাদশ, শাখা: ছ (দিবা)

আমরা বাঙালিরা নাকি নীরব, অতি শান্তশিষ্ট ও ভারি। আমরা কীসে নীরব? আর কেনই বা নীরব থাকি? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজলে পাওয়া যাবে যে, আমরা এ সত্যের ভক্ত নই বলেই আজ আমরা নীরব। নীরবতা দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ এবং নীরবতাই অন্তরের মহৎগুণগুলোকে নিস্তেজ করে দেয়। নীরবতা সত্যিকার অর্থে যে কতটুকু অকল্যাণকর তা এক মনীষীর অমিয় বচনে বোঝা যাবে–

'Silence is the main killer of human civilization.' আজ নীরবতাই আমাদেরকে গোলে হরিবোল বলতে শিখিয়েছে। আর কী বলব সংস্কৃতির কথা? আমরা বাঙালিরা এখন ঢালাই হতে ভালোবাসি। আমরা বাঙালিরা এখন বিলেতি খুরে মাথা মুড়িয়েছি।

নীরবতা তো নিজেকে গুপ্ত করে রাখামাত্র। আর গুপ্ত জিনিসের পক্ষে নাকি দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। নীরবতার মারফতে বাঙালি যে কী অর্জন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্ম অঙ্গনে আমরা আজ হয়েছি আনুষ্ঠানিক ধর্মের পূজারি। সুরের ভুবনে আজকাল চলছে উত্তরোত্তর সুরের নবরূপায়ন। আর সুরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংগীত শ্মশানে। বলা বাহুল্য জ্ঞানীরা বলেন যে সুর নাকি কানের বিষয় আর সার হচ্ছে জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞানকে উপেক্ষা করে কান দিয়ে কী আর অর্জন করা যেতে পারে।

বাঙালির অমূল্য রত্ন হলো বাংলা সাহিত্য। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নাকি আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারব।

সুতরাং সাহিত্যের যদি অবনতি ঘটে তাহলে আমরা প্রকৃত মানুষের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো। এ জন্য অবিলম্বে চাই সাহিত্যের বিকাশ। কিন্তু সাহিত্যের বিকাশের জন্য চাই সাহিত্যিক। কারণ স্রষ্টা ছাড়া তো সৃষ্টি হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে সাহিত্য স্রষ্টাদের প্রকৃত মূল্যায়ন নেই। আজ আমাদের জাতীয় দিবসে কোনো সাহিত্যিকের স্থান নেই বরং রাজনৈতিক কর্মীতে ভরা। তারা না বোঝে সাহিত্য, না বোঝে দায়িত্ব। তারপরও বাঙালিরা নীরবতাকে মহৎ গুণ বলে যেখানে সেখানে বিকায়। এতে আমাদের অমঙ্গলই নিহিত। এর উল্টোটান না টানলে আমরা শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

স্মৃতির আমগাছ

আর এম হাসিবুর রহমান
কলেজ নং: ১১৭১৬
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ছ (দিবা)

এ এক বর্ষার দিন, ঘন মেঘ আকাশে জমাট বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ে। বাড়িতে সকলের মনে নতুন এক আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ ও আনন্দ। বাড়িতে নতুন সদস্য যোগ হবে। সবার মনে একই আকাঙ্ক্ষা, উদয় হচ্ছে-ছেলে হবে নাকি মেয়ে? কিন্তু যে বাবা হবে সে শুধুই প্রার্থনা করে যেন স্ত্রী-সন্তান দুজনই সুস্থ থাকে। বাবার প্রতীক্ষা যেন শেষ হয় না। কিছু সময় পরেই বাবার অপেক্ষার অবসান ঘটল। শুনতে পেলো এক মিষ্টি কান্নার আওয়াজ। বাবার মন প্রাণ আনন্দে আত্মহারা। তার মনে হলো জগতের সব সুখ যেন তার হাতে ধরা দিল। আজকের মত সে আগে এত খুশি কোনো দিন হয়নি। জানতে পারলো একটি ছেলে হয়েছে। হয়তো বাবার মতই দেখতে হবে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আরেকটা সংবাদ শুনতে পায় এবং এর মাধ্যমে তার সমস্ত সুখ শান্তি ভেঙে গেল। ছেলে সুস্থ থাকলেও পৃথিবীতে মা আর নেই। এই সংবাদ শুনে যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সব সুখ, শান্তি যেন তার থেকে কেউ কেড়ে নিল। বিধাতা যেন তার সাথে খেলা খেলল। এক প্রাণের বদলে আরেক প্রাণ। জীবনের পরিবর্তে জীবন। যেন হাসির বদলে কান্না। শোকাহত ভাবে সেই দিন চলে গেল। জানাজা নামাজ হলো, মাটি দেওয়াও শেষ হলো। ছোট্ট শিশুর দাদা-দাদির কবরের পাশে। মনমরা বাবার শোক ছিল ৩-৪ দিন। ছোট্ট শিশুর দেখাশোনা করছে তার কাকি। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে মাতৃহারা কাশেম। মাতৃহারা হলেও মা না থাকার কষ্ট, মা মরার শোক বুঝতে দেয়নি তার কাকিমনি।

মায়ের মতই আদর যত্ন স্নেহ লালন পালন করে বড় করছে তাকে। আদর যত্নের পাশাপাশি মায়ের মত শাসন করতেও তার কাকিমনি ভোলেনি। এখন কাশেমের বয়স ছয়। আজ কাশেমের জন্মদিন। এই দিনেই তার মা মারা গিয়েছিল আজ থেকে ৬ বছর পূর্বে। কিন্তু তার বাবা চায় সে যেন এই দিনের শোক ভুলে আনন্দে কাটায়। সন্ধ্যা হয়ে এলো তবুও বাবার দেখা নেই। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। কাশেমের কাকিমনির মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা যেদিন কাশেমের মা গমন করেছিল পরলোকে আর জন্ম নিয়েছিল ফুটফুটে শিশু কাশেম। এমন সময় কাশেম তার কাকিমনির কাছে তার বাবার ব্যাপারে প্রশ্ন করে, "কাকিমনি, ও কাকিমনি বাবা কখন আসবে? বাবা তো বলেছিল আজ তাড়াতাড়ি আসবে। আমার জন্যে অনেক কিছু নিয়ে আসবে

বলেছিল।" এই কথা শুনে তার কাকিমনিও চিন্তায় পড়ে গেল। কাশেমের বাবার আসার প্রতীক্ষায় যেন দুজনের সময় কাটছে না। তার কাকিমনি ফিরে গেল সেই দিনে। সব যেন মিলে যাচ্ছে আজকের সাথে। সেই ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি। সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ একটা কল আসল। "উত্তরা হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনারা কি সেলিনা আকতার নামে কাউকে চেনেন?" "হ্যা আমি।" "রোড এক্সিডেন্টের ফলে একজন গুরুতর আহত। এখন জরুরি বিভাগে আছে।" "আমরা এক্ষুণি আসছি, এক্ষুণি।" হাসপাতালে যেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। কাউন্টারে যোগাযোগ করা হলো। অপারেশনের জন্য অনুমতি চাইল ডাক্তার। কোন কিছু না ভেবে কাকিমনি ডাক্তারকে অপারেশন শুরু করতে বলে। কাশেম বললো কাকিমনি কী হয়েছে বাবার? অপারেশন কী কাকিমনি? ও কিছু না। কিছু হয়নি তোর বাবার। সব ঠিক হয়ে যাবে। বেশ কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বের হলো অপারেশন থিয়েটার থেকে। ডাক্তার বললো সব ক্ষমতার মালিক আল্লাহতায়ালা। ভাগ্যে যা লেখা ছিল তাই হয়েছে। আমরা তাকে বাঁচাতে পারলাম না।

কাশেমও সেখানেই উপস্থিত ছিল। ওর কান্না আর কে দেখে। তার মনে পড়ে বাবার সাথে কাটানো সময়গুলোর কথা। কাশেমের মায়ের কবরের পাশেই কবর দেয়া হলো। কাশেমের মনে পড়ে যায় বাবার আদর। কতই না আদর করত তাকে। সেই সব মনে করে আর ফুপিয়ে কাঁদে। তার কাকিমনির চোখ থেকেও অশ্রু কম ঝরেনি। কিন্তু সে কী আর করবে? শুধু কাশেমকে সান্ত্বনা দেয় আর বোঝায় তোর বাবা তো মরেনি শহিদ হয়েছে। তিনি তো জান্নাতবাসি হবেন। তোকে আমি পিতামাতার জন্য দোয়া শিখিয়েছিলাম না? ওটা বার বার পড়। সেই দিন কাশেমের জন্য ভালো গেল না। তার জীবন থেকে দুটো রত্ন চলে গেল। সেই রাতে আর কারো মুখে ভাত পড়েনি। গলা দিয়ে খাবার নামেনি। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাশেমের মনে পড়ে যায় তার বাবার বাড়ি ফিরে নিজ হাতে কলা দিয়ে দুধভাত খাওয়াতো। কত কথা মনে পড়ে বাবাকে নিয়ে। মনে পড়ে রাতে এক সাথে ঘুমানোর কথা।

মনে পড়ে রূপকথার গল্প বলার রাত। কে বলবে গল্প? কে বলবে গল্প? সেই মানুষটি তো নেই। পরদিন সকালে তার কাকিমনি বলে ঐ দেখ প্রতিদিন ঐ গাছে পানি দিতো তোর বাবা। ঐ গাছের অনেক দেখাশোনা করত। তোর মা লাগিয়েছিল ঐ গাছ। তাই তো ঐ আমগাছটাকে তোর বাবা অনেক ভালোবাসতো। মনে করবি ঐ গাছেই তোর বাবা মা বেঁচে আছে। আস্তে আস্তে কাশেম বড় হতে থাকে। প্রতিদিন ঐ গাছের দেখাশোনা করে। গাছের আশে পাশে আরো চারা রোপন করেছে কাশেম। রোজ যত্ন নেয়। পানি দেয়। বেড়াও দিয়েছে। অনেক ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে যত্ন নেয় সে ঐ গাছগুলোর। বিশেষ করে সেই স্মৃতিময় বেড়ে ওঠা ছোট আমগাছটির। কাশেম ছিল লেখাপড়ায় বেশ ভালো। এসএসসিতে এ প্লাস পেয়েছে। আজ বৃত্তির রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে বৃত্তি ও পেয়েছে। তাই তার কাকিমনি বেশ খুশি। আর আজই ফিরে এলো কাশেমের কাকা ১৫ বছর জেল খেটে। কাশেমের বাবার মৃত্যুর পূর্বে খুনের দায়ে জেলের ভাত মুখে দিতে হয়েছে। খুব একটা সুবিধার লোক নয়।

ভর্তি পরীক্ষার কোচিংয়ের জন্য কাশেম ঢাকায় আসে। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় তার কাকিকে বলে সে যেন তার গাছ গুলোর যত্ন নেয়। সময় অতিবাহিত হতে থাকে। কাশেম প্রতিদিন তার কাকিমনির খবর নেয়, তার বাগানের খবর নেয়। একদিন কাশেমের কাকি এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছে। কাশেমের কাকার টাকার লোভ ছিল প্রচুর। নেশা করে ও জুয়া খেলে। বাড়িতে গিয়ে সে কোথাও কোন টাকা পায় না। কাশেমের কাকি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যা উপার্জন করে তার এক অংশ জমিয়ে রাখে কাশেমের ভবিষ্যতের জন্য ।

খুঁজতে খুঁজতে তার কাকা সেই টাকা পেয়ে যায়। তার জন্য ওটা ছিল সামান্য। এই কয়েক বছরে আম গাছটি বেশ বড় হয়েছে। তার কাকা সেই গাছটি শেষে বিক্রি করে দেয়। কাশেমের কাকিমনি ৫-৬ দিন পর বাড়ি এসে দেখে গাছটি ইতোমধ্যে কাটা শেষ এবং সে বুঝতেও পারে যে এটা কার কাজ। তার চোখে পানি চলে আসে। সে বার বার কাঁদে আর ভাবে কী বলবে কাশেমকে। কারণ ঐ গাছ ছিল কাশেমের বাবা মায়ের স্মৃতি। কাশেমের ভালোবাসার গাছ ছিল ওটা।

প্রতি রাতের মতো আজও কাশেম ফোন করে তার মাতৃতুল্য কাকিমনিকে প্রথমে সালাম দেয়। জিজ্ঞেস করে, "কেমন আছো কাকিমনি?" কাকিমনি নিজের দুঃখকে পাথর চাপা দিয়ে রাখে আর বলে, "আমি ভালো আছি। তুই ভালো আছিস বাবা?" "আমিও ভালো আছি। রাতে খেয়েছ?" কাকিমনি উত্তরে বলে, "হ্যাঁ, আমি খেয়েছি। তুই খেয়েছিস?" কাশেম বলে, "আমার চিন্তা করো না। আমি এখনই খাবো। আগে বলো বাগানের যত্ন নিয়েছ?" কাকিমনি কাশেমকে আর কষ্ট দিতে চায় না। ওর কাকি জানে যে কাশেম সত্যি জানলে ঠিক ততটাই কষ্ট পাবে যেমনটি তার বাবার মৃত্যুর সময় পেয়েছিল। তাই শুধু কাশেম যেন ভালো থাকে এই জন্য মনের সব দুঃখ চেপে রেখে বলে, "হ্যাঁ রে বাবা, দিয়েছি পানি। আর যত্নও নিয়েছি। তুই কোনো চিন্তা করিস না। আর মিষ্টি মিষ্টি আম পেড়ে রেখেছি। আসলে খাবি। জলদি চলে আয় এই বার।" কথা শেষ করে তার কাকি কেঁদে কেঁদে রাত কাটায়।

ভালো না লাগা; একটি জাতীয় সমস্যা

আব্দুল্লাহ আল যুবাইর
কলেজ নং: ১৭৬২৪
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ক (প্রভাতি)

সোহাগের ফ্রেন্ড নাহিন বলল, ভাইয়া আমার কিছুই ভালো লাগে না। নতুন কিছুতে আগ্রহ জাগাতে পারলে সেটা দু-এক দিনের বেশি থাকে না। একটানা কয়েকদিন লেগে থাকতে পারি না। টায়ার্ড হয়ে যাই। ট্রাফিক জ্যামে পড়লে বিরক্ত হয়ে যাই। এসব শুনে আমি বললাম–

শুন, যে ট্রাফিক জ্যামে তিন ঘন্টা আটকে থাকায় তোর মেজাজ খারাপ হচ্ছে, ট্রাফিক জ্যামেই পুলিশ সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকে তোকে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে। যে রিকশায় পলিথিনের ছোট ফুটা দিয়ে পানি ঢুকে প্যান্ট ভিজে যাওয়ায় তুই বিরক্ত হচ্ছিস। সেই রিকশা চালক বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তোকে পৌঁছে দিতে।

ভালো না লাগা, বিরক্ত হওয়া পাবলিকও তুই একা না। রিকশাওয়ালারও রিকশা চালাতে ভালো লাগে না। ধুলা-বালি, বাসের ধোঁয়া গিলতেও ট্রাফিক পুলিশের মজা লাগে না। আসলে দুনিয়ার যার যে কাজ, তার সেটা করতে ভালো লাগে না। তারপরও ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে, সর্দি-কাশি ভুলে গিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছে। কেন? কারণ তারা কাজ করে, উপার্জন করে, প্রয়োজন মেটাতে, ইমোশনাল ফুলফিল করতে, ঝামেলা ওভারকাম করতে। যার প্রয়োজন বা ইমোশন যত তীব্র, তার অজুহাত, আলসেমি বা ভয় তত কম।

সব বাবা-মায়ের কাছে তার ছেলেমেয়ের পড়ালেখার খরচ, বাসা ভাড়ার টাকা, খাওয়ার খরচ, ইনকাম করার ইমোশন ও রেসপনসিবিলিটি খুবই স্ট্রং। সেজন্যই সে ঝড় -বৃষ্টি-বাদলার দিনেও ভালো লাগতেছে না বলে চুপ-চাপ বসে থাকে না। বরং ঠিকই কাজে বেরিয়ে যায়।

মনে রাখবি, 'ভালো না লাগা' একটি জাতীয় সমস্যা। এটাকে প্রশ্রয় দিলে তুই ধ্বংস হয়ে যাবি। আর এটাকে কন্ট্রোল করতে পারলে, তুই এগিয়ে যাবি। তাই মজা না পাইলেও তোর কাজে বার বার ফিরে আসতে হবে। ভালো না লাগলেও বই খুলে বসতে হবে। লাস্ট বেঞ্চে বসে বুঝতে না পারলে, ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দফারফা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকতে হবে। তাহলেই দেখবি ভালো না লাগা রোগ অজান্তেই পালিয়ে যাবে।

স্বপ্নের নাম ৫২ একর

স.ম. নাভিদ আবদুল্লাহ পান্থ
কলেজ নং: ১৭৫৯৪
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ক (প্রভাতি)

ছোটবেলা, যখন ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়তাম তখন বাবার মুখে শুনতে পাই ৫২ একর অর্থাৎ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের কথা। ঐ সময়টাই বাবা-মার চাকরিসূত্রে শহরের বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় থাকা হতো। তাই ঐ রকম অবস্থায় ৫২ একর নিয়ে কোনো আগ্রহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি না হওয়াটাই স্বাভাবিক। সময় বাড়তে থাকে একসময় ক্লাস টেনে উঠলাম।

ক্লাস টেনে টেস্ট পেপার এর প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে ৫২ একর এর নামটা আবার সামনে উঠে আসে। মনের মধ্যে কীভাবে জানি একটা আগ্রহ তৈরি হলো, ইশ! আমি যদি ৫২ একর এর সদস্য হতে পারতাম। একদিন ফেসবুকে একটি পোস্টের ক্যাপশনে চোখ গেল রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বনাম নটরডেম কলেজ।

পোস্টটি পড়ার পর মনের ভেতর একটি আগ্রহ তৈরি হলো মডেল কলেজ এর আভিজাত্য দেখে। সেদিন থেকে ৫২ একরকে নিয়ে আলাদা একটি অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এস.এস.সি পরীক্ষার রেজাল্ট দিল। আল্লাহর কৃপায় আশানুরূপ ভালো ফলাফল করতে পেরেছি। রেজাল্ট এর পর মাথায় একটাই চিন্তা ছিল কোন কলেজে পড়লে আমার জন্য সবদিক থেকেই ভালো হবে।

যেহেতু মনের মধ্যে ৫২ একরকে নিয়ে আগেই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তাই কলেজ চয়েজ লিস্টের প্রথম স্থানটাই দখল করে নেয় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। বাবা-মার ইচ্ছাও ছিল ছেলেকে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে পড়াবেন। তাই সেদিন থেকে ৫২ একর পরিণত হলো 'স্বপ্নে'।

শুরু হয়ে গেল ৫২ একরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা, সাথে হাজারো ভাবনা আর ৫২ একরকে জানার আগ্রহ। কত রাত যে ঘুমহীন ভাবে কেটে গেছে ইউটিউবে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে দেখতে এর কোনো হিসেবই ছিল না। সবকিছু দেখার পর ভাবতাম ঢাকার মত যান্ত্রিক শহরে কীভাবে এই রকম একটা কলেজ থাকতে পারে। মনে হতো ইট পাথরের হাজারো দালানের মাঝে ছোট্ট একটা স্বর্গ যেখানে রয়েছে মন খুলে বাঁচার হাজারো উপাদান।

সবকিছু দেখার পর একটাই কথা মনের মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছিল যে যেভাবেই হোক স্বপ্নকে সত্যি করতে হবে। কলেজ চয়েজের লিস্টের ভিত্তিতে ফলাফল দিল। আল্লাহর কৃপায় পেয়ে

গেলাম স্বপ্নের কলেজ 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ'। মনে হলো ছোট জীবনটায় একটি সফলতার পালক যুক্ত হয়েছে, কারণ আমি ছোট্ট স্বর্গের ক্ষুদ্র বাসিন্দা হতে পেরেছি।

সেদিন ছিল ২৭ জুন, বেলা ১১টা ৫ মিনিটে প্রথম বারের মতো স্বপ্নের ৫২ একর এ পা ফেললাম। এক পলকেই মনে হলো ৫২ একর তার সকল আভিজাত্য দিয়ে আমাকে আপন করে নিয়েছে। মনে হলো যা চেয়েছিলাম তার থেকে বেশি কিছু পাওয়া। শুরু হলো ৫২ একর এর জীবন যার সাথে মিশে ছিল হাজারো আবেগ।

আর সব থেকে ভালো লাগার বিষয় হলো নামের পাশে যুক্ত হলো নতুন একটি শব্দ (Remian) যার অর্থ যোদ্ধা। জ্বী আমরা যুদ্ধ করেই এখানে এসেছি। আমরা যুদ্ধ করেছি আমাদের ১০ লক্ষ সহপাঠীদের সাথে যাদের পেছনে ফেলে আমরা হয়েছি ৫২ একর এর সদস্য। মনে রাখা উচিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যেমন দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ তেমনি হাজারো 'রেমিয়ান' এর অনুভূতি, স্বপ্ন ও আবেগ। ভালোবাসি ৫২ একর। চিরদিন বেঁচে থাকো আপন মহিমায়।

সমালোচনা

সামিউল হোসাইন সরকার শান্ত
কলেজ নং: ১১৯১১
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ছ (দিবা)

নিন্দুকেরে বাসি আমি
সবার থেকে ভালো
যুগ-জগতের বন্ধু সে-যে
আঁধার ঘরের আলো

উপরে লেখা রবীন্দ্রনাথের লাইনগুলো ঠিক আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে, নিন্দুক বলতে কবি যে সমালোচকদের বুঝিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যিই তো, সমালোচকেরাই তো আমাদের সব থেকে ভালো বন্ধু হওয়া উচিত। তাদের ধরিয়ে দেওয়া ভুল শুধরেই তো আমরা আরো ভালো হই।

সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি সমালোচনা খারাপ না। বরং সমালোচনার মাধ্যমে আমরা অন্যের উপকারও করতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আমাদের জানা থাকা দরকার।

সমালোচনা হলো দুই প্রকার: (১) গঠনমূলক সমালোচনা (২) ধ্বংসাত্মক সমালোচনা। একটা জিনিস আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে যে গঠনমূলক সমালোচনা কারো জীবন গড়ে দিতে পারে আর ধ্বংসাত্মক সমালোচনা কারো জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো খোলাসা হবে। ধরো, তোমার কোনো এক বন্ধু একটা কবিতা লিখেছে। অনভিজ্ঞতার ফলে দু-একটা লাইনে ছন্দের মিল তেমন একটা হয়নি। যার ফলে কবিতাটাকে হাস্যকর শোনাচ্ছে।
এখন যদি তুমি এটা নিয়ে তাকে বল, আরে যাহ্, পারে না ছন্দ মেলাতে আসছে আবার কবিতা লিখতে। বলে হেসে উড়িয়ে দিলে। আবার, তুমি বলতে পারো, দোস্ত, তোর এই দুই লাইনের ছন্দ মনে হয় মেলে নাই, বা আরেকটু মিল থাকলে ভালো শুনাতো। এখানে তোমার প্রথম কথাটা শুনে সে দমে যাবে। হয়তো সে অনেক সৃজনশীলতার অধিকারী ছিল। কিন্তু পরেরবার যখনই সে লিখতে যাবে, ভাববে, আরে আমি তো লিখতে পারি না, ছন্দ মেলাতে পারি না, আমি কেন লিখব? অর্থাৎ তুমি একটা অঙ্কুরিত বীজকে নিজের পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করলে। আবার তোমার দ্বিতীয় কথা শুনে সে উৎসাহ পাবে ও নতুন উদ্যমে আবার লেখা শুরু করবে। অর্থাৎ তুমি একটা অঙ্কুরিত বীজকে বিকশিত হতে সাহায্য করলে।
এখানে প্রথমটা হলো ধ্বংসাত্মক সমালোচনা ও দ্বিতীয়টা হলো গঠনমূলক সমালোচনা। আমরা সবাই সমালোচনা করি। সমালোচনা করতে দোষ নেই। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে- সেটা যেন গঠনমূলক হয়; ধ্বংসাত্মক না হয়।

বুক রিভিউ

ইতেসাফুল হাসান খান নাসিফ
কলেজ নং: ১৭৪৪১
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: চ (প্রভাতি)

"বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এর এক দুর্দান্ত,
দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন, অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি
কোমলে কঠোরে মেলানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর তার।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ, শিহরণ, ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি"
পাঠক, ধরতে পেরেছেন কার কথা বলা হচ্ছে? হ্যাঁ, এ আর কেউ নয়, স্বনামধন্য লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, দুই বাংলার তরুণ সমাজের অন্যতম আকর্ষণ, থ্রিলার বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা এক হিরো, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (বিসিআই) এর দুর্ধর্ষ স্পাই মেজর মাসুদ রানা।

১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রেক্ষাপটে 'ধ্বংস পাহাড়' রচনার মাধ্যমে যাত্রা শুরু 'মাসুদ রানা' সিরিজের। বর্তমানে সিরিজটির বইয়ের সংখ্যা সাড়ে চারশরও বেশি। জুলাই-২০১৯ এ প্রকাশিত

হয় মাসুদ রানা সিরিজের ৪৬ তম বই 'মেডিউসা'। মাসুদ রানা সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়।

অদম্য সাহসী ও দেশপ্রেমিক মাসুদ রানা গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারা পৃথিবী। মাতৃভূমির স্বার্থে আপোষহীন। বিসিআই এর নামকরা এক এজেন্ট। সংস্পর্শে যেই আসে সেই মোহিত হয়। কিন্তু কাউকেই সে বাঁধনে জড়ায় না। রাখে না কোনও পিছুটান। কারণ, পদে পদে তার মৃত্যুর হাতছানি।

নানা বিষয়ে অসামান্য দক্ষতা উদ্রেক করে তার বিস্ময়কর-কার ড্রাইভ, কার রেস, ট্রেজার হান্ট, সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র এক্সপার্ট, শুটিং, প্যারাজাম্প, স্কাইড্রাইভ, স্কুবা, ড্রাইভিং, ইনফিলট্রেটর, এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, পাইলট...। মেদহীন ঘটনাপ্রবাহ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে পাঠকদের। ভৌগোলিক বিষয়ের অসাধারণ বর্ণনা এবং লোমহর্ষক ক্লাইম্যাক্স পাঠককে নিয়ে যায় 'স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে'।

বিস্ময়ের মহাবিশ্ব

মুশফিকুর রহমান মুহিদ
কলেজ নং: ১৭২৯০
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

পৃথিবী একটি বিস্ময়ের নাম। আর এই বিস্ময়কর পৃথিবী হলো বিশাল মহাবিশ্বের একটি অতিক্ষুদ্র অংশ। আমাদের কাছে মহাবিশ্বের বেশিরভাগটাই কাল্পনিক। তবে এই কাল্পনিক মহাবিশ্বের বাস্তবতাগুলো আমাদের কল্পনারও সীমার বাইরে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো এর আকার। মহাবিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই; কারণ মহাবিশ্ব এখনো প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রসারণ মহাবিশ্বের শুরু থেকেই চলমান। আর মহাবিশ্বের আকার নিয়ে বলতে গেলেই যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা হলো মহাবিশ্বের উৎপত্তি। কীভাবে সৃষ্টি হলো এই অসীম মহাবিশ্ব? মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে অনেকগুলো যুক্তি প্রচলিত থাকলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যুক্তিটি হলো স্টিফেন হকিং এর "বৃহৎ বিস্ফোরণ" বা Big Bang Theory। স্টিফেন হকিং এর মতে মহাবিশ্ব এখনো প্রসারণশীল। এই যুক্তিতে স্টিফেন হকিং বলেছেন এই বৃহৎ বিস্ফোরণ বা Big Bang যদি মিলিয়ন অফ মিলিয়ন সেকেন্ড আগে অথবা মিলিয়ন অফ মিলিয়ন সেকেন্ড পরে হতো-

তবে এই মহাবিশ্বের কিছুই সৃষ্টি হতো না। অর্থাৎ থাকতাম না আমরা, আমাদের এই পৃথিবী, আমাদের এই অসীম মহাবিশ্ব। (মিলিয়ন অফ মিলিয়ন সেকেন্ড বলতে বুঝায় ১ সেকেন্ডের ১০০০ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়) অর্থাৎ আমরা যদি স্টিফেন হকিং এর এই মতবাদকে মানি, তাহলে বলতেই হয় যে মহাবিশ্ব তৈরি করা হয়েছিল অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে, যা কখনোই কোনো স্রষ্টা ব্যতীত সম্ভব না। চিন্তা করুন, ১ মিনিট সময় কাকতালীয়ভাবে মিলে যেতে পারে, মিলতে পারে ১ সেকেন্ডও। কিন্তু ১ সেকেন্ডের ১,০০০ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময় অর্থাৎ ০.০০০০০০০০০০০০১ সেকেন্ড সময় কি কাকতালীয়ভাবে মিলতে পারে? এত গেল মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিস্ময়। মহাবিশ্বের এমন অনেক বিস্ময় রয়েছে যা আবিষ্কারের পরও আমাদের অজানা এবং অবশ্যই এমন অগণিত বিস্ময় আছে যা এখনও আমরা আবিষ্কারই করতে পারিনি। মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই কিন্তু আমরা তার বর্তমান অবস্থায় দেখি না। কথাটা শুনে থমকে গেলেন! এটা মহাবিশ্বের চিরন্তন সত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমরা জানি যে, আমরা তখনই কোনো বস্তু দেখতে পাই যখন এই বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। আমরা এটাও জানি সূর্য থেকে আলো এসে পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় নেয় ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

তাই আমরা পৃথিবী থেকে যখন সূর্য দেখি তখন কিন্তু আমরা এর বর্তমান অবস্থা দেখি না, দেখি ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড পূর্বের অবস্থা, অর্থাৎ অতীত অবস্থা। ধরুন হঠাৎ করে সম্পূর্ণ সূর্য নিভে গেলো, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তা বুঝবো না। আমরা ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড পরই বুঝবো যে সূর্যটি নিভে গেছে। NASA গবেষকরা প্রায় পৃথিবীর মতো দেখতে একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে Kepler-৪৩৮ ই। আশ্চর্যজনকভাবে এই গ্রহটির ভূপৃষ্ঠের সাথে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ৮৮% মিল বিদ্যমান। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জানেন? গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৪৭০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তার মানে, আমরা বর্তমানে গ্রহটির যে অবস্থা দেখছি তা হলো ৪৭০ বছর আগের অবস্থা। আমাদের ছায়াপথের নিকটতম ছায়াপথটি (এন্ড্রোমিডা)'র দূরত্ব ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ। এক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু ছায়াপথটির বর্তমান অবস্থা দেখি না, দেখছি ২৫ লক্ষ বছরের পূর্বের অবস্থা।

এরকমভাবে মহাবিশ্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা অজানা বিস্ময়, রহস্য ও কৌতূহলী ঘটনা। আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে বের করছি বিভিন্ন রহস্য, বিভিন্ন বিস্ময় এবং প্রতিনিয়তই এগুলোর সমাধান করছি। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা সক্ষম হয়েছি কোনো কৃষ্ণগহ্বর এর ছবি তুলতে। গ-৮৭ নামক ছায়াপথে অবস্থিত এই কৃষ্ণগহ্বরটি পৃথিবী থেকে সাড়ে ৫ কোটি আলোকবর্ষ বা ৫০ কোটি মিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর আকার পৃথিবীর ৩০ লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ প্রায় সৌরজগতের আকারের সমান। আমরা যতই মহাবিশ্বের গভীরে যেতে সক্ষম হবো ততই নতুন নতুন বিস্ময়ের হাতছানি পাবো। আশা করি এভাবেই একদিন মানবজাতি সমাধান করতে পারবে, এই অসীম মহাবিশ্বের সকল রহস্য ও বিস্ময়।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা

রাইদ রাফসান
কলেজ নং: ১৭৬৪৭
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: গ (প্রভাতি)

প্রায় সাড়ে ছয় ফিট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা, চোখে পুরুলেন্সের কালো সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা, দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। বর্ণনাটা ড. নীহার রঞ্জন গুপ্তের লেখা। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র কিরীটী রায়কে সেই প্রাচীনকালে এভাবেই উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। গোয়েন্দা বললেই আমাদের মনে এরকম কোনো ছবিই ভেসে উঠে।

মূলত পৃথিবীর সাহিত্যে গোয়েন্দাদের আগমন খুব বেশি দিন নয়। সাহিত্যে প্রথম সার্থক গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছিলেন এডগার অ্যালান পো ১৯৪১ সালে। The marders in rue morgur নামে। আর সেই শতাব্দীর শেষ ভাগেই বাঙালির গোয়েন্দা চর্চা শুরু হয়। অর্থাৎ বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ইংরেজি থেকে কখনোই খুব পেছনে ছিল না।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সূচনা সম্পর্কে বলতে গেলে সবার প্রথমে নাম আসে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের। ১৮৯২ সালে তাঁর লেখা 'দারোগার দপ্তর' এর মাধ্যমেই বাঙালির গোয়েন্দা সাহিত্যে ভ্রমণ শুরু হয়। তারপর ১৮৯২-১৮৯৬ পর্যন্ত মূলত একের পর এক নতুন গোয়েন্দা কাহিনি আসতে থাকে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৬ এ লেখেন 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'। যেখানে বাঁকাউল্লাহ থাকেন পুলিশের দারোগা।

কিন্তু এ সময়কার গোয়েন্দা সাহিত্যে ছিল ঔপনিবেশিক আমলের সুদৃঢ় প্রভাব। পুলিশের কর্মকর্তা হওয়ায় প্রিয়নাথ গিরিশচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্রসহ অনেকেই সে আমলের ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগকে তুলে ধরেছিলেন। যেখানে গোয়েন্দা থাকত ব্রিটিশ পুলিশ আর আসামি থাকত সাধারণ ভারতীয়রা।

১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয় হরিসাধনের 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড' যা কিনা বাংলা সাহিত্যের প্রথম কিশোর থ্রিলার। আর এরপর পরই আগমন ঘটল বাংলা সাহিত্যের প্রথম গোয়েন্দা যুগলের। পাঁচ কড়িদে লিখলেন গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় ও তাঁর সহকারী অরিন্দমকে। যারা ইতিহাসবিদদের চোখে প্রথম সার্থক গোয়েন্দা জুটি। এরপর বাঙালির পরিচয় ঘটল দুই বিদেশি গোয়েন্দার সাথে। দীনেন্দ্র কুমারের রবার্ট ব্লেক এবং মনোরঞ্জনের জাপানি ডিটেকটিভ হুকাকাশি ছিল মূলত বিদেশি সাহিত্যের ধার করে আনা কাহিনি।

১৯৩০ সালে আবির্ভাব ঘটল হেমেন্দ্র কুমার রায় নামক নতুন নক্ষত্রের। বিলিতি বিষয়বস্তুকে খাঁটি দেশজ করে তুলে তিনি লিখলেন গোয়েন্দা জুটি জয়ন্ত ও তার সহকারী মানিক গোয়েন্দা হেমন্ত ও সহকারী রবিনকে।

১৯৩৯ সালে মোড় ঘুরে গেল গোয়েন্দা সাহিত্যের। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ব্যোমকেশকে। সুকুমার সেন তো শরদিন্দু বাবুকে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের সম্ভবত একমাত্র বিবাহিত গোয়েন্দা ছিলেন ব্যোমকেশ। যার ছেলেকে জুনিয়র ব্যোমকেশ নামে নতুন চরিত্র দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দুপত্রী। হরিনারায়ণ আবার ব্যোমকেশের কল্পিত ভাইপো পরিজাত বক্সীকে নিয়েও গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন। এরপর আরও অনেক গোয়েন্দা চরিত্র এসেছে। তাঁদের মধ্যে শশধর দত্তের দস্যু মোহন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোয়েন্দা কবি, পরাশরবর্মা ড. নীহার রঞ্জন গুপ্তের কিরীটী রায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে কর্নেল সিরিজ ছাড়া আর কিছু তেমন আলোচনায় আসতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা লেখক নিঃসন্দেহে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর ত্রয়ী জুটি ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ু নানাভাবে মাতিয়ে রাখত ছেলেবুড়ো সবাইকে।

এরপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন একটু অন্য ধরনের অ্যাডভেঞ্জারাস চরিত্র কাকাবাবু ও সন্তু। যাদের সাথে পাঠক ঘুরে বেড়ালো সারা পৃথিবী। একই সময়ে শীর্ষেন্দু লিখলেন মজাদার গোয়েন্দা চরিত্র বরদাচরণ ও পুলিশ গোয়েন্দা শবরকে নিয়ে।

এত পুরুষ চরিত্রের ভীড়ে এবার খোঁজ করা যাক নারী গোয়েন্দা চরিত্রকে। সরল বালা দেবী, প্রভাবতী দেবী; তাঁরা ছিলেন নারী গোয়েন্দা লেখক। আর প্রদীপ্ত রায়ের গোয়েন্দা জগদ্দলের ব্যাগাপিষি। মনোজ সেনের দময়ন্তী ছিলেন নারী গোয়েন্দা চরিত্র। তবে সফল গোয়েন্দা বলা চলে সুচিত্র ভট্টাচার্যের মিতিন্নাসীকে।

আধুনিক কালের গোয়েন্দা চরিত্র কিছুটা হলেও পিছিয়ে আছে প্রাচীন কাল থেকে। আধুনিক কালের শুরুতে সেবা প্রকাশনী আনল তিন গোয়েন্দা ও মাসুদ রানা। সেকালের কিশোর ও তরুণ সমাজ বুদ হয়েছিলো এই চরিত্রগুলোর নেশায়। এছাড়া তেমন কোনো গোয়েন্দার খোঁজ মিলে না এই সময়ে। তবে হাল আমলের গোয়েন্দা হিসেবে বলা যায় মোহাম্মদ নাজিমুদ্দীনের 'কেফরী বেগ'ও নুরে ছফাকে।

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা দুর্দমনীয়। শত বাঁধা বিপত্তি, প্রতিপক্ষের সব কূটকৌশল ভেস্তে দিয়ে এগিয়ে চলে তারা সগৌরবে। সাথে সাথে বাঙালির গোয়েন্দা সাহিত্যও চলছে এগিয়ে।

ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ডে দুই দিন

মুহাম্মদ শাফাকাত আলম
কলেজ নং: ১১২৮১
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে আমি ও বাবা-মা মিলে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত পর্যটনস্থান ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ড বেড়াতে যাই। ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ডের ভ্রমণটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেখানে গিয়ে আমি অনেক প্রাণিদের সম্বন্ধে জানতে পারি, যার মধ্যে অন্যতম ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, সামুদ্রিক সীল মাছ, পেঙ্গুইন এবং তিমি। ক্যাঙ্গারু একটি শান্ত স্বভাবের প্রাণি, যা দেখতে অন্যদের চেয়ে আলাদা, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ক্যাঙ্গারু কখনো হাঁটে না, এটি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।

আমাদের ট্যুর গাইড আমাদেরকে জানান, ক্যাঙ্গারুর সামনের পা দুটো ছোট কিন্তু পেছনের পা দুটো অপেক্ষাকৃত বড় এবং শক্তিশালী। এটি সাধারণত লম্বায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট এবং ওজনে ২৩ থেকে ৫৫ কেজি হয়ে থাকে। আকৃতি ছাড়াও ক্যাঙ্গারুর শরীরের অন্যতম সুন্দর বৈশিষ্ট্য হলো তার কোল পকেট, মা ক্যাঙ্গারু তাদের ছোট বাবুদের সেই পকেটে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ৩০ মিলিয়নের বেশি ক্যাঙ্গারু রয়েছে বলে জানা যায়। ক্যাঙ্গারু নিঃশব্দে চলাচল করতে পছন্দ করে। সেজন্য তারা রাতে খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়। আমিও আমাদের ট্যুর গাইডের সাথে ক্যাঙ্গারুর গতিবিধি রাতে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ডে সমুদ্র পথে অ্যাডিলেইড হতে ফেরি দিয়ে যেতে হয়। এই আইল্যান্ডের কোন প্রাণী লোকারণ্যে যেতে পারে না।

শান্ত ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ডের সবচেয়ে শান্ত প্রাণিটির নাম হলো কোয়ালা। কোয়ালারা খুবই অলসভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছে শুয়ে বসে থাকে, যা দেখলে মনে হয় গাছে বালিশ পড়ে আছে। এছাড়াও এই আইল্যান্ডে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল পার্ক, রিমার্কেবল রকস, সীল বে কনজারভেশন পার্ক, অ্যাডমিরালস্ আর্ক, প্যাঙ্গুইন কলোনি, মৌমাছির ফার্ম, লিটল সাহারা ইত্যাদি।

সীল বে কনজারভেশন পার্কে অনেক সামুদ্রিক সীল এবং তাদের বাচ্চাদের দেখেছি। সবাইকে খুব নিঃশব্দে সীল বে কনজারভেশন পার্কে অবস্থান করতে হয়, যাতে সামুদ্রিক সীলরা ভয় না পায়। সমুদ্রের পাশেই রিমার্কেবল রকস অবস্থিত যা অনেক বছর ধরে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বিশাল পাথরখণ্ড। মৌমাছির ফার্মে বিভিন্ন রকমের মধু পাওয়া যায়। মধু হতে তৈরি চকলেট এবং আইসক্রিম খেতে খুবই সুস্বাদু। খাবার ছাড়াও মধু হতে সাবান, লিপবাম, ক্রিম, সস, মোম, ওষুধ প্রস্তুত করা হয় এবং বিক্রি করা হয় ফার্মে। আর লিটল সাহারা হচ্ছে একটি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত বালির পাহাড়। ভীষণ সবুজ আর অসম্ভব নিরিবিলি এই আইল্যান্ড ভ্রমণ আমার স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভুটানে সাড়ে চারদিন

আহনাফ তাহমিদ
কলেজ নং: ১১৩৪৫
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: খ (দিবা)

দিনটি ছিল সোমবার। আমরা পরিবারের ১২জন ছিলাম। আমার ফুপাতো ভাই-বোন সবাই মিলে ভুটানের জন্য সকাল ৫:৩০ এ বাসা থেকে বের হলাম। পৌঁছালাম এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে ৮:৩০ এ চেকআউট করার পর ড্রুকএয়ার নামক একটি প্লেনে আমরা উঠলাম। ৯:৩০ এ প্লেনটি ছাড়ল। যেতে প্রায় ১ ঘণ্টা লেগে গিয়েছিল। এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে হতে ১০:৩০ বেজে গেল। তখন অক্টোবর মাস, তাই হালকা হালকা ঠাণ্ডা বাতাস ছিল।

নভেম্বরের দিকে সেখানে ঠাণ্ডায় বরফও পড়ে। আমরা একটি ট্রাভেল বাস ভাড়া করে নিলাম। ভুটানে আমরা ৩টি বিভাগ ঘুরেছি, থিম্পু, পারো ও পুনাখা। পারোতেই এয়ারপোর্ট, পারো ঘুরে ঐদিনই আমরা চলে গেলাম থিম্পুতে। থিম্পুতে রাজা থাকেন। রাজার বাড়িটি দেখতে সুন্দর। পারো থেকে থিম্পুতে যেতে একটি নদী পড়ে। সেই নদীটির পানি প্রচুর ঠাণ্ডা, পুরাই যেন বরফ। আসলে এটি পাহাড়ের বরফ গলা পানি। থিম্পুতে পৌঁছতে পৌঁছাতে চোখে পড়ল কয়েকটা ঝরনা। গাছে গাছে আপেল ও কমলা লেবু।

থিম্পুই হলো ভুটানের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং সেখানে সকল প্রকার ব্রান্ডের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। থিম্পুতে আমরা ছিলাম দুই দিন। সেখানে বিভিন্ন মন্দির ঘুরেছি। দুই দিন বিভিন্ন স্থান ঘোরার পর গেলাম বৌদ্ধ মন্দিরে। একটি পাহাড়ের উপর সবচেয়ে বড় বুদ্ধা স্থাপিত। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন সেখানে পূজা চলছে। আমরা এরপর গিয়েছিলাম দোচালা পাস নামক একটি জায়গায়। সেখানে একটি জায়গা আছে যা একটু উঁচু।

সেখানে দাঁড়ালে মেঘ ছোঁয়া যায় এবং হাত ও পা ভিজে যায়। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হিমালয় পর্বতটিও দেখা যায়। আমরা কিছুক্ষণ বসে কফি ও নাস্তা খেয়ে রওনা দিলাম পুনাখার উদ্দেশে। সেখানকার দৃশ্যগুলো খুবই সুন্দর। সেখানে একদিকে

পাহাড় ও আরেকদিকে খরস্রোতা নদী। পুনাখাতে ছিলাম আমরা মাত্র একদিন। এরপরের দিন সকাল ৯:৩০ এর দিকে গেলাম পারোতে। এক রাজার পর যখন তার ছেলেকে মুকুট পরানো হয় তখন এখানেই মুকুট পরিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ভুটানের সকল মানুষ প্রায় একই ধরনের কাপড় পরিধান করে। ছেলেরা পরে বড় এক ধরনের জামা এবং ফিতা দিয়ে তা বাধা থাকে এবং পায়ে হাঁটু পর্যন্ত মোজা ও জুতা পরে। পারোতে মূলত হ্যান্ডিক্রাফট বা ভুটানিদের ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুন্দর সুন্দর মূর্তিও এখানে পাওয়া যায়। ভুটানের পতাকার রং কমলা ও তার ভিতর একটি ড্রাগনের ছবি। পারোতে পাহাড়ের উপর 'টাইগার নেস্ট' নামে একটি মন্দির মতো আছে। এটি অনেক উপরে। হাতে সময় কম ছিল বলে আমরা সেখানে যেতে পারিনি। শুক্রবার সকাল ৫:০০ টায় হোটেল থেকে রওনা হলাম এয়ারপোর্টে। চেকআউট করে প্লেন রওনা দিল ৭:০০ টায়, বাংলাদেশে এসে পৌঁছালাম ৯:০০ টায়। বাসায় ফিরতে ফিরতে আমাদের ১১:০০ টা বেজে গিয়েছিল। অসাধারণভাবে কেটে গিয়েছিল ভুটানে থোরার সাড়ে চার দিন।

***(মন্দিরের গায়ে পাথর কেটে কেটে নানা শাস্ত্রীয় কথা লেখা ছিল, বৌদ্ধরা সেগুলো পড়ছে। ও খানে বুদ্ধের যে মূর্তি আছে সেটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি)

সাজেক ভ্রমণ

কে এম ইশমাম হোসেন
কলেজ নং: ১৩৫০৯
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ঘ (দিবা)

২ জুন, ২০১৯, আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন আমি ও আমার পরিবার বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত উপত্যকা সাজেক ভ্যালির উদ্দেশে রওনা হলাম, ২ জুন সকাল ৮:৩০ টার সময় আমরা সেন্টমার্টিন হুন্ডাই এ করে সাজকের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, আমরা বাসে করে অত্যন্ত আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। খাগড়াছড়ি বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রথমে খাগড়াছড়ি ঢোকার পথে বড় করে লেখা 'স্বাগতম, খাগড়াছড়ি জেলা'। আমরা বাস টার্মিনালে গিয়ে নেমে যাই। তখন সময় দুপুর ২.৩০। সেখান থেকে আমরা গণপূর্ত বিভাগের রেস্টহাউজে গিয়ে উঠলাম। আমরা রেস্টহাউজে খাওয়া-দাওয়া শেষে বাংলাদেশের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখলাম, রাতের দিকে সাজেক যাওয়ার জন্য 'চান্দের গাড়ি' ঠিক করলাম। পরের দিন আমরা আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র, রিসাং ঝরনা ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলাম। আমি ও আমার ভাই মশাল হাতে নিয়ে আলুটিলা গুহার ভিতর ঢুকলাম। গুহার ভেতর পানি ও পাথর মিলে কেমন যেন একটি ভূতুড়ে পরিবেশ। আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে আমরা রিলিং ঝরনার ধারে এলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ঝরনার কাছাকাছি পৌঁছালাম। পাহাড়ি ঝরনার পানি আমাদের মুগ্ধ করেছিল। পরের দিন সকাল ৯.০০ টায় চান্দের গাড়ি করে সাজেকের উদ্দেশে রওনা হলাম। সকাল ১১:০০ টায় সাজেকে যাওয়ার পথে আর্মিরা ১৬টা গাড়িসহ আমাদেরকে টহল দিয়ে নিয়ে যান। এরপর আমরা সেনাবাহিনী পরিচালিত অত্যাধুনিক রিসোর্ট 'রুনময়ে' গেলাম। খুব সুন্দর একটি রুমে উঠলাম যার নাম ছিল 'সূর্যাস্ত'। 'রুনময়ের' ভেতরের সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল এবং সেদিন বৃষ্টির ফলে মেঘের খেলা প্রকৃতির সাথে মিশে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। বৃষ্টি হওয়ার পর মেঘগুলো ভেসে ভেসে আমাদের রুমে ঢুকছিল। বৃষ্টিতে গোসল করতে করতে ভেসে আসা মেঘগুলো হাতে মুখে ছোঁয়া দিচ্ছিল। দূরের পাহাড়গুলো মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর মেঘ সরে গিয়ে পাহাড়গুলো দৃশ্যমান হয়েছিল। পাহাড়গুলোর মাঝে রয়েছে ছোট ছোট বাড়ি। বিকেলের দিকে আমরা হেলিপ্যাডে ঘুরতে গেলাম এবং পাহাড়ের নিচের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। পরেরদিন ভোরে আমি ও আব্বু সূর্যোদয় দেখতে যাই। সূর্যোদয় দেখা ছিল আমার জীবনে দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য। ৫ জুনে ছিল পবিত্র ঈদ-উল ফিতর, আব্বু ও ভাইয়ার সাথে ঈদের নামাজ পড়ি। সকালে নাস্তা করেই কংলাক পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দেই। সাজেকের শেষ সীমানায় প্রায় ২০০০ ফিট উপরে উঠে সম্পূর্ণ সাজেক শহর দেখতে পাই। অনেক আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছি। এরপর বিকেল বেলায় খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং পরদিন ঢাকায় ফেরত আসি। এত অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়-

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।"

নাটক

আমাদের নিয়ে কি নাটক হবে?

তামিম মিয়া
কলেজ নং: ১৭৪৮৯
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ক (প্রভাতি)

দৃশ্য-১

[পূর্ণিমার রাতে বাগানের মধ্যে পুকুরের পাশে বসে ডিরেক্টর মিরাজ সাহেব ও তার দুই সহকর্মী মতিন এবং কাওসার-এর কথোপকথন চলছে।]

মতিন : স্যার, আমার ছুটি লাগবে। (ক্রোধান্বিত হয়ে মিরাজ সাহেব তাকায়)

মিরাজ : ছুটি? কীসের ছুটি? এতবড় একটি প্রজেক্ট পেলাম আর তুমি ছুটি ছুটি করছো? খালি ঐ এক বউয়ের দোহাই দিয়ে সালাম.....

মতিন : বাসায় বউটা থাকে স্যার। বোঝেনইতো, নতুন বিয়া। মা টাও নাই স্যার। [হঠাৎ মতিনের চোখে পানি]

মিরাজ : হয়েছে!! থাক আর কাঁদতে হবে না। কাল তোমার ছুটি। [কাওসার মতিনকে হালকা খোঁচা দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল]

কাওসার : (মতিনের দিকে তাকিয়ে) কান্নাকাটি তো অনেক হলো স্যার, এবার কাজের কথায় আসা যাক।

মিরাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো, কী নিয়ে এবারের নাটকটি বানানো যায়?

কাওসার : ভূত নিয়ে কী নাটক বানানো যায়, স্যার?

মিরাজ : ভূত নিয়ে নাটক? নাহ, আধুনিক মননশীল ও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে ভূতের নাটক কৌতুক বাদে আর কিছুই না।

মতিন : তাহলে স্যার নারী নির্যাতন নিয়ে কিছু একটা হোক।

কাওসার : (বিস্মিত চোখ নিয়ে মিরাজের দিকে তাকিয়ে) কী! নারী নির্যাতন নিয়ে নাটক! নাহ নাহ নাহ এ হতে পারে না স্যার!

মিরাজ : কেন? নারী নির্যাতন নিয়ে নাটকে সমস্যা কী?

কাওসার : (আমতা আমতা করে....) না স্যার। আসলে এইসব নাটকের তো আর তেমন দর্শক নেই স্যার। এজন্যই বলছিলাম আরকি।

মিরাজ : ও আচ্ছা। তাহলে কী করা যায়? [মঞ্চের সকল বাতি বন্ধ। হঠাৎ হাসতে হাসতে দুটি প্রেতাত্মার প্রবেশ। একজন বয়স্ক মহিলা মুখ ধবধবে ফরসা। হালকা মোটা। অপরজন কিশোরী। বয়স ১২-১৩ বছর। তাদের হঠাৎ বাগানে আগমনে মিরাজ আচমকা ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। মতিনের সজোরে চিৎকার এবং কাওসারের ভয়ে লাফ দিয়ে সরে গিয়ে মিরাজের থেকে একটু দূরে মাটিতে বসে পড়ল]

দৃশ্য-২

[বৃদ্ধা প্রেতাত্মা রাহেলা ও কিশোরী কাকলীর সাথে কথোপকথন]

কাওসার : (ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে) খোদা তুমি মোদের বাঁচাও! [মতিনের চোখে চরম ভয়। কিছু বলতেই পারছে না]

মিরাজ : (খানিকটা ভয় কাটিয়ে) আমার তো নিজের চোখকে বিশ্বাসই হচ্ছে না। এটা কী দেখছি আমি!

রাহেলা : (নাকের ভেতর সুর দিয়ে) যা দেখছিস ঠিকই দেখছিস। [আবার খিলখিল হাসি]

মিরাজ : (নির্ভয়ে হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে) কী চান আপনারা আমার কাছে? [হাসি বন্ধ হয়ে গেল]

রাহেলা : আমার জীবন নিয়ে একটা নাটক বানাবি? (আত্মকথায় চোখে পানি) আমার জীবনটা না খুবই কষ্টের রে বাজান... [মিরাজ কিছু না বুঝে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

রাহেলা : (কাঁদো কাঁদো সুরে) আমার এঠা ছাওয়াল আছিল। খুব যতনে তারে মানুষ করছিলাম। ছোটবেলা থাইকাই তারে তিল তিল কইরা বড় বানাইছিলাম। সব দাবি-আবদার পূরণ করতাম। গুড়ের পায়েস আমার ছাওয়াল খুব পছন্দ করতো। ওর লাইগা প্রতি সপ্তাহেই গুড়ের পায়েস পাক করতাম। মানুষটা মইরা যাওয়ার পর ছাওয়ালটাই সম্বল আছিল। এই ছাওয়ালই মোরে...(ফুপিয়ে কান্না শুরু করলো) [মিরাজ হঠাৎ যেন হারিয়ে যায় বুড়ির গল্পে। প্রত্যেক্ষদর্শীর মত নিজেকে অনুভব করে সে।]

রাহেলা : (কান্না থামিয়ে) ছাওয়ালটাই মোর কাছে সব আছিল। কিন্তু নিকাডা কইরাই বউ পাইয়া মোরে ফালাইয়া দিল। (আবার হাউমাউ করে কান্না শুরু)

মিরাজ : (কিছুটা ভ্রম কাটিয়ে) এরপর?

রাহেলা : আর কীই বা কমু গো বাজান?

মিরাজ : সবই বুঝলাম কিন্তু বুড়ি তোমার এ অবস্থা হলো কী করে?

রাহেলা : (কাঁদতে কাঁদতে) সে কাহিনি খুবই ভয়ঙ্কর ও কষ্টের। [কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে]

[এবার বুড়ি ক্রমাগত কাঁদতে থাকবে তার শেষ পরিণতির কাহিনি মনে করে। তার কান্না চলতে থাকবে। এদিকে মঞ্চে বুড়ির থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরী প্রেতাত্মা কাকলী এখন হেঁটে হেঁটে বৃদ্ধা রাহেলার পাশে এসে দাঁড়াবে। কাঁধে হাত রাখবে। মিরাজ অবাক চোখে পর্যবেক্ষণ করবে। কাওসার ও মতিন দুজন ভয়ের মধ্যে প্রেতাত্মাদ্বয়ের চেহারাগুলো একবার পরখ করে দেখবে। মুহূর্তেই তারা চমকে উঠবে ও আর্তনাদ শুরু করবে]

মতিন : এ... এ... এ আমি কী দেখছি?

কাওসার : এ... একী... একী করে সম্ভব?

[দুজনেরই পালানোর চেষ্টা। অশরীরী কোন এক শক্তির টানে তাদের পালানো বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।] [বাঁধা পাওয়ার পর তাদের হাত-পা অনড় হবে।

এদিকে রাহেলা ও কাকলি তা দেখে উচ্চস্বরে হাসতে থাকবে]

কাকলী : কীরে এখন পালাস কেনো? আমারে নিষ্ঠুর পশুর মতো মারার সময় মনে ছিল না? (আবার কিছুক্ষণ হাসি)

মিরাজ : হত্যা? কে তোমাকে হত্যা করেছে?

কাকলী : (দুঃখের হাসি হেসে) কে আর করবে স্যার! ঐ যে, ঐ যে ঐখানে আপনার পাশে এক নরপিশাচ আছে নাহ; স্যার, ওই আমারে নিষ্ঠুরভাবে পশুর মতো হত্যা করেছে, স্যার।

মিরাজ : কাওসার! (বিস্ময়ের সাথে কাওসারকে প্রশ্ন) তুমি? তুমিই হত্যা করেছ?

[কাওসার কাঁদতেই থাকবে। ভয়ের কান্নায় সে কথাই বলতে পারবে না]

কাকলী : হ। হ স্যার, ওই আমাকে মারছে। আমি ওর বাসায় কাজ করতাম। দুবেলা যা দিতো তাই খাইতাম। একদিন আপা আইতে দেরি করছিল; (কাঁদতে কাঁদতে) তখন ওই আমাকে জোর করে পশুর মতো অত্যাচার করেছে স্যার। (এবার জোরে জোরে কান্না ও আহাজারী)

করবে ও বার বার একই কথা বলতে থাকবে)

আমারে অত্যাচার করছে স্যার।

রাহেলা : তুই কান্দিস না মা। থাক, তুই কান্দিস না।

মিরাজ : তারপর-

কাকলী : [কান্না থামিয়ে ফুঁপিয়ে বলবে]

তারপর ওই আবার আমাকে হত্যা করছে। হত্যা কইরাও আবার হাত-পা টুকরা করছে। শুধু হাত-পা না আমার পুরাডা শরীর টুকরা টুকরা করছে। কইরা বস্তাতে ভরছে। নদীতে ফালাইয়া দিছে। আর আপার কাছে কইছে আমি নাকি টাকা পয়সা নিয়া ভাইগা গেসি।

[কান্না শুরু করবে কাকলী]

[কাওসারের মুখ বুজে কান্না চলতে থাকে এবং এবার মতিনের পুনরায় পালানোর চেষ্টা। তবুও রাহেলার 'বাবা' ডাকে ব্যর্থ হয় মতিন]

রাহেলা : কই যাস বাবা?

মিরাজ : মতিন তোমার ছেলে?

রাহেলা : হ, বাজান। মতিন আমারই পোলা। শেষ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে যাইতে না চাওয়ার কারণেই আমার পোলা আর ওর নিকা করা বউ মিল্লা আমারে হত্যা করছে। কেউ জানলোও না। কাউরে জানতেও দিলো না।

মিরাজ : কাওসার!!! মতিন!!! তাহলে তোমরা খুনী? এত বড় মিথ্যাটা এত সহজেই চাপা দিয়ে দিয়েছো।

কাকলী : দেখছেন স্যার। এইরকম প্রতিদিনই ঘটনা ঘটে। কেউ জানতেও পারে না। কেউ আমাদের আত্মচিৎকার শুনলো না। আমাদেরকে কি নিয়া একটা নাটক বানানো যায় না, স্যার?

[মঞ্চের বাতি আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়া শুরু করবে। 'মাফ নাই' 'মাফ নাই'... এই কথা বলতে বলতে মঞ্চ থেকে প্রেতাত্মাদের প্রস্থান হবে। লাইট অন হলে মতিন ও কাওসার ডিরেক্টরের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করতে থাকবে]

কাওসার : স্যার, আমাগোরে মাফ কইরা দেন। আমাগো ভুল হইয়া গেছে।

মিরাজ : তোমাদের মতো জানোয়ারদের কোনো মাফ নেই। আমি আজই আইনের হাতে তোমাদের তুলে দিব। আর একটি কথা। আগামীর নাটক হবে এই নিয়েই...।

কৌতুক-ধাঁধা-জানা-অজানা

সাফওয়ান হাকিম
কলেজ নং: ১১২৩৪
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

১। কোন লেজ নড়ে না?
উত্তর: কলেজ।

২। কোন বাচ্চা কাঁদে না?
উত্তর: চৌবাচ্চা।

৩। পাতা আছে গাছ নেই, শব্দ আছে কথা নাই।
উত্তর: বই।

৪। পাখা ছাড়া আকাশে চলি, চোখ ছাড়া কাঁদি।
উত্তর: মেঘ।

৫। তিন অক্ষরের নাম তার থাকে সবার বাসায়।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে তা মোদের কামড়ায়।
উত্তর: মশারি।

মেজবাহ উল আলম তাসিন
কলেজ নং: ১১২৭৩
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (দিবা)

১। চলতে চলতে হয় বন্ধ চলা
চলবে আবার কাটবে গলা।
উত্তর: পেন্সিল।

২। কোন জিনিস আমরা দেখতে পারি কিন্তু ধরতে পারি না।
উত্তর: আকাশ।

৩। কোন জিনিস বাবা বললে মিলবে, দাদা বললে মিলবে না।
উত্তর: ঠোঁট।

৪। একখান লম্বা দুই খান গোল, চুল খান ধইরা টাইনা তোল
উত্তর: দাড়িপাল্লা।

৫। শিকড় ছাড়া গাছটি ফল ধরে ১২টি, পাকলে হয় ১টি, জিনিসটি কী?
উত্তর: ১ বছর।

মোবিন ইসলাম
কলেজ নং: ১৬১৪০
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

১। এমন একটি জিনিস যা উপরেও থাকে এবং নিচেও থাকে, জিনিসটা কী?
উত্তর: রাস্তা।

২। তিন অক্ষরের নাম তার সারা পৃথিবীতে থাকে, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে, শীতকালে সে ফুল ফোটে।
উত্তর: আকাশ।

৩। অংকের ম্যাজিক:

ধাঁধা		সমাধান
২×২=	৪	২×২=৪
৩×৩=	১০	৩×৩=(৩+৩)+৪=১০
৪×৪=	১৮	৪×৪=(৪+৪)+১০=১৮
৫×৫=	২৮	৫×৫=(৫+৫)+১৮=২৮
৬×৬=	৪০	৬×৬=(৬+৬)+২৮=৪০
৭×৭=	৫৪	৭×৭=(৭+৭)+৪০=৫৪
৮×৮=	?	৮×৮=(৮+৮)+৫৪=৭০

তানজিল ইসলাম
কলেজ নং: ১৬০৭৮
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

১। তিন অক্ষরের নাম তার, বাংলাদেশে নাই। মাঝের অক্ষর বাদ দিলে, আমরা সবাই খাই।
উত্তর: ভারত।

২। কোন জিনিস কাটলে বড় হয়?
উত্তর: পুকুর।

৩। ১৫টি ডিমের মধ্যে ৫টি ভেঙে গেছে, ৫টি ভেজেছে ও ৫টি খেয়েছে। তাহলে বাকি থাকে কয়টি?
উত্তর: ১০টি। (কারণ যে ৫টি ভেঙেছে সে ৫টিই ভেজেছে এবং সেই ৫টিই খেয়েছে)

রাকিন আবসার জারিফ
কলেজ নং: ১০৩৭৪
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

১। অন্ধকারে আলো দেয়, অনল তাপে গলে যায়, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, বলতো কী?
উত্তর: মোমবাতি।

২। আকাশেতে উড়ি আমি পাখি আকারে আস্ত জীব ধরে খাই আমি দৈত্যরূপে।
উত্তর: বক

৩। ইংরেজিতে বাদ্য, বাংলায় খাদ্য কিংবা সেই ফল, চট করে বল।
উত্তর: বেল।

৪। ইড়িং বিড়িং চিড়িং ভাই,
চোখ দুটি তার মাথা নাই,
আছে দুটি তার বাকা হাত
পানিতে বসে খায় ভাত।
উত্তর: কাঁকড়া।

৫। ইট ঘুঘুর পিট টান।
কোন ঘুঘুর চার কান?
উত্তর: ঘরের চাল।

৬। উঠিতে ঝটপট বসিতে পাহাড়,
লক্ষ লক্ষ জীব ধরে, করে না আহার।
উত্তর: ফেওয়া জাল।

৭। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম
দালান বাড়ি কোঠা।
ভাত মালিকে বলে গেলো,
ফলের আগায় পাতা।
উত্তর: আনারস।

মোহাম্মদ তওসিফ আহনাফ
কলেজ নং: ১০৩০৬
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: খ (দিবা)

১। পেট কেটে দিলে পড়ে সব লোকে খায়, না কাটলে সব প্রজার রাজাকে দিতে হয়।
উত্তর: খাজনা।

২। সকালে জন্মলাভ বিকালে মরণ, তার অভাবে সর্বজীবের বিফল জীবন।
উত্তর: সূর্য।

৪। মুখ থেকে বের হয় রক্ত কালো কালো-শিক্ষিত জনের কাছে সে বড় ভালো।
উত্তর: কলম।

৬। কোন ব্যাংকে টাকা রাখা যায় না?
উত্তর: Bloodbank

৭। বিধবা না হয়েও পরে সাদা শাড়ি, নায় না খায় না তবু সে সুন্দরী।
উত্তর: রসুন।

জানা অজানা
সাদাত রহমান
কলেজ নং: ১৬১৩৭
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

১। একটি 'রাই' গাছের শিকড় মাটির নিচে ৪০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে।
২। একটি কুকুরের গন্ধ শোকার ক্ষমতা মানুষের চাইতে ১০০০ গুণ বেশি।
৩। মাথা ছাড়াও তেলাপোকা ৯ দিন বাঁচতে পারে।
৪। জন্মের পর জিরাফের বাচ্চা প্রায় ৬ ফুট উঁচু হতে মাটিতে পড়ে কোন প্রকার আঘাত ছাড়াই।
৫। প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে একশ বার বজ্রপাত হয়ে থাকে।
৬। উটের চোখের তিনটি পাতা থাকে।
৭। একটি পেন্সিল দিয়ে গড়ে ৩৫ মাইল লম্বা দাগ টানা যায়।

তাওহীদ যুবায়ের
কলেজ নং: ১৬০৯৭
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

১। কাঁধে যায় সঙ্গে মার খায় রঙ্গে।
উত্তর: ঢোল।
২। দেহ আছে কিন্তু প্রাণ নাই, সে এক রাজা, সৈন্য সব আছে সেই তার প্রজা।
উত্তর: দাবার গুটি।
৩। মাথায় মুকুট, গোলাপ, পেটের মধ্যে হাত পা।
উত্তর: শামুক।
৪। বারোটি ডাল, ত্রিশটি পাতা এক পৃষ্ঠা কালো, এক পৃষ্ঠা সাদা।
উত্তর: ক্যালেন্ডার।
৫। এক গাছে তিন তরবারি, আজব কথায় বলিহারি।
উত্তর: কলাগাছ।
৬। মুখ দিয়ে বমি করে রক্ত কালো কালো। সবার হাতে ঐ জিনিসটি, লাগে খুব ভালো।
উত্তর: কলম।

খান সালমান সাদিব
কলেজ নং: ১৬১৩১
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

এক দোকানদার ও ক্রেতার ঘটনা-

ক্রেতা : ভাই ১ কেজি চাল দেন।
(বিক্রেতা চাল দিল)
ক্রেতা : ভাই আপনি আমাকে কম চাল দিলেন কেন?
বিক্রেতা : আপনার অবস্থা দেখেই একটু কম দিলাম। যাতে আপনার নিতে সুবিধা হয়।
(ক্রেতা টাকা দিল)
বিক্রেতা : ভাই আপনি আমাকে কম টাকা দিলেন কেন?
ক্রেতা : যাতে আপনার গুনতে সুবিধা হয়।

ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বিতীয় ঘটনা -

ক্রেতা : ভাই আপনার দোকানের নাম কী?
বিক্রেতা : কী দরকার?
ক্রেতা : ভাই আপনার দোকানের নামটা বলেন।
বিক্রেতা : কী দরকার?
ক্রেতা : আপনার দোকানের কী নাম নেই?
বিক্রেতা : আরে ভাই আমার দোকানের নামই তো কী দরকার।

তাইফ রহমান
কলেজ নং: ১০২৪৮
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (দিবা)

১। এক মহিলা রিক্সা দিয়ে যেতে নানা প্রশ্ন করতে লাগল-

মহিলা : তোমার নাম কী ভাই? (ভাবল পড়াশুনা জানা আপামনিকে নামটা ইংরেজিতে বলি)
রিক্সাওয়ালা : আমার নাম "বাটার রেড গর্ভনমেন্ট"।
মহিলা : (অবাক কণ্ঠে) তার মানে?
রিক্সাওয়ালা : মানে "মাখন লাল সরকার।"
মহিলা : তোমার বাবার নাম কী?
রিক্সাওয়ালা : 'স্টার লেগ গর্ভনমেন্ট'।
মহিলা : তার মানে?
রিক্সাওয়ালা : আপনি কি পড়াশুনা জানেন না? তার মানে "তারা পদ সরকার"।

২।
স্ত্রী : তোমার মতো লোকের সংসার আমি করব না। আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।
স্বামী : তোমায় ধরে রেখেছে কে? এক্ষুণি চলে যাও।
স্ত্রী : হ্যাঁ, তাই চললাম। (হঠাৎ করে বলে উঠল) আরে আমি তো ভুলেই গেছি তুমি না আমার বাপের বাড়িতে থাক।

৩।
তাবিন : বলতো পল্টু বেনানা মানে কী ?
পল্টু : যার নানা নেই তাকে বেনানা বলে।

৪।
বাবা : বল্টু দেখতো কটা বাজে।
বল্টু : আমি কাটাওয়ালা ঘড়ি বুঝি না।
বাবা : ঠিক আছে ঘড়ির দুটো কাটা কোথায় আছে?
বল্টু : ঘড়ির ভিতরে বাবা।

মোবিন ইসলাম
কলেজ নং: ১১৩১৮
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

১। মাছ বিক্রেতা ও ইংরেজ সাহেবের মধ্যে কথোপকথন-

বিক্রেতা : আরে ইলিশ মাছ নিবেন, ইলিশ মাছ?
ইংরেজ সাহেব : I See
বিক্রেতা : আরে ভাই সাহেব, আইছেন যখন, বসেন।
সাহেব : How Much?
বিক্রেতা : আরে সাহেব, এটা তো হাউ মাছ না, এটা তো ইলিশ মাছ।
সাহেব : Ok!
বিক্রেতা : আরে সাহেব, আপনি ওকে চিনবেন না। ও আমার খালাতো ভাই।

২। ডাক্তার সাহেব ও বেবির মধ্যে কথোপকথন-

বেবি : ডাক্তার সাহেব আমাকে সাহায্য করেন।
ডাক্তার : কি সমস্যা আপনার?
বেবি : আপনি ঐ লাল গরুটা দেখতে পাচ্ছেন?
ডাক্তার : হ্যাঁ, আমি তা দেখতে পাচ্ছি।
বেবি : আমি ঐ লাল গরুটা দেখতে পাচ্ছি না।

হাসনাত হাসমিন ইহসান
কলেজ নং: ১৫২৬৫
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: খ (প্রভাতি)

গুড্ডুবুড়া

গুড্ডু : বাবা, ল্যাপটপের বাংলা কী?
বাবা : ল্যাপ মানে কোল, টপ মানে উপরে। অর্থাৎ কোলের উপরে যা থাকে। (কিছুক্ষণ পরে...)
মা : গুড্ডু, তোমার ছোট ফুপুর ছেলে হয়েছে।
গুড্ডু : আমি একটা ভাই পেলাম!
দাদি : গুড্ডু, এ হলো তোমার ছোট ফুপুর ছেলে।
গুড্ডু : বাবা, ওতো কোলের ওপর থাকে। তাহলে ও নিশ্চয়ই ল্যাপটপ।

আহনাফ নাশিদ
কলেজ নং: ১৫২৬৭
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ক (প্রভাতি)

১। এক ভদ্রলোক রেস্তোরার বিল মিটিয়ে দিয়ে ওয়েটারকে দুই টাকা বকশিশ দিলেন। ওয়েটার দুই টাকার নোটটি ফেরত দিয়ে বললো, স্যার এখানে দুই টাকা দেওয়া মানে অপমান। অন্তত চার টাকা দিন।
ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, দুঃখিত, আমি আপনাকে দুই বার অপমান করতে পারব না।

২। চার বন্ধু গাছের নিচে নদীর পাশে বসে আছে।
প্রথম বন্ধু : চল আমরা মিলে একটা কবিতা লিখি।
দ্বিতীয় বন্ধু : ঠিক আছে, লেখ-মেঘ উড়ু উড়ু
তৃতীয় বন্ধু : লেখ-নদী সরু সরু।
চতুর্থ বন্ধু : আরে দাঁড়া, তোরাই তো সব বলে দিলি আচ্ছা লেখ- নদীর পাশে বসে আছি আমরা চার গরু।

হাসান মাশহুর তাবীব
কলেজ নং: ১৫২৪২
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: গ (প্রভাতি)

১। দুই জমজ ভাইয়ের চেহারায় এতো মিল যে তাদের মা-বাবারও চিনতে অসুবিধা হয়। একদিন বাবা বাসায় ফিরে দেখে তাদের দুজনার মধ্যে একজন হাসছে আর একজন কাঁদছে। বাবা জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে? তখন হাস্যোজ্জ্বল ছেলে বলে-মা ওকে ভুল করে দুইবার খাইয়ে দিয়েছে। আর ওকে দুবার গোসল করিয়ে দিয়েছে।

২। তিন ভিখারি বন্ধুর একজন অন্ধ, একজনের পা নেই, আর একজন কানে শুনে না।
একদিন রাতে অন্ধ লোকটা বলে আকাশে তাকিয়ে দেখ কী সুন্দর তারা। কানে না শুনা লোকটা বলে কই কোনো তো শব্দ নাই। পা ছাড়া লোকটা বলে, ওরা কী বলে আকাশে তো অনেক মেঘ তাহলে এগুলো কোথা থেকে আসল। লাথি মেরে দুইটাকে উঠিয়ে দেব।

জানা-অজানা

সিসান আহমেদ
কলেজ নং: ১৫৩১৪
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: গ (প্রভাতি)

১। পাথর থেকে মানুষের হাড় ৪ গুণ শক্তিশালী।

২। মানুষের দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশি হলো-জিহ্বা।

৩। প্রতিটি মানুষ তার জীবনের ৩৩% সময় ঘুমিয়ে কাটায়।

৪। আমাজন জঙ্গলকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়।

৫। পৃথিবীর ২০% অক্সিজেন আমাজন থেকে আসে।

৬। মানুষের মস্তিষ্কে মগজের পরিমাণ গাধার মগজের তুলনায় ২৭গুণ বেশি।

৭। VOL VOX নামক উদ্ভিদ চলাচল করতে পারে।

৮। জিরাফ মাত্র ১৯ মিনিট ঘুমায়।

৯। ১টি নীল তিমির ওজন ১৮-২০টি হাতির সমান।

খন্দকার রিদওয়ানিল্লাহ নাহিয়ান
কলেজ নং: ১১৩১৮
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: খ (দিবা)

১। মধ্য রাতে করিম রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছিল...
গার্ড : এত রাতে রাস্তায় কী করছেন?
করিম : আমার ঘুম হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে এসেছি।

২। দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে-
১ম বন্ধু : দোস্ত জানিস আজ আমি Discover চ্যানেলে একটা ২২ ইঞ্চি লম্বা সাপ দেখেছি। তুই দেখেছিস?
২য় বন্ধু : ইস একটুর জন্য দেখতে পাইনি।
১ম বন্ধু : কেন?
২য় বন্ধু : কারণ আমাদের টিভি ২১ ইঞ্চি!

সিফায়েত রহমান
কলেজ নং: ৮৬৩২
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: গ (দিবা)

১। আসিফ একদিন বিছানায় শুয়ে গেম খেলছে। তখন তার মা আসল -
মা : কী রে আসিফ, তোর না পরীক্ষা? সামনেই কিন্তু পরীক্ষা আসছে।
আসিফ : মা, পরীক্ষা এলে পরীক্ষাকে বলে দিও আমি বাসায় নেই।

২। একটা বানর চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষকে বলল -
বানর : আপনি আমার বাম পাশের খাঁচার ময়ূরকে সরান।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ : কেন?
বানর : ময়ূর আমাকে সারাদিন কৌতুক বলে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ : এতো ভালো ব্যাপার।
বানর : ভালো ব্যাপার কিন্তু ময়ূরের দিনের কৌতুক শুনে আমার ডান পাশের গণ্ডার রাতে হাসতে শুরু করে। আমি ঘুমাতে পারি না।

ইসফার রহমান ধ্রুব
কলেজ নং: ১১৩১২
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: গ (দিবা)

১। বাবা-মা বাড়িতে নেই -
স্যার : এই যে রনি, কদিন ধরে স্কুল যাচ্ছ না কেন? কী ব্যাপার?
রনি : বাবা-মা বাড়িতে নেই।
স্যার : কোথায় গেছেন?
রনি : বাবা জেলে, আর মা হাসপাতালে!
স্যার : দুঃখের কথা।
রনি : না স্যার! ভুল বুঝবেন না, আসলে বাবা পুলিশ আর মা ডাক্তার।

২। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন-
শিক্ষক : পৃথিবীর সবচেয়ে চালাক প্রাণী কে?
ছাত্র : গরু।
শিক্ষক : কীভাবে?
ছাত্র : অতি চালাকের গলায় দড়ি।

৩। এক লোক দরজা কাঁধে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে-
১ম লোক : ও ভাই, দরজা নিয়ে কই যান?
২য় লোক : দরজার তালা ঠিক করতে হবে।
১ম লোক : যদি বাড়িতে চোর ঢুকে?
২য় লোক : ঢুকবে কী করে দরজা তো আমার কাছে?

৪। দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন-
১ম বন্ধু : বলতো পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে?
২য় বন্ধু : জানি না।
১ম বন্ধু : মাত্র ১টি দেশ বাংলাদেশ, বাকি সব বিদেশ।

জানা-অজানা

খন্দকার রিদওয়ানিল্লাহ নাহিয়ান

কলেজ নং: ১১৩১৮

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: খ (দিবা)

১. আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির নাম বাংলাদেশ। এই দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করেছি। বাংলাদেশ (Bangladesh) নামটির পূর্ণরূপ এসো আমরা সবাই জেনে নেই-

Bangladesh
B= Blood=রক্ত
A= Achievement= অর্জন
N= Note worthy= স্মরণীয়
G= Golden= সোনালি
A= Admirable= ভূমি
D= Democratic= প্রশংসনীয়
E= Evergreen= গণতান্ত্রিক
S= Sacred= পবিত্র
H= Habitation= বাসভূমি

পুরোটি একসাথে করে বললে হয় "রক্ত অর্জিত স্মরণীয় সোনালি ভূমি প্রশংসনীয় গণতান্ত্রিক পবিত্র চিরসবুজে বাসভূমি।

২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স:) ৫টি জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে বলেছেন-

১। অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতার।
২। ব্যস্ততা আসার আগে অবসরের।
৩। দারিদ্র্য আসার আগে স্বচ্ছলতার।
৪। বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের।
৫। মৃত্যু আসার আগে জীবনের।

জানা-অজানা

রুবাইয়াত-ই-তাসিন

কলেজ নং: ৮৮৩৩

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ঘ (দিবা)

বিভিন্ন জেলার বিশেষ ব্যক্তিত্ব:

১। ঢাকা-বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান
২। ফরিদপুর-পল্লি কবি জসীমউদ্‌দীন
৩। গাজীপুর-প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ
৪। গোপালগঞ্জ-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৫। কিশোরগঞ্জ-সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৬। মানিকগঞ্জ-ড. অমর্ত্য সেন
৭। মুন্সিগঞ্জ-স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু
৮। নারায়ণগঞ্জ-ক্রিকেটার আতাহার আলী খান
৯। শরীয়তপুর-অতুলপ্রসাদ সেন
১০। মাদারীপুর-হাজী শরীয়তুল্লাহ
১১। নরসিংদী-শামসুর রাহমান
১২। টাঙ্গাইল-মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
১৩। রাজবাড়ি-ড. কাজী মোতাহার হোসেন
১৪। চট্টগ্রাম-ড. মুহম্মদ ইউনুস
১৫। বান্দরবান-বীর মুক্তিযোদ্ধা উ কে চিং (বীর বিক্রম)
১৬। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
১৭। চাঁদপুর-শহিদ দেববর্মন
১৮। কুমিল্লা-ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী
১৯। কক্সবাজার-মোস্তাক আহমদ চৌধুরী
২০। ফেনী-জহির রায়হান
২১। খাগড়াছড়ি-অনন্ত বিহারী খীসা
২২। লক্ষ্মীপুর-সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন
২৩। নোয়াখালী-বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন
২৪। রাঙামাটি-সন্তু লারমা
২৫। রাজশাহী-এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান
২৬। বগুড়া-রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
২৭। জয়পুরহাট-কবি আতাউর রহমান

২৮। নওগাঁ-তালিম হোসাইন
২৯। নাটোর-মাদার বখশ
৩০। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-গিরিশ চন্দ্র সিংহ
৩১। পাবনা-এ.কে খন্দকার
৩২। সিরাজগঞ্জ-এম.মনসুর আলী
৩৩। খুলনা-প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
৩৪। বাগেরহাট-অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ
৩৫। চুয়াডাঙ্গা-আসহাব-উল-হক
৩৬। যশোর-মাইকেল মধুসূদন দত্ত
৩৭। ঝিনাইদহ-বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান
৩৮। কুষ্টিয়া-বাউল সম্রাট লালন শাহ
৩৯। মাগুরা-কবি ফররুখ আহমদ
৪০। মেহেরপুর-ড.মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
৪১। নড়াইল-বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ, এস এম সুলতান
৪২। সাতক্ষীরা-খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ
৪৩। সিলেট-বঙ্গবীর এম.এ.জি. ওসমানী
৪৪। হবিগঞ্জ-শাহ এএমএস কিবরিয়া
৪৫। মৌলভীবাজার- সৈয়দ মুজতবা আলী
৪৬। সুনামগঞ্জ-হাসন রাজা
৪৭। বরিশাল-শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হক
৪৮। বরগুনা-অধ্যাপক সৈয়দ ফজলুল হক
৪৯। ভোলা-বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
৫০। ঝালকাঠি-কামিনী রায়
৫১। পটুয়াখালী-সত্যেন সেন
৫২। পিরোজপুর-তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
৫৩। রংপুর-বেগম রোকেয়া
৫৪। দিনাজপুর-হাজী মোহাম্মদ দানেশ
৫৫। গাইবান্ধা-খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ
৫৬। কুড়িগ্রাম-তারামন বিবি (বীর প্রতীক)
৫৭। লালমনিরহাট-শেখ ফজলুল করিম
৫৮। নীলফামারী-আসাদুজ্জামান নূর
৫৯। পঞ্চগড়-ভাষা সৈনিক মোহাম্মদ সুলতান
৬০। ঠাকুরগাঁও-ভাষা সৈনিক মুহম্মদ দবিরুল ইসলাম
৬১। ময়মনসিংহ-শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
৬২। নেত্রকোনা-হুমায়ূন আহমেদ
৬৩। জামালপুর-অভিনেতা আনোয়ার হোসেন
৬৪। শেরপুর-ভাষা সৈনিক আবুল কাশেম

জানা-অজানা

তাইহান আনান

কলেজ নং: ১৪৪৯০

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: গ (দিবা)

১। ১৯৬০ সালে শ্রীলঙ্কায় সর্বপ্রথম একজন নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

২। ঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ ৮টি।

৩। আফ্রিকার জিবুতি নামক দেশে চীনের সামরিক ঘাটি রয়েছে।

৪। ১৯৭৮ সাল থেকে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন ঘটে।

৫। প্রথম নোবেল বিজয়ী নারী ম্যারি কুরি।

৬। ভিয়েতনামের মুদ্রার নাম ডং।

৭। আয়তনে বৃহত্তম মুসলিম দেশটির নাম কাজাকিস্তান।

৮। নির্মানাধীন পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিমি।

৯। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গ।

১০। সর্বপ্রথম মহাশূণ্য ভ্রমণ করেন যে নারী-ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা।

১১। সবচেয়ে বেশি বছর বাঁচা তিমি বয়স ১১০ বছর।

ফাতিন আনজুম আলভী
কলেজ নং: ১৫২০৩১৬
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: গ (দিবা)

চাকরির ইন্টারভিউ কক্ষে মন্টুর ডাক পড়লো-

বস : বলুন তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কবে?

মন্টু : স্যার ১৯৫২ সাল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু আর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এর সমাপ্তি ঘটে।

বস : ৭১ সালের কয়েকজন শহিদের নাম বলুন?

মন্টু : লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫/৬ জনের নাম বলে বাকিদেরকে ছোট করতে চাই না স্যার।

বস : গুড, আচ্ছা বলুন তো মহাশূন্যে যে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে তার শেষ অবস্থা কী?

মন্টু : এ সম্পর্কে এখনো গবেষণা চলছে রেজাল্ট বের হলে আপনি আমি সবাই জানবো স্যার।

বস : ঠিক আছে আপনি যান।

(এতক্ষণ দরজায় কান পেতে আরেক ইন্টারভিউ প্রার্থী নকলবাজ আবুল ভেতরের কথপোকথন শুনছিল। কিন্তু সে শুধু মন্টুর কথাই শুনতে পেলো। তাকে যখন ডেকে নিয়ে বস প্রশ্ন করলো...)

বস : আপনার জন্ম কবে?

আবুল : সেই ১৯৫২ সাল থেকে এর প্রক্রিয়া শুরু আর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এর সমাপ্তি ঘটে।

(বস ভাবলো আবুল মনে হয় প্রশ্ন শুনতে ভুল করছে। তাই আরেকটা প্রশ্ন করলো.....)

বস : আপনার বাবার নাম কী?

আবুল : লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫/৬ জনার নাম বলে বাকি সবাইকে ছোট করতে চাই না স্যার।

বস : আপনি পাগল নাকি?

আবুল : এ সম্পর্কে এখনো গবেষণা চলছে। রেজাল্ট বের হলে জানতে পারবেন।

তারপরের ঘটনা ইতিহাস...

গুজবে ঢাকা সব অজানা তথ্য

শেখ সামিউর রহমান
কলেজ নং: ১৫২০৩০৬
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা : গ (দিবা)

বর্তমান পৃথিবীতে হাজারো তথ্য ঢেকে গুজব ছড়িয়ে গেছে, তবে সত্যটা কেউ যাচাই বাছাই করুন। আসুন জেনে নেই-

AREA ৫১

যুক্তরাষ্ট্রের লাস-ভেগাসের নেভাডায় অবস্থিত এই স্থানটি। কত গুজব এই নিয়ে। এখানে নাকি Alien নেমেছিল, এইখানে নাকি চাঁদের শুটিং করা হয়েছিল। সবই ভুয়া কথা। যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের একটি Secret air base বানায়। সেখানে অন্যদেশের থেকে অনেক উন্নত বিমান তৈরি করা হতো অন্য দেশের থেকে লুকিয়ে। এখানে F-117, Lockhed F-62 প্লেন এর আবিষ্কার হয়। এখান একটি Runway অত্যাধুনিক Lab আছে। প্রথমে রাশিয়া তাদের Satellite পাঠিয়ে Runway track এর ছবি পায়। পরের সালে সকল তথ্য বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে। তাও এলাকাটি এখনও Secured.

Nasa চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছে না কেন?

অনেকেই গুজব ছড়াচ্ছে যে চাঁদে যাওয়ার পর নীল আর্মস্ট্রং নাকি এমন কিছু দেখেছিল যার জন্য নাকি Nasa ভয় পেয়ে আর চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছে না। সম্পূর্ণ ভুয়া এই তথ্যটি। নীল অ্যামস্ট্রং যতক্ষণ চাঁদে ছিলেন ততক্ষণ ক্যামেরা দ্বারা সম্পূর্ণটি ভিডিও করা হয়। তাই নীল অ্যার্মস্ট্রং কিছু দেখলে তা ক্যামেরা ধরা পড়তো এবং Nasa নীল অ্যামস্ট্রং যাওয়ার পরও চাঁদে Apolo ১৩ পাঠায়। তবে ইঞ্জিন এর এক অংশে বিস্ফোরণ ও অক্সিজেনের অভাবে তারা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

মমির অভিশাপে ডুবে যায়

মমির অভিশাপে নাকি টাইটানিক ডুবে যায় কারণ টাইটানিকে নাকি অভিশপ্ত এক রানির মমি ছিল। আর এ কারণেই নাকি টাইটানিকের যাত্রাপথে বরফ থাকে। কিন্তু এই পথে কখনও বরফের খণ্ড আসে না মমির অভিশাপে নাকি ওইদিন এসেছিল। তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। এই পথে আইসবার্গ আসার পেছনে জবাব দিয়েছে টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদরা। গ্রিনল্যান্ড জন্ম নেওয়া ওই আইসবার্গগুলো ভেসে আসে। ১৯১২ সালের ৪ জানুয়ারি সেদিন সূর্য ও চাঁদ এমন অবস্থায় ছিল যে অবস্থানে সর্বোচ্চ মাত্রার মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি হয় ও চাঁদ পৃথিবীর এতই কাছে এসেছিল যা ১৪০০ বছরে ১ বার হয়। এই দিন হয় ১৪০০ বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতায় জোয়ার হয়। সূর্যের প্রবল বেগে গ্রিনল্যান্ড আইসবার্গগুলো ভেঙে টাইটানিকের পথে আসে ও টাইটানিকের ইতি হয় ১৪ এপ্রিল।

সাকিব আল হাসান
কলেজ নং: ১৫১০৪৩৩
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

১। এক ভদ্রলোক বাজার থেকে ব্যাগভর্তি জিনিস বাসায় এনে পানিতে ফেলে দিলেন। এতে বাসার কেউ কিছু বললও না এবং অবাকও হলো না। তিনি কী কিনেছিলেন?
উত্তর: চা ব্যাগ বা টি ব্যাগ।

২। আপনার কাছে ১০টি আস্ত ডিম আছে। এখান থেকে ২টি ডিম সিদ্ধ করলেন, ২টি ভাঙলেন ও ২টি ডিম খেলেন। কয়টি ডিম আস্ত রইল?
উত্তর: ৮টি। যে ২টি সিদ্ধ করলে সেইদুটি ভেঙে সেই ২টিই খেলেন।

৩। আপনি একটি বন্ধ ঘরে আবদ্ধ। আপনার সামনে তিনটি দরজা রয়েছে। প্রথম দরজার বাইরে আগুনের মতো উত্তপ্ত মরুভূমি। ২য় দরজায় ক্ষুধার্ত সিংহ। ৩য় দরজায় ক্ষুধার্ত কুমির। আপনি কোন দরজা দিয়ে সবচেয়ে আগে ও নিরাপদে বের হতে পারবেন?
উত্তর: ১ম দরজা দিয়ে। কারণ দিনে মরুভূমি উত্তপ্ত থাকলেও, রাতের বেলা মরুভূমি ঠান্ডা হয়।

৪। কোন বস্তু আছে এ ধরায় না চাইলেও সর্বলোকে পায়।
উত্তর: মৃত্যু।

৫। হাত নাই পাও নাই দেশে দেশে ঘুরে। অভাব হইলে তার জন্য লোকে অনাহারে মরে।
উত্তর: টাকা।

কাজী ফাইরাজ কবির
কলেজ নং: ১৬২৩৪
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: গ (দিবা)

১। দুই বন্ধুর কথপোকথন
১ম বন্ধু : আমরা মোট ৪০ ভাইবোন।
২য় বন্ধু : হ্যাঁ? তোর বাসায় আদম শুমারির লোক আসে না?
১ম বন্ধু : আইছিল, সবাইকে পড়তে দেখে কোচিং সেন্টার মনে করে চলে গিয়েছে।

২। আইমান যখন বাবার টাকা বাচায়
আইমান : বাবা আমি তোমার ৩০,০০০ টাকা বাঁচিয়েছি।
তার বাবা : কী ! কীভাবে?
আইমান : তুমি না বলেছিলে পাস করলে কম্পিউটার কিনে দিবে?
তার বাবা : হ্যাঁ
আইমান : আমি ১৩ বিষয়ে ফেল করেছি। বেঁচে গেল তোমার টাকা!

জানা-অজানা

আব্দুন নুর খান ওয়াসি
কলেজ নং: ১৫২০০২২
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ (দিবা)

১। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে; তার ২০ গুণ দূরে ইউরেনাসের অবস্থান।

২। পৃথিবীর উত্তরে গোলার্ধে ২১ মার্চ (বসন্তকাল) এবং ২৩ সেপ্টেম্বর (শরৎকাল) দিন-রাত সমান হয়।

৩। মধ্যযুগে ইউরোপে মাংসপেশী ব্যথার চিকিৎসা হিসেবে স্বর্ণের গুড়া খাওয়ানো হতো।

৪। রকফিশ দুইশ বছরের বেশি বাঁচে।

৫। কুকুর ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়।

৬। ১৮৭৭ সালে হোয়াইট হাউসে প্রথম টেলিফোন বসে; সেটির নম্বর ছিল '১'।

৭। ১৯৩৭ সালে নিউজার্সিতে হিনডেনবার্গ বিমানে আগুন ধরে গিয়েছিল, এর ১৫ দিন পর এর সত্যিকারের ফুটেজ একটি ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

৮। 'অস্কার' নামধারী একজনই অস্কার পেয়েছেন। তিনি হলে অস্কার দ্বিতীয় হ্যারস্টিন।

জানা অজানা

সাজিদ হাসান
কলেজ নং: ১৫২০৩১১
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: গ (দিবা)

১। মাত্র ১ রাতে ১টি ইঁদুর ২৮০ ফুট দীর্ঘ গর্ত তৈরি করতে পারে।

২। শামুক এক নাগাড়ে প্রায় ১ হাজার ১০০ দিন না ঘুমিয়ে থাকতে পারে।

৩। Level শব্দটির বর্ণগুলো উল্টো করলেও তা একই থাকে।

৪। প্রতি মাসে সাহারা মরুভূমি ১ বর্গ কি.মি করে প্রসারিত হয়।

৫। হলুদ পোশাক পরে ছবি তুললে নিজেকে বয়সের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও সবুজ পোশাক পরে ছবি তুললে নিজেকে বয়সের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়।

৬। জার্মান জেল থেকে পালানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

৭। যখন তুমি হাঁচি দাও তখন তোমার মস্তিষ্কে কিছু কোষ মরে যায়।

৮। শুক্র একমাত্র গ্রহ যেটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে।

৯। পিঁপড়ারা কখনো ঘুমায় না।

১০। একটি নবজাতক ক্যাঙ্গারু এত ছোট থাকে যে সেটিকে চামচে নেওয়া যায়।

১১। জগৎ বিখ্যাত চিত্র মোনালিসার চোখে কোনো পাপড়ি নেই।

১২। বেলজিয়ামে কাঁচের রাস্তা রয়েছে।

১৩। একজন মানুষ দৈনন্দিন গড়ে ৪ হাজার ৮৫২টি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

১৪। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার তিহান-১।

১৫। চীনের রাজাকে বলা হতো Son of God।

১৬। ব্যাঙ পানি পান করে না।

১৭। আইসক্রিম সর্ব প্রথম চীনে তৈরি হয়েছিল।

১৮। মহাকাশের অভ্যন্তরে 'ব্লাজরস' নামে গ্যালাক্সি আছে যা থেকে অতি শক্তিশালী 'গামা' রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মিকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করলে পৃথিবীতে শক্তির অভাব থাকত না।

১৯। ভূতের মুভি দেখলে আমাদের দেহের প্রায় ২০০ ক্যালরি কমে যায় যা ৩০ মিনিট হাঁটার সমান।

২০। মানবদেহের হাড় কনক্রিটের চেয়েও শক্ত।

২১। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোনো দেশ নেই।

২২। হাতিই একমাত্র প্রাণী যা লাফ দিতে পারে না।

২৩। ফ্রেঞ্চফ্রাই এর আসল জন্মস্থান বেলজিয়ামে।

২৪। ১৮ বছর পর মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পায় না।

২৫। মস্তিষ্ক দেহের ২০ ভাগ রক্ত ও অক্সিজেন ব্যবহার করে।

২৬। ডলফিন ১টি চোখ খোলা রেখে ঘুমায়।

২৭। চোখ খোলা রেখে হাঁচি দেওয়া অসম্ভব।

২৮। পিঁপড়েরা তাদের দেহের ওজনের ১০ গুণ বেশি ওজনের ভার বহন করতে পারে।

২৯। একটি হাতি ৩ মাইল দূরে থেকে পানির গন্ধ পায়।

৩০। পৃথিবীর সবচেয়ে বেঁটে মানুষ 'কেলফিন'।

৩১। একজন মানুষের শরীরের সবটুকু রক্ত খেতে ১,২০০,০০০টি মশার প্রয়োজন হবে।

৩২। ম্যানগ্রোভ ট্রি নামক গাছে লবণ ধরে।

৩৩। সবচেয়ে বড় ঘাস হলো বাঁশ।

৩৪। একজন মানুষ কোনো খাবার না খেয়ে ১মাসেরও বেশি দিন বাঁচতে পারে।

৩৫। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে রাবারের রাস্তা আছে।

৩৬। এক কাপ কফিতে ১০০ এর বেশি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে।

৩৭। মানবদেহে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ গ্যালন রক্ত কিডনির মাধ্যমে পরিস্রুত হয়।

৩৮। সৌদি আরবের পতাকা কখনো অর্ধনির্মিত হয়না। কারণ এতে কালেমা লেখা রয়েছে।

৩৯। মশারা নীল রঙের প্রতি দুর্বল। ঘরের বাতি নীল রঙের হলে মশার সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে।

৪০। বিশ্বে একমাত্র সৌদি আরবে নদী নেই।

৪১। শামুক যখন ক্লান্ত হয় তখন সে ৩ থেকে ৪ বছর ঘুমায়।

৪২। মানুষের চোখ ১৭০০০ টা ভিন্ন রঙ চিনতে পারে।

৪৩। আপেলের ৮৪ ভাগই পানি।

৪৪। বিশ্বে নারীশূন্য দেশ হলো ভ্যাটিকান সিটি।

৪৫। কুরআন শরীফে ১১৩টি সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' রয়েছে।

জানা অজানা

মুশাররাত হোসেন
কলেজ নং: ১৫২০৩৯৯
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: খ (দিবা)

বিশ্বের সবচেয়ে দামি:

১। বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়ি কোনটি?

উত্তর: Bugatti La Vaiture Noire মূল্য ১২.৫ মিলিয়ন ডলার।

২। বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফোন কোনটি?

উত্তর: Falcon Supernova iPhone 6 pink Diamond মূল্য ৪৮.৫ মিলিয়ন ডলার।

৩। বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি কোনটি?

উত্তর: Graff Diamond's Hallucination মূল্য ৫৫ মিলিয়ন ডলার।

৪। বিশ্বের সবচেয়ে দামি জুতা কোনটি?

উত্তর: Tom Ford Custom By Jason Arashebed মূল্য ২ মিলিয়ন ডলার।

৫। বিশ্বের সবচেয়ে দামি চশমা কোনটি?

উত্তর: Dolce and Gabbana DG2027B Sunglasses মূল্য ৩৮৩,০০০ ডলার।

৬। বিশ্বের সবচেয়ে দামি হীরা কোনটি?

উত্তর: Kohi Noor এতো বেশি মূল্য যে এর মূল্য নির্ধারিত নয়।

আবিদ ইসলাম
কলেজ নং: ১০৫৮৪
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ (দিবা)

১। ছেলে: মা, তুমি না বলেছিলে এবার আমি পরীক্ষায় পাশ করলে তুমি খুশিতে পাগল হয়ে যাবে?

মা : হ্যাঁ, বলেছিলাম। কেন? তুই পাশ করেছিস?

ছেলে : না, মা। তুমি যেন পাগল না হও। তাই আমি আবার ফেল করেছি।

২। দুই বন্ধু একসাথে গল্প করছে?

১ম বন্ধু : দোস্ত, তোর কিছু পড়া হয়েছে? ৩দিন পর পরীক্ষা অথচ আমার কোনো কিছু পড়া হয়নি।

২য় বন্ধু : আরে আমার তো সব রেডি শুধু একটা জিনিস বাকি।

১ম বন্ধু : সত্যি? সেটা কী?

২য় বন্ধু : কলম, পেন্সিল, রাবার, স্কেল সব রেডি, শুধু পড়াটা বাকি।

জানা-অজানা

আশীষ উর রহমান
কলেজ নং: ১৩৪৯৩
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (প্রভাতি)

১। আমরা প্রতিদিন প্রায় ২০,০০০ বার চোখের পলক ফেলি।

২। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল র‍্যাফলেসিয়া।

৩। উটপাখির মস্তিষ্কের চেয়েও তার চোখ বড়।

৪। Facebook.com কে Fb.com বানাতে মার্ক জুকারবার্গের ৮৭ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। তাই মার্ক জুকারবার্গকে ফেসবুকে কখনো ব্লক করা যায় না।

৫। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গাছটি ব্রিসলকোন পাইন নামে পরিচিত, যার বয়স ৪৬০০ বছর। এটি ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত।

৬। একটি মৌমাছি প্রতি মিনিটে ১২০০০ বার ডান ঝাঁপটায়।

স্থাপত্য, স্থপতি ও অবস্থান

আন্নাফিউস জিসান
কলেজ নং: ১৭১৯০
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (প্রভাতি)

স্মৃতিসৌধের নাম	স্থপতির নাম	অবস্থান
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সৈয়দ মাইনুল হোসেন	সাভার
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির	মুজিব নগর
শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	ঢাকার মিরপুর
রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	রাজারবাগ
তিন নেতার স্মৃতিসৌধ	মাসুদ আহমেদ	ঢাকা
অপরাজেয় বাংলা	আব্দুল্লাহ খালেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণ
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	টি.এস.সি ও রোকেয়া হলের মধ্যবর্তী স্থান
দুরন্ত	সুলতানুল ইসলাম	ঢাকা শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণ
মিশুক	সৈয়দ মাইনুল হোসেন	বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথ
বলাকা	মৃনাল হক	ঢাকার মতিঝিলস্থ বিমান অফিসের সামনে
দোয়েল	আজিজুল পাশা	তিন নেতার স্মৃতিসৌধের কাছে
শাপলা	আজিজুল পাশা	বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে
সার্ক ফোয়ারা	নিতুন কুণ্ডু	পান্থপথ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভঃ থিয়েটার	আলী ইমাম	বিজয় সরণি

জানা-অজানা

তানজীম আহমেদ
কলেজ নং: ১৭৫০৯
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

১. ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের চোখের পলক বেশি পড়ে। মেয়েরা মিনিটে ১৯ বার এবং ছেলেরা ১১ বার পলক ফেলে।

২. মানুষের শরীরে যে পরিমাণ কার্বন আছে তা দিয়ে ৯০০০ পেন্সিল বানানো যাবে।

৩. একজন মানুষের স্নায়ুতন্ত্র এতো লম্বা যে, তা দিয়ে পৃথিবীকে ৭ বার প্যাঁচানো যায়।

৪. সারাবিশ্বে ৭ শতাংশ মানুষ বাম হাতি।

ইয়াওমুল আমিন
কলেজ নং: ১১৮৬৪
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ক (দিবা)

১. মেয়ে একটি পুতুল উপহার পেয়েছে, সেটা দেখে মা বলে, বাহ, পুতুলটা কত মিষ্টি দেখেছিস!
মেয়ে পুতুলটাকে কামড়াতে শুরু করল। মা তো দেখে অবাক। মা বলল, মানে কী এটার? পুতুলটাকে কামড়াচ্ছিস কেন?
মেয়ে বলল, তুমি না বললে পুতুলটা মিষ্টি। তাই টেস্ট করে দেখলাম কতটা মিষ্টি।

২. দুই বন্ধু কথা বলছে, অনিম আর বাবুল।
অনিম : ভেবেছিলাম নষ্ট ঘড়িটা ফেলে দেব। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টালাম নষ্ট ঘড়িটাই ব্যবহার করি।
বাবুল : কেন বন্ধু?
অনিম : আরে বোকা, এটা নষ্ট ঘড়ি, কিন্তু দিনে দুইবার ঠিক সময় দেয় তাই।

মুজাম্মেল হক
কলেজ নং: ১৬৩২১
শ্রেণি: দশম, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

১. বাবা : কী রে রাজু, তোর অংক পরীক্ষা কেমন হলো?
ছেলে : ভালোই হয়েছে, বাবা। শুধু একটা অংক ভুল হয়েছে মনে হয়।
বাবা : আর বাকিগুলো?
ছেলে : বাকিগুলো তো করতেই পারলাম না।

২. সুজনের হাতে মোবাইল ফোন দেখে...
তার বন্ধু বলল, কী সুন্দর মোবাইল! কত দিয়ে কিনলে?
সুজন : দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতেছি।
বান্ধবী : প্রতিযোগিতায় কয়জন অংশ নিয়েছিল?
সুজন : আরে, সেটা শুনলে তো আরও অবাক হবে। তিনজন পুলিশ, এক মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী আর আমি।

মানব শরীরের বিস্ময়

মুসফিকুর রহমান মুহিত
কলেজ নং: ১৭২৯০
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

১। প্রতিটি মানুষের হাতের, ঠোঁটের ও জিহ্বার ছাপ ভিন্ন।

২। মানবদেহে হাড়ের সংখ্যা ২০৬টি। তবে নবজাতকের দেহে ৩০০টি হাড় থাকে।

৩। মানুষ না ঘুমিয়ে মাত্র ১১দিন বেঁচে থাকতে পারে তবে না খেয়ে ২১দিন বেঁচে থাকতে পারে।

৪। মানুষের মুখে ৬ বিলিয়ন এর মতো ব্যাকটেরিয়া থাকে।

৫। মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা ৪৬ বিলিয়ন এবং তা ৪৩২ কিমি/ঘণ্টা বেগে মস্তিষ্কে তথ্য পাঠায়।

৬। মানুষের চামড়ার উপর প্রায় ১ কোটি লোমকূপ থাকে।

৭। মানুষ সাধারণত বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে গন্ধ আর ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে সুগন্ধ ভালো বোঝে।

৮। ১ দিনে মানুষের শরীরে প্রায় ১ লক্ষ বার হার্টবিট হয়।

৯। মানুষের কোষের মধ্যে যে পরিমাণ তথ্য থাকে তা যদি মানুষ পড়া শুরু করে প্রতি সেকেন্ডে ৩টি শব্দ পড়লেও একটি কোষের তথ্য পড়তে ৩১ বছর সময় লাগবে।

শূন্য নিয়ে জানাজানি

সংগ্রাম কুমার ঘোষ
কলেজ নং: ১৭২৮২
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

শূন্যকে প্রথম ব্যবহার করে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার মানুষ,আজ হতে দুই হাজার সাতশত বছর পূর্বে। কিন্তু তারা একে সংখ্যার মর্যাদা দিতে পারেনি। শূন্যকে প্রথম সংখ্যার মর্যাদা দেয় এই ভারতবর্ষের মানুষ। প্রথম শূন্য নিয়ে কাজ করে আর্যভট্ট । তিনি কবিতায় লিখেছিলেন "স্থানম স্থানম দশ গুণম" (সংস্কৃত) যার মানে হচ্ছে স্থানে স্থানে যে দশ করে গুণ করা হয়। এরপর যিনি শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে দেখলেন তিনি হলেন ব্রহ্মাগুপ্ত। তিনি তার বই 'ব্রহ্মাস্ফুটাসিদ্ধান্ত' এ শূন্য দ্বারা যোগ, বিয়োগ, গুণ করে কী হয় তা দেখিয়েছেন। আরও অনেকে শূন্য নিয়ে কাজ করলেও শূন্য দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে কী হয় তা দেখাননি। কিন্তু এখন আমরা জানি যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে তা হয় অনির্ণেয়। এবার একটু কল্পনা করি। ধরি একটি যন্ত্র, ফাংশন এর ভেতরে কোনো সংখ্যা দিলে এটি তাকে উল্টে দেয়। অর্থাৎ $f(x)=1x$ এখন আমরা ৪ দিলে পাবো ১৪ বা ০.২৫ এবং ১০ দিলে পাবো০.১। ১১০০ দিলে পাবো ১০০ এবং ১১০০০০০০ দিলে পাবো ১০০০০০০। সুতরাং সকল বিন্দু শূন্য থেকে ধনাত্মক দিকে চলে যাচ্ছে। অতএব যত বড় মান দিব তত ছোট মান পাবো এবং যত ছোট মান দিব তত বড় মান পাবো। তাহলে শূন্য দিলে কী হবে? শূন্য তো ছোট তাই এইটা থেকে সবচেয়ে বড় মানই পাওয়া যাবে। বড় মান কী? ধনাত্মক অসীম। তাহলে তো পেয়ে গেলাম ১০ মানে ধনাত্মক অসীম। কিন্তু কেউ একজন বলল আমি কেন ধনাত্মক মান দিব। ধনাত্মক মান দিতে থাকলে ১/৪ দিলে পাবো -০.২৫। পক্ষান্তরে ১৪ দিলো পাবো ২৫ বিধিবাম। ঘটনা তো উল্টো গেল। ধনাত্মক প্রান্তের শেষে কী আছে? ঋণাত্মক অসীম। তাহলে ১০ এর মান হবে ধনাত্মক অসীম ও ঋণাত্মক অসীম। এই মানগুলো সীমান্তিক মান (Limiting Value)।

ধনাত্মক দিক থেকে আসলে ধনাত্মক অসীম এবং ঋনাত্মক দিক থেকে আসলে ঋনাত্মক অসীম। যদি শূন্য দ্বারা ভাগ করে কোনো মান পাওয়া যেত তবে ১=২ এর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হত। অসীম যেহেতু অনুভব করা যায় মাত্র। তাই কোনো কিছুকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে তা অসংজ্ঞায়িত। এখন প্রশ্ন হলো ০০? কারো মতে কাটাকাটি হয়ে মান হবে ১। আবার কারো মতে লবে শূন্য হলে মান শূন্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনোটিই ঠিক নয় কেননা নিচে শূন্য থাকলে তা সংজ্ঞায়িত। তাই গণিতবিদরা বলেন ০০ =অনির্ণেয়।

ENGLISH WRITING

THE CROWN OF REALITY

Safwan Shahriar Chowdhury
College No: 13484
Class: IX, Section: F (Morning)

All at the bottom of the cage of lies,
Comes the taste of literacy.
Where men can learn what is life,
And gain an efficacy.

Success in living, drinking and laughing,
Expectation has clouded their soul.
All they see is this opaque life,
Reflecting light from voids of coal.

The darkness in life is always ignored,
They win the golden crown.
Their brains are hollowed of illiteracy,
With no blood pouring.

They shoot their arrows towards the sky,
Hoping to be a god in stage.
Their burning ambition peek of poison,
Living the golden age.

"Humanity is god, unity is strength" ?
Their minds are caged, small in length.
The dust will settle, the cage will melt.
Power is present, tomorrow is strength.

The fools of life bow their heads,
The executioner who cuts it down.
Bizarre, befooled witches and mages,
Reality is this to the broken town.

Power is a hobby very small in size,
Honest and true but a witch in disguise.
The broken messiah is thriving to hold,
The dream of reality, illusion to eyes.

This dream can end, reality will touch,
Unfortunate shepherds who regret it much.
Crying for chance, begging for light,
But going in circles as nothing such.

Time is fabricated with curtains of lies,
A maze in fact with powerful ties.
Some of ants who see through it,
The blinded whales who fade in cries.

LIFE SPAN

Tahian Kabir
College No: 16267
Class : X, Section : E (Morning)

Living life is just a pain,
If you want to be famed.
Commotion with your friends,
Doesn't make you incompetent.

Life is like an empty dream to me;
Alone-you'll fight for everything
But things are not what they seem
Stop, following footprints !

I'm not satisfied,
Happiness departing from my life.
My heart is not much brave
Now, funeral marches to the grave.

Let us think together
If we'll get a chance another.
Time will never wait, Let's try
With a heart for any fate.

Life is like an empty dream to me...
Alone you'll fight for everything
But things are not what they seem
Stop ! following footprints !

Accused in sadness and sorrow's
Immense irritation of ours
Constant society keeps calling
It our life span.

REMIAN

Priyanta Mozamder Anik
College No: 16341
Class: X, Section : A (Morning)

If you think an honest boy
He is a Remian.
If you think a patriot boy
He is a Remian.
If you think a religious boy
He is a Remian.
If you think an extra-ordinary boy
He is a Remian.
He can do any thing for Bangladesh
As a Remian.
He can do anything for mankind
Because he is a Remian.
I feel proud
To be a Remian.

DYNASTY IN DISGUISE

Sadman Haque
College No: 17608
Class: XI, Section: B (Morning)

You were born with a golden spoon,
And here we are desperate to keep our body moving.
Every day, you're having a banquet,
Then why we are still crying in hunger.
Everybody wants to keep you fascinated,
And look at us, being treated like a leper.
You'll never know what famine truly means,
But the word itself terrifies us.
You only know how to treat yourself,
But for the likes of us,you and I are the same.
You live at the top of your ego,
We live at the bottom of the food chain.
Curse your idealistic society,
Curse your equality.

PRETENDER

Samiul Hossen Sarkar (Santo)
College No: 11911
Class: XI, Section: G (Day)

The world is so big,
Big in population too.
Here, I lost myself,
Lost in the crowd.

The world has a great joke,
Whose name is society.
To go with the flow here,
Everyone is pretending.

Being a part of this joke,
I too have to pretend.
I want but don't know when,
This joke will come to an end.

But alas! while pretending,
To stay in this society.
I've lost myself,
I've lost the real me.

Life is nothing but the
Sum total of many hours,
Only in this short time
We use our powers.

A Journey to Cox's Bazar

Afif Mudabbir Iam
College No: 11171
Class: III, Section : A (Day)

I went to Cox's Bazar on the Eid ul-Fitre of the year. It was the first trip in my life. I was too much interested in that trip. When we reached the airport of Cox's Bazar, I felt so happy. Then we got into a car to go to the hotel. The places were dusty and untidy. Then we altered the hotel. The second hotel was five star. It was clean and so beautiful. Then we all went to each other's room. My mother, my father and I were in a room. My sister and my grandma were in another room. On that night we went to restaurant to eat. After eating we went to a seaport. The land was full of sand. There was a lot of air. There was a big amount of water. That water tastes salty. My grandma went too near to the sea. When the water went near her, it took her slippers away. She ran away from there. Then we entered the hotel. It began to rain. On the next day we woke up and had breakfast. Then my father and I took bath and wore new dresses because the day was the day of Eid.

My father and I went to the Mosque. The Mosque was near to the seaport. We went to the seaport again. The air of the port refreshed my mind. Then we entered the Mosque. The salat started at 8.30 am. We all embraced each other. Then we all went to the sea beach to take bath. Then we bought new slippers and some chocolates. We spent a lot of time in the beach,because that was my last day of Cox's Bazar. We saw the sunset. It looked too beautiful. Then we went to our hotel. We took rest. We had dinner. Then we slept. We woke up before sunrise. We all took bath and went to the airport. After we had reached nearer the plane, my boarding pass flew away. I ran away quickly to catch my boarding pass. We got on the plane. The plane had its flight. Nearer Dhaka Shahjalal International airport, the plane was about to crash. But we were safe by the bless of Allah. Then we reached the airport. We entered into the car and went to our home.

MY TOUR TO INDIA.

Mohammad Ohi Hossain
College No: 11172
Class: III, Section: A (Day)

I have travelled many places in Bangladesh. Now I want to share my experience of a foreign tour in India. On the 5th June, we had a flight to India at 10:00am. It took us 30 minutes to reach India. At first we went to Kolkata. The airport in Kolkata was very big. Then we went to a hotel, got freshned up and ate breakfast. Then we went out of the hotel. We went to market. Then we bought shoes, dresses and watches. Then we returned to the hotel. We could not go around of Kolkata because we were tired as we had made a journey. Next day, we got up early in the morning, took a bath and got into a car which was as big as a jeep. In that car we went to Shantinikatan. There we could see the statue of Rabindranath Tagore, his house etc. We ate in the hotel at night. Then we went to sleep at 10:00pm. Next day we rode in train to reach the main city of Kolkata. It needed 5 hours to reach the main city of Kolkata. We reached Kolkata in the afternoon. Again, we rode in a car and went to the same hotel. We got freshened up and went for dinner. We were searching Mc Donald's. But we couldn't find it. Then we ate dinner in a hotel. Then next day we had a flight in the morning to Siliguri. It took 2 hours to reach Siliguri. We went to a hotel, got fresh and went outside. Then we went to a market. Its name is Vega Circle. We went in different shops. We saw a movie in a movie theater there. The movie's name is 'Bharat'. Then we left the market. Then we returned to the hotel. Next day we got into a big car. We were going to Darjeeling. We reached Darjeeling at 7:00pm. Then the friends of my father came there and we had a lot of fun. Next day, we got up at 5:00 am to see the sunrise and the colorful Himalays. Then we went to a Safari Park. There were Panda, Leopard, white fox, Black Panther etc. Then we went to a tea garden. There were many tea plants. Then we went to a market. I rode a horse in the market. Then I ate a stick of corn. Then we returned to the hotel. Then we played some games and slept. Next day, we had a flight to Kolkata. Then we went to the same hotel in Kolkata, got fresh and slept. Next day, we bought things such as shoes, dresses, bags, watches etc. Next day my mother bought three sarees. Then we had a flight back to Dhaka.

A GLASS OF MILK.

Sajidin Afsar Fahmi
College No: 11147
Class: III, Section: A (Day)

Once upon a time there lived a young boy who was very poor. He did odd jobs to be able to buy his daily food and go to school. One day, after school the boy became very hungry. The boy had no money and he had no job lined up till the night. The poor boy said,"How will I make it through the day?" He will just have some water to fill his stomach. So the boy decided to ask one of the houses in the neighborhood for a glass of water. He knocked at the first door. A young girl opened the door. The boy said, "I am very thirsty. Can you please give me a glass of water?" The young girl said, "Yes, wait a minute." The girl saw the boy's condition and understood how hungry he was. Instead of a glass of water she brought him a glass of milk. The boy was surprised to see the milk. The boy said, "I cannot take this. I do not have any money to pay you for it." Young girl said, "It's okay, you don't have to pay me for it." The boy said, "Thank you very much." The boy drank the glass of milk and felt better immediately. The boy thanked her again and went his way. Many years went by. One day, the young girl now a woman became very sick. She was taken to the hospital. The doctor, who was assigned to her case said, "Don't worry, we will take care of you." The girl said, "Thank you." The doctor took great care of her. He visited her daily, stayed beside her at nights and made sure she was always comfortable. After six months of intensive treatment in the hospital, the woman was finally well and could go home. But she was worried. She called the nurse to her room. The girl said, "I am healthy now but I am worried.

It is time for me to pay the hospital bill. But I am afraid I would not have enough money to do so!" "You don't need to worry," the nurse said, "Your bill was already paid." "What! by whom?" "Have a look yourself." The girl was astonished. The bill was cancelled across and in bold letters it said, "Paid in full year ago with a glass of milk." It was signed by the doctor. The woman couldn't believe her luck. The doctor was the young boy she had helped many years ago. Today he had become her savior and helper.

Attending a Quiz Programme at 'Duranta TV'

Ahnaf Ilman
College No: 11286
Class: VI, Section: C (Day)

One day, volunteer Ratthik (brother) called us in our classes to participate in a quiz program. Then, the selection round began. After the selection round, four students from class IV, V, VI, VII were selected. I was one of them from class VI. In that selection round, honorable Mezbaul Haque sir selected us. After some days, on 17th April, 2019, honorable Ariful Rahman sir called all of us. He advised us to take a nice preparation and gave many ideas about that program. The name of that program was "জানার আছে অনেক কিছু." On the appointed day, a microbus of Duranta TV came to our college with a view to picking us up from our college. Then we started for the Film Development Corporation (FDC) for shooting. We started for FDC at 2:00pm on 18th April, 2019. After thirty minutes we reached there. Our first competition was held against Genderia Public School & College. Result: DRMC=85; GPSC=50. The next day, we were called again. We went there as before. The next competition was against Engineering University School & College (EUSC). Result: DRMC=75; EUSC=70. By the way, we reached the Quarter-final. The quarter final was against Viqarunnisa Noon College (VNC). We beat VNC by 15 points. After that at the semifinal we beat Motijheel Model School by 5 Points. Thus we reached the grand finale. We could not get a gap of single time because both the semifinal and the final were held on 22nd April. Without any break, the grand finale started. That started at 10:30pm and finished at 2:45am. The result of the final was DRMC became champion at "জানার আছে অনেক কিছু" Quiz program. DRMC won taka 1 lakh after being champion. It was also telecast in Duranta TV in Ramadan. The quizzers were:

1. Md. Aliur Rahman (IV-A)
2. Samiul Mostofa (V)
3. Ahnaf Ilman (VI-C)
4. Oman Bin Arif (VII-A)

History of Dragon Ballz

Tahsin Mostafa
College No: 1530323
Class: VII, Section: A, (Morning)

In the animation world there are three kinds of races. Saiyan race, Namekian race, Frieza race these three races have the world's strongest warriors. In the age 457, in the saiyan race, a planet was called planet Vegeta. A king was there called king Vegeta. There were also other saiyans which are Paragus, Nappa, Bardocketc. And from the Frieza race, king Cold threatens all the races to work according to his command. King Cold was the king of Frieza race. Then suddenly, king Cold decided of getting retired, then he made his son the king of everything and ruler. Frecza was his name. Then he started his father's work. In planet vegeta, The king decided to make his son to rule everything but Frieza. Than he raised his son a great warrior on that planet . But suddenly, Paragus' son's power highly exceeded prince's son. Then king Vegeta sent Paragus and his son to an out lying world called planet Vampa. It is a world to wipe out Saiyan race. Then he assembled all the Saiyans to planet Vegeta. Bar-dock also had another son. Which was a great warrior. His name was Raditz. Hiking vegeta's son and Raditz and

some other warriors had gone to other world for an emergency mission. Then Frieza had thrown a meteor at planet Vegeta and the whole world was abilatcrared. Then the whole Saiyan race was wiped out. Then at the age of 678, after Vegeta has grown bigger had gone to Planet Earth. Somehow, Frieza heard that some Saiyans are on the earth. Then he decided to destroy that planet too. Then Frieza with his force has come to earth. In Earth there some Namekians who used to live there happily. Frieza started killing all of them. Then Gokulkakarot and Vegeta had a fight against Frieza. Vegeta died, Goku became very angry and turned super Saiyan and killed Frieza.

Goku somehow escaped from the battle zone and returned Earth successfully. Then Frieza somehow escaped from Earths hell and returned there. Then Frieza's father Cold and Frieza came again to Earth. Goku's friend Bulma had a son named Trunks. He was a good warrior too. He killed Frieza and his father Cold there. Trunk's work took of the history. Then a god of destruction came there. There he destroyed planets. Goku had a fight with lord Berrus and lost the fight. Then Goku learned to transform into super saiyan God and finally defeated that god of destruction. Then lord Berrus gave up and returned. Then lord Berrus came back and lived happily with them. At the age of 777 Frieza again came back with his newer form-God Frieza, Goku still defeated him with his god power. Then while at the end of the battle Frieza destroyed the whole planet with his dark power. Then the whole planet was destroyed but the trainer of lord Berrus used time skip and survived. Then she recessed the time and before Vegeta warned. Goku and Godu killed Frieza. But Friezas force still exsists. Then they all lived happlily.

At the age of 1112 the Frieza force found Broly and his father Paragus at that planet and rescued them and brought them to the ship. Then the Frieza foree brought two of them to planet Earth to kill Vegeta. Then Vegeta lost the battle with Broly. Goku was also defeated with his god form by Broly. They both were at god form. They both still lost. Then Broly turned into legendary super Saiyan and became the strongest warrior of the world. Than Goku and Vegeta merge together to defeat Broly. Then they became 'Fusion' Then Finally they defeated him and now all of them live peacefully in Earth Now all the races live together happily.

"The story was shortly described"

APJ Abdul Kalam
A Paradigm of Excellence

Ayman Abir
College No: 1540054
Class: VII, Section : A (Day)

Early Life

Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, better known as APJ Abdul Kalam was born into a poor Tamil Muslim family in the pilgrimage town of Rameswaram, Tamil Nadu, on October 15, 1931. His mother, Ashiamma, was a housewife and his father, jainulabdeen, was an imam of a local mosque and a boat owner. He was the youngest in the family with four elder brothers and a sister.
Though the family was not financially affluent, all the children were raised in an atmosphere that was full of love and compassion. In order to add to the family's income, Kalam had to sell newspapers during his early years.
He was an average student during his school, but possessed a strong desire to learn and was very hard working.

Youth

His life became a paradigm for the youth of the country. He became a role model and inspiration for the younger generation due to his humble nature, simple and easy going personality, and his ability to connect with young minds.

Career

As A Scientist

In 1960, he graduated from the 'Madras Institute of Technology,' and joined as a scientist at the 'Aeronautical Development Establishment,' after becoming a member of the 'Defence Research and Development Service.' Kalam also worked under the eminent space scientist Vikram Sarabhai while he was a part of 'INCOSPAR' committee.

In July 1980, SL V-III deployed the 'Rohini' satellite successfully near-earth orbit under Kalam's leadership. In May 1998, he played a key role in carrying out 'porkhran-II' nuclear tests by India.

As President

In 2002, Kalam was chosen the presidential nominee by the ruling National Democratic Alliance (NDA), and he was elected the president. He became the 11th president of India on July 25, 2002 and served the position till July 25, 2007.

Due to his style of working and interaction with common people, especially the youth, he was affectionately called 'The people's president.

As An Academician

After the end of his presidential term, he became a visiting professor at the 'Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad,' Indian Institute of Management (IMM), Indore,' and the 'Indian Institute of Management (IMM), Shillong.

A true story in his life

When a teammate of President Kalam at DRDO couldn't take his children to an exhibition due to workload, Kalam surprised him and took the children instead!

During a significant project, the workload was high. One of the 70 scientists working on it asked him if he could leave at 5:30 pm that evening as he had promised to take his kids an exhibition. Dr. Kalam granted the permission. However, the scientist got busy with work only to realise that it was 8:30 pm. When he looked for his boss, he wasn't there. Guilty for having disappointed his kids, he went back home only to find that his kids weren't there. When he asked his wife where they were. she replied, "You don't know? Your manager came here at 5:15 pm and took the children to the exhibition."

Death

Kalam went to IIM Shillong to deliver a lecture on 'Creating a Livable planet Earth,' on July 27, 2015. While climbing a flight of stairs, he expressed some discomfort, but made his way to the auditorium. Only five minutes into the lecture, around 6:35pm IST, he collapsed in the lecture hall. He was taken to 'Bethany Hospital' in a critical condition. He was kept in the intensive care unit but lacked signs of life. At 7:45pm IST, he was declared dead due to cardiac arrest.

Interesting Facts About Dr. APJ Abdul Kalam

* He never accepted any gifts from anyone, except books.
* He never charged any fee for the lectures that he delivered within or outside the country.
* He was a vegetarian and was always happy with what he was served.
* He was a pious soul and particular about his morning prayer, which he never missed.
* He never wrote has will. However, whatever was left behind was to be given to his elder brother and to grandchildren. Kalam always called his elder brother before going or returning from a significant assignment.
* His autobiography 'Wings of Fire,' was initially published in English but has been translated into thirteen languages, including Chinese and French.
* Mathematics and Physics were his favorite subjects.

Awards and Achievements

* Kalam was honored with the prestigious 'Bharat Rattan,' 'Padma Vibhushan,' and 'Padma Bhushan' from the Government of India.
* He was bestowed upon the 'Indira Gandhi Award for National Integration' by the Government of India in 1997.
* In 2007, he received the 'Kings Charles II Medal' from the Royal Society.

কলেজ কর্তৃক ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া

পরিবেশ দিবসে কলেজ প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৯-এ র‍্যালিতে
কলেজ অধ্যক্ষের সাথে শিক্ষক ও ছাত্ররা

এসএসসি পরিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরে
অধ্যক্ষের সাথে শিক্ষার্থীদের একাংশ

এইচএসসি পরিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরে
দর্শনীয় স্থানে প্রবেশ করছে শিক্ষার্থীরা

বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রদের পুরস্কার গ্রহণ

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন-২০১৯

তৃতীয় শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা-২০১৯

১৬ই ডিসেম্বর প্রত্যুষে সম্মান প্রদর্শন

মহান বিজয় দিবস উদযাপন-২০১৯

পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০২০

ঘোষণা কেন্দ্র

যেমন খুশি তেমন সাজ প্রতিযোগিতায় সাম্যের সাজে ছাত্ররা

ঢাকা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন দল

ঢাকা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃকলেজ হ্যান্ডবলে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন দল

ঢাকা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্সে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন দল

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় জয়ী চল্লিশ অনূর্ধ্ব পুরুষ দল

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় জয়ী চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষ দল

বক্তব্য রাখছেন বোর্ড অব গভর্নস এর বিদায়ী সভাপতি

বোর্ড অব গভর্নস এর বিদায়ী সভাপতিকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান

৬০তম বার্ষিক ক্রীড়ার সমাপনীতে সচিব মহোদয়ের আগমন

সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কলেজ বিএনসিসির কুচকাওয়াজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কলেজ স্কাউটদের কুচকাওয়াজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কলেজ ব্যান্ড দল

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের তাইকোয়ান্দো প্রদর্শন

৬০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জুনিয়র শাখার রানার আপ হাউসকে মাননীয় সচিব কর্তৃক ট্রফি প্রদান

৬০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জুনিয়র শাখার চ্যাম্পিয়ন হাউসকে মাননীয় সচিব কর্তৃক ট্রফি প্রদান

৬০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সিনিয়র শাখার রানার আপ হাউসকে মাননীয় সচিব কর্তৃক ট্রফি প্রদান

৬০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সিনিয়র শাখার চ্যাম্পিয়ন হাউসকে মাননীয় সচিব কর্তৃক ট্রফি প্রদান

জুনিয়র শাখায় ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল

সিনিয়র শাখায় অবস্ট্যাকল রেস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল

চ্যাম্পিয়ন হাউসের বিজয় উল্লোসিত ছাত্ররা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ট্রফি, ক্রেস্ট ও পুরস্কার

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে হার্ডেলস প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মনোজ্ঞ ডিসপ্লে

বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

বিজ্ঞান মেলায় দেয়াল পত্রিকা এবং স্ক্র্যাপ বুক পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

বিজ্ঞান মেলায় আগত অতিথিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান

আইটি কার্নিভালে আগত প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

আইটি কার্নিভালে প্রদর্শিত রোবট

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে শ্রেণি পাঠদান চলছে

কলেজ অডিটোরিয়ামে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দ্বারা মোটিভেশনাল উপস্থাপনায় মনোযোগী সবাই

শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে মাননীয় সচিব মহোদয়ের পরিচিতি সভা

হাউস বাগান পরিদর্শনে মাননীয় অধ্যক্ষ

২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সমাপনী দিবস

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহে অধ্যক্ষের চারু ও কারুকলা পরিদর্শন

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহে দেয়াল পত্রিকা পরিদর্শন

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহে চলছে গান শুনে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা

নামাজের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মসজিদে গমন

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহে জুনিয়র শিক্ষার্থীর
বটমূলে মূকাভিনয় পরিবেশনা

মাননীয় বিশেষ অতিথির সাথে বার্ষিক
সাংস্কৃতিক সপ্তাহে শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহে দেয়াল পত্রিকার ট্রফি গ্রহণ করছে
জুনিয়র শাখার চ্যাম্পিয়ন হাউস

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহে দেয়াল পত্রিকার ট্রফি গ্রহণ করছে
সিনিয়র শাখার চ্যাম্পিয়ন হাউস

স্থাপনা ও নিসর্গ

কলেজের প্রধান ফটক

অদম্য তুরঙ্গ ও অজেয় তুরগ

শাপলা সিঞ্চন

পতাকা মঞ্চ

শিক্ষাভবন-১ এবং বাংলাদেশের মানচিত্র

কলেজ মসজিদ

অবস্ট্যাকল্ রেইসের জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা

রাতের আঁধারে বর্ণিল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

বসন্তের বর্ণিল সাজে সজ্জিত হাউস বাগান

কলেজ অভয়ারণ্যে মায়াবী হরিণ

নতুন সাজে ঐতিহ্যবাহী বটতলা

মনোরম ছায়াবিথী

কলেজের পুকুরঘাট

কলেজের বিভিন্ন প্রান্তে বসন্তের ছোঁয়া

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাব পরিচিতি

প্রধান সমন্বয়কারী: মোহাম্মদ নূরুন্নবী, সহযোগী অধ্যাপক

ক্রমিক নং	ক্লাবের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম ও পদবী	ক্লাব-লোগো
০১.	আর্ট ক্লাব	নূরুন্নাহার, সহকারী অধ্যাপক	
০২.	বিজ্ঞান ক্লাব	মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক	
০৩.	আইটি ক্লাব	রাসেল আহমেদ, প্রভাষক	
০৪.	বিএনসিসি	মোঃ আবু সাঈদ, প্রভাষক	
০৫.	রেমিয়েন্স ডিবেটিং সোসাইটি	তারেক আহমেদ, প্রভাষক	
০৬.	রেমিয়েন্স ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব	মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন, প্রভাষক	
০৭.	ফটোগ্রাফি ক্লাব	মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক	
০৮.	রেমিয়েন্স মিউজিক ক্লাব	বর্নালী ঘোষ, সহকারী শিক্ষক, সঙ্গীত	
০৯.	স্কাউট গ্রুপ	মোঃ শামসুজ্জোহা, প্রভাষক	
১০.	ব্যান্ড টিম	মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন, ক্রীড়া শিক্ষক	
১১.	গেমস ক্লাব	মোঃ ফারুক হোসেন, প্রভাষক	
১২.	মডেল ইউ এন ক্লাব	মোঃ আফজাল হোসেন, প্রভাষক	
১৩.	বিজনেস ও ক্যারিয়ার ক্লাব	মোঃ আহসানুল হক, প্রভাষক	
১৪.	ন্যাচার এন্ড আর্থ ক্লাব	মোঃ ফরহাদ হোসেন, প্রভাষক	
১৫.	সমাজসেবা ক্লাব	মোঃ খাইরুজ্জামান, প্রভাষক	
১৬.	গণিত ক্লাব	অনাদি নাথ মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক	
১৭.	তায়কোয়ান্দো ক্লাব	ভারত চন্দ্র গৌড়, সহকারী শিক্ষক	

স্মৃতি অমলিন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দিবা শাখার নবম শ্রেণির ছাত্র নাঈমুল আবরারের মৃত্যুতে শোকবার্তা

গত ১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সংগঠন 'কিশোর আলো'র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কলেজের দিবা শাখার নবম শ্রেণির ছাত্র নাঈমুল আবরার মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নাঈমুল আবরার তাঁর প্রিয় ক্যাম্পাস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সবুজ চত্বর থেকেই চিরবিদায় গ্রহণ করেছে। তাঁর এই অকাল মৃত্যু ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সকলকে করেছে শোকাভিভূত। কলেজের প্রতিটি সদস্য অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে চিরবিদায় জানিয়েছে।

কলেজের চত্বর, গাছপালা, প্রকৃতি সকল কিছুর সাথেই আবরারের ছিল আত্মার সম্পর্ক। এই কলেজের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে আবরার ছিল প্রাণের বাঁধনে বাধা। এই সবুজ মাঠে ছিল তাঁর নিত্য-চঞ্চল ছোটাছুটি। হঠাৎ বিধাতার অমোঘ নিয়মে সে তাঁর প্রিয় এই অঙ্গনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাঁর এই করুণ মৃত্যুতে কলেজের প্রতিটি অঙ্গন যেন শোকে নিথর হয়ে আছে।

সুন্দর, সুদর্শন ও সৌম্য চেহারার অধিকারী আবরার তাঁর আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা সহপাঠী, শিক্ষকসহ কলেজের সকল সদস্যের চিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই তো তাঁর এই অকাল প্রয়াণ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলকে করেছে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত। আবরার তাঁর বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষকমণ্ডলীসহ সকলের হৃদয়ের মণিকোঠায় অমর হয়ে থাকবে।

আবরার ছিল কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফলে সে তাঁর অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করে সে তাঁর পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। এরকম মেধাবী একজন ছাত্রের শূন্যস্থান সহজে পূরণ হবার নয়। তারপরও পরম স্রষ্টার অমোঘ নিয়মকে অবশেষে মেনে নিতেই হয়।

পরিশেষে আমরা নাঈমুল আবরারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাঁর পরিবার ও নিকটজনদের এই শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন, তাঁকে প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন, তাঁকে জান্নাতবাসী করুন; এই কামনা করছি।

২০১৯-এ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

২০১৯-এ প্রিন্ট মিডিয়ায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

* The ASME Foundation, USA, honoured Kalam with the Hoover Medal.
* The United Nations recognized Kalam's 79th birthda as World Students' Day.
* In 2003 and 2006, he was nominated for the 'MTV Youth Icon of the Year.'

10 Most inspiring quotes of Dr. Kalam:

1. "Don't take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck."
2. "Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action."
3. "To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal."
4. "If you fail, never give up because FAIL means First Attrempt In Learning."
5. "If you want to shine like a sun first burn like a sun."
6. "Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough."
7. "All of us do not have equal talent. But, all of us have an equal opportunity to develop our talents."
8. "Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow"
9. "If four things are followed-having great aim, acquiring knowledge, hard work, and perseverance-then anything can be achieved."
10. "Your best teacher is your last mistake."

In conclusion

There were many leaders and great men in the world. Some had been murdered, some were hanged or jailed by autocratic ruler, some were politically colored or being a leader of a group of people or nation. But APJ Abul Kalam is such a great man who is loved by all people of any age and all nations of the world. He had no group and there was no controversy about his greatness. No ruler had to punish him but love for using him for the wellbeing for mankind. So APJ Abul Kalam is unique and a paradigm of excellence.

The Colours of Our School Logos

Sadik Bin Sohrab
College No: 13922
Class: VIII, Section : A (Morning)

Every school in Bangladesh has a logo. Our school has one. But with 3 different colors-Blue, Green and Maroon.
The Blue logo is only for the resident students who are in the Morning shift.
The Green logo is only for the Non-resident students who are in the morning shift.
And the maroon logo for the both resident and Non-resident students who are in the Day shift.
But some of students of Dr. Muhammed Shahidullah House (The house only for the resident students of Day shift) put the Blue logo on their shirt. Because they are also resident students.
We see all of those logos everyday. But have we ever asked our mind or someone else that for what the colours of our school logos stand for ?
May be many of us didn't.
I think our school logos indicate some thing natural.

Here it is :

Blue logo: That logo may indicate the mighty large sky above of our head.

Green logo: That logo may indicate the beautiful green ocean of our school. The spanking ground of our campus.

Maroon logo: And the maroon logo of Day shift may indicate the magnificent strong sun.
That is my concept about our school logos. May be many of the students of our school will express different opinions. They may not agree with me. But still, that is my personal opinion.
However we should respect our school logos. Because those logos are the symbol of our school. It upholds the pride of our school.
So, I am proud of school logos. I am proud to be a remain.

MISSION EARTH

Ahnaf Fuad Khan
College No: 8053
Class : VIII, Section: A (Day)

Kevin was very angry. He was so angry that he wanted to break everything in his room. It was because of his Math Model Test result. He had scored only 72 out of 100.

Kevin is an inhabitant of zepladorah. It was the capital city of Ardamenrah, the most developed country in the planet Albarodarth.

The highest grade 'Outstanding' can be achieved if one scores 96 out of 100. And you get excellent if you score at least 90 out of 100. And again you get Average if you so score 80 or more than it. But Kevin has got 'Condemnable' grade as he has achieved only 72. It was the second phase of his 8th standard. If he does the same in the third phase, he won't be able to get promoted in 9th standard.

When he was thinking of all these, a spaceship suddenly crashed before his floating room. He went out and saw it was a 9th Gen rocket, which he saw in Ardamensah National Museum. Now a days, people here use the 51st Gen rocket. So, the crash of such a thing was really unbelievable at this age. He sat in his Grabike and went to see it. When he reached the spot, he saw a man lying unconscious in the cockpit of that rocket. He sent his robot stardom to fetch that person. Stardom is Kevin's 9.005th Gen ultraboosted De-engaged turbized robot. He commanded stardom to check him. Stardom also said that he has found a high frequency sound recorder beside him. Kevin replied to him to bring the body and the recorder out.

Kevin brought the body in his house and laid it in his hibernating cell. Then Kevin put the recorder in his supercom and played it. A voice inside was saying.

Hello, hello, whoever, from wherever is hearing me. Please hear me out. I'm captain zeelope, commander-in-chief, American Army. American Government has invented such a virus which destroys all neurons of human brain and fills them with uni-cnidoplastic zedomlimbo cells, which turns them into zombies. I was aware of all of this and I stood against them. So, they tested it on me. But I somehow escaped with the antidote in this spaceship. I've taken a lot of antidotes, but they don't seem to be working on me. Because I was their first experiment and now all my hemoglobin in blood has turned into zombimoglobib. So, whover finds my body, please destroy it before it turns into zombie and harm people. Before entering US Army, I had taken a vow not only to serve USA, but the whole world and today I'm fulfilling it. No offences on my body's destroyer. Please do this for the sake of planet Earth. Save planet Earth, please save it. Plea.....

And the voice was gone. Kevin didn't know what to do, but his heart was saying, "Go for it. Do it, save that planet, save its people, stop the American Government.

Kevin was ready, he was ready to save planet Earth. At first he would destroy the body. Then he will inject the antidote in himself. Then he will make some more copies of it. Then he'll leave planet Albarodarth for the search of planet Earth and to save it. He has shouldered a great responsibility and he surely will complete it.

INTO THE UNIVERSE

Fayem Muktadir
College No: 13424
Class : IX, Section: F (Morning)

Intro :

The universe is about 15.7 billion years old. At its beginning it looked nothing like it does today. Yet everything in today's universe did exist in some form back then. It all started with the Big Bang -A massive explosion that didn't only create all matters in the start of time.

Creation of the Universe

*At start the universe was a hot and dense ball of radiation energy.
*In one-thousandth of a second radiation particles produced tiny particle of matter and formed the 1st ever chemical elements-Hydrogen and Helium.
*Some regions of the young universe contained more hydrogen and helium than others. These shrank to form the 1st star.
*Nuclear reaction inside the star produced other chemical elements like-Carbon, Oxygen.
*The elements in the universe which exist today where created by the Big Bang.

How to create the universe

1. Start time with a Big Bang→ A massive explosion that lasts for less than one trillionth of a second that will create tiny particles of radiation smaller than the size of a full stop.

2. Wait 380000 years for the 1st atoms to form a mix that is 76% Hydrogen and 24% Helium.

3. After 1 billion years check that the first stars have formed and there are dwarf galaxies through out the universe.

4.When the universe is 3 billion years old, merge small galaxies to form massive ones.
When 9 billions years old form our solar system in the milky way Galaxy.

My Journey in Becoming an Enlisted Artist in Bangladesh Betar

Waziur Rahman Prothom
College No: 13404
Class: IX, Section: F (Morning)

It was the morning of 5th May. I had a class test on that day in my school. But there was another important event on that day and that was my audition for anchoring and singing in Bangladesh Betar. Before going to further details there are some background events that are worth mentioning.

I just finished shooting as an anchor for the program "Janar Ache Onek Kichu" on the Duronto TV. This show was telecast during the whole month of Ramadan. During the shooting I got a call from my old poetry teacher asking if I was interested in Bangladesh Betar audition. But as I was already involved in one program, I was not ready then. So we did not reply. But as soon as the shooting was over, we called her back and she said that she had already put my name on that list as the last date was near. I was really overwhelmed and I realized how much she wanted me to attend in. So with full concentration I began practising for the audition. After practising for a week I attended an audition accompanied by my mother for enlistment in Bangladesh Betar. But until the moment I had reached there I did not know about the enlistment process. I had only known of the selection of anchors and singers for the famous radio program "Kolokakoli".

So the fact that I was permanently enlisted as an artist in the Bangladesh Betar was purely unknown to me. I was pretty tension free. As my turn came I was seeing other contestants going into a sound proof room and coming out after their performance. So likewise I went in and started my performance. But the judges did not think that it was enough for me to sing only one. They asked me to sing another. I did so as I was told by them. Then they asked me to read out a paragraph of the script of the program that I was giving audition for.

After it all ended, I was called from the judges' room. I was sure of the fact that I was successful in getting their attention. The things that they said to me were some tips for performing in their program. And that there will be some other people helping me in learning. But these things are usually said after selection. So why were they saying all these to me then? I got much tensed. My doubt was relieved when I got the letter admitting the fact that I was selected for the program and also for the enlistment.

I am grateful to my poetry teacher Mahmuda madam and my mother for helping me so much to obtain this great opportunity which will be very important for the career I want to pursue in life in music.

And I am also thankful to Duronto TV for showcasing my capacity as an anchor, my parents for all their motivation and support under all circumstances.

Dark Matter & Dark Energy

Shayan Un Noor
College No: 13553
Class: IX, Section: F (Morning)

Do you know how the vast universe was created ? Well, according to the modern science the universe was created after a great explosion called The Big Bang Explosion. This theory of universe creation was given by a Belgian Priest Georges Lemaitre. It's known as The Big Bang Theory. This theory is known to almost all of us. But can you tell of what matter the universe consists ? If you say that it is made up of general matters which consist of electron, proton or neutron, then I will say that you're wrong!! So, what is the right answer then ? The right answer is : the universe consists of 95% dark matter and dark energy and only 5% general matters, of the 95%, 68% is dark energy and 27% is dark matter. You may think that it is just an assumption and may also claim the proof of their (dark matter and dark energy) existence. Fortunately, I have that very proof. According to Newton's law, "Every object of the universe attracts each other by a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance." Therefore in the space the bodies must be attracting each other and remain tightly binded. But practically it doesn't rapper. In 1924, Hubble showed that the universe is expanding gradually. Again from Quantum Theory of Planck, constant (n), Universal Gravitational constant (G) and light speed (C) started to work in the universe, then the length of the universe was only-Now it has attained a gigantic shape. So, what's the reason behind it? Was Newton's law wrong ? No, it wasn't. The reason behind it was another form of energy which was named as dark energy by the scientists. So, now let's discuss about dark matter and dark energy.

Dark Matter & Dark Energy :

The greatest mystery of modern science is dark matter and dark energy. We have already talked about the existence of dark matter in the universe. Now the question arises : what is dark matter and dark energy? Dark matter is a form of matter which is mot made up of particles like electron, proton or neutrons. Possibly dark matters are made of halo objects. Dark matter was invented by a Swiss-American astronomer Fritz Zwicky. Dark matter is considered to be non-baryonic in nature because although it is not composed of, protons but it works according to gravity. On the other hand, dark energy is a form of energy which works against gravitational force and thus accelerates the expansion of the universe. It is guessed that because of the effect of dark energy. The galaxies are moving away from each other. The density of dark energy is many of us may think that, dark energy is negative energy, but that is not true.

And the reason behind this great expansion is the mysterious dark matter and dark energy. And the scientists don't know anything specific about them which constitute 95% of universe. That means, we know only 5% of the whole universe!!!!

ARBITRARY BUT TANGIBLE

Tamhidul Islam
College No: 8845
Class: X, Section: E (Day)

"I am certain that you are to fail unless you listen."- Distress gloated.
He answered tremblingly, "While one fails continuously under the shades of a social construct called life, falling in rejection of the acceptance of a weightless moment for taking a deep breath and acknowledging the failure, the truth shall be bestowed upon the individual. Truth is-dereliction is a Deja vu which resurrects incessantly starting from the instance light falls on his eyes. That, in and of itself is the biggest failure. Hence, it reaffirms the fact that we only fail once in our life, but feel it reappearing under various mediums and dimensions. Nativity is what fuels that Deja vu and inaugurates that impotent journey of misery which is inevitable." "The sun has risen, wake up."- Dominance ordered.

He responded with discomposure, "These sentences represent nothing more or less than a set of meaningful but pointless words. Time is a non-existent fiction cut out as a graveyard for the human population. One of the preset cognitive thought of the sentinent in me is creating immense pressure upon myself. That is to say, we took a round object and cherished it with numbers-something which cannot tie a person's satisfaction and beyond, and I abided by the rules. Thus time still haunts us in a prison-cell called life. But I knowingly never bother to ask myself a question, "Why is day called day and night called night?" Again I remain in chains of a constant insurgency of overpowered yet unnecessary construct called time."

"You need to pull yourself together in order to stitch a life and live."- Death ejaculated. He boastfully replied, "Life, a myriad word ties us to the ground ever so vigorously. We begin the process of death the moment we are born. The destinations manufactured in our head to symbolize milestones, milestones reflecting progression towards death. Isn't the only goal of birth to be perished in the end? Every breath we inhale marks another moment astray, another war lost. Then what is there to stitch, in this fabricated labyrinth concluding in one harbor"- Death.
And slowly, they stopped talking to him.

The Cycle of Earth

Muntasir Mubeen
College No: 13030
Class : X, Section : F (Morning)

According to physics, 'Energy cannot be created nor destroyed. It can only transfer to one form to another form'. Then a question arises in our mind that if energy is not destroyed then is every thing in this world cyclic? The answer could be yes to some extent. Now if we see that a green beautiful place with lots of lake, ponds have turned into a desert, will we consider it as it has been destroyed ? The answer is no. As the water of the pond, lakes and water bodies don't usually vanish. Because when the water is evaporated and then condensed into clouds, it falls as rain elsewhere. So, the water is not destroyed nor created anywhere.

On the other hand, land does not also decrease or increase. It will remain 1/3 land of the total area of the whole earth forever even if humans increase. One might think that if human increases, dead body increases and thus they will decompose to form new soil. But that's not true at all. Because human or animal body is made up of protein, minerals, vitamins, water etc. Where do these come from ? Are they created ? Absolutely not. Because, the food that we eat we get from plants and other animals. They collect food from nature. If they collect food from nature, we take from them and then again when we die. We decompose and give them back to nature. So, we can say that it's a chain of cyclic process.

As we see that the land mass and water are never destroyed nor new ones are created. From the beginning the amount of stored land and water that was in the earth is still the same and will be the same till the destruction of the earth!

12 Hours before SSC Beep...Beep…Beep

Dipto sumit
College No: 17458
Class : XI, Section: C (Morning)

My alarm started ringing. I looked at my phone. It was already 6:30 pm. My housemaid didn't wake me up. Disappointing but well predicted, I went to the washroom to fresh up. Then I went to the table for having something. I had bread with jelly. Then it was 7:00 am. The door bell rang. It was my mom. She is a service holder. She came back home and came to my room asking the maid when I woke up, She came to my room. We had some chitchat like.

Mom - How is it going, son?
Me – Not bad. Final touch…….
Mom – What is your final touch, now?
Me – Just checking the mistakes in the exam of UDVASH.
Mom – Go for it. Don't study at late night.
Me – Okay.
After that, studying till 11:30, I finished my supper. Dad was already at home. We sat at the table and made plan what to do in the morning as they were supposed to drop me at the venue. 12:30 I thought why I was getting so nervous. Then I might have slept at about 2 am.

My mom woke me up in the morning at 8:30. It was a sunny day. Then the most important thing happened. After taking bath when I went to my drawer for uniform, my eyes went completely shattered when I saw there was no uniform. I asked the maid and she replied she didn't bring them from the laundry. I was trembling out of fear what I would be going to do. I told the situation to my parents and they started panicking as well. But my father without wasting a single second rushed to laundry thinking the shop owner might open his shop. What an irony! He went to his home town for 5 days and dad got to know after calling him. After knowing that my panick started to devour me.

But in cool head I asked my mom if she knew the number of owner of TSC [The Students Collection]. Luckily she found it on her phone. She called him and told him the entire situation. He was a kind man. He told mom to send someone to the shop. But it was already 9:15 am. The exam is at 10:00 am, so mom told dad to rush to the shop and we (me and mom) were going to the shop and from there we would enter the exam hall. I found it quite pleasant at that stage. I took my essential material and started for TSC at 9:20. At 9:35 we reached there. I quickly changed myself and started for the venue. My hall was Mohammadpur Govt. Boys' High school which was near to TSC, After so much drama, I entered the hall at 9:50 am which was quite late. So I had a showcause form to fill. I couldn't write the exact reason but still it was in my mind. That was my horrific 12 Hours before SSC first exam which was Bangla-1st.
But my exam went well and I got GPA-5 in all subjects. If you are an examinee, learn from my life and be conscious.

Life is an Echo

Jeesan Fardin
College No: 17773
Class: XI, Section: C (Morning)

A little boy got angry with his mother and shouted at her, " I hate you." Because of fear of reprimand, he ran out of the house. He went up to the valley and shouted, " I hate you, I hate you." And the echo returned, " I hate you, I hate you." Having never heard an echo before, he was scared and ran to his mother for protection. He said there was a bad boy in the valley who shouted, " I hate you, I hate you." The mother understood and she asked her son to go back and shout, " I love you, I love you." The little boy went and shouted, " I love you, I love you." And the echo returned, " I love you, I love you." That taught the little boy a lesson that our life is like an echo. We get back what we give.

One Miracle

Sayem Sazzad Nirob
College No: 11645
Class : XI, Section: G (Day)

Once upon a time a boy was born in a small farming village of Japan. His family was poor, they all lived in a small house with very little money. At the age of 9, he left the school and started working in a small shop to support his family. He used to get up everyday before sunrise and clean the store, run errands and then look after the children of his employer. Some years later, destiny showed him a new path. He got a job in an Electricity company. There he got interested in light bulbs and sockets. Every night, he started learning and experimenting on his own. One day, he made an improved version of a light socket, all by himself. He got very excited and showed it to his boss. But his boss was not impressed and said such a product would never work. Even though he was rejected, he believed in his idea. He wanted to do something on his own, start his own company. He asked his friends. They told him he could not do it and could not leave his job and start his own company. He had no experience, very little money and hardly any education. Still, he believed in himself. So, when he turned 22, he took a big decision. He left his stable job and started his own small manufacturing company. He and his wife started manufacturing sockets in their small house. They both went door to door for selling. But no shop owner was interested. As a result, they did not get any order. Month passed by and still they were not able to sell their products. He sold his furniture, borrowed money to survive a little longer. Many day he thought, 'I will give up and go back to my job.' But in the morning as the sun rose, he was out on the streets looking for orders surviving for one more day. Then came a time, he was almost bankrupt. And just when he was closest to give up his dream, a miracle happened in his life. Out of nowhere he got his first major order of 1000 pieces. Now 100 years after that major order of 1000 pieces, his company now has over 250,000 employees, with annual sales of 65 billion dollars. His company's products are now sold across the world. All this was made possible by a man with no education and no money. All he had was a belief in himself. His name is Konosuke Matsushita. The company he had started in his small house is known across the world as 'Panasonic'.

Parallel You in Parallel Universe

K.M Rayed Zakwar
College No: 11618
Class: XI, Section: G (Day)

The universe we live in may not be the only one out there. In fact, our universe could just be one of an infinite number of universes making up a "multiverse."

You've likely imagined it before : another universe out there, just like this one, where all the random events and chances that brought about our reality except right now, when you made one fateful decision in this universe, you took an alternate path in the other universe. These two universes, which ran parallel to universes for so long, suddenly diverge. This isn't just fiction,but one of the most exciting prospect brought up by theoretical physics which has an infinite number of possibilities.

According to the Big Bang theory, some unknown triggers caused it to expand and inflate in three dimensional space. So, to have a parallel universe, or multiverse we'll need another Big Bang and that had to happen in exact same time as ours. Here's when the theory of "Bubble Universe" come. Based on research, when we look at space time as a whole, some areas of space stop inflating like the Big Bang inflated our universe. So, if we picture our own universe as a bubble, it is sitting on a

network of bubble universes of space. What's interesting about this theory is, the other universes could have very different laws of physics than our own, since they are not linked. So, with an infinite number of cosmic patches, the particle arrangements within them must repeat-infinitely many times over. This means, there are infinitely many parallel universes, cosmic patches just like ours (containing someone exactly like U) But there are limitations of this theory such as, the universe we live in is just under 14 billion years old. So, it is a finite amount. This would limit the number of possibilities for particles to rearrange themselves, and sadly make it less possible to have someone as breathtaking as Keanu reeves in a parallel universe.

But rather than seeing this lack of other universes as a limitation, you should take the philosophy that it shows how important it is to celebrate being unique. You should make the choices that work for you, which "leave you with no regrets." That's because there are no other realities where the choices of your dream self play out; you, therefore, are the only person that can make those choices happen.

Be So Good, They Can't Ignore

Jubair Abir
College No: 11480
Class: XI, Section: G (Day)

A presentation is the process of presenting a topic to an audience. Better known as public speaking. It's typically a demonstration, introduction, lecture or speech meant to inform, persuade or build good will. In public speaking as we speak in front of huge crowd still many face nervousness and other problems. Here are the best ways to present ourselves.

i) First 30 seconds : Your first 30 sec is very crucial. Whether the listener would listen to you or start feeling drowsy depends on it. So, in the very beginning try to raise curiosity. Like, you can start your speech saying, "Did you know?" or a big number then all will show interest to hear what you want to say. Or the best way is to start with a story.

ii) Remembering the speech: Most of the time, people write their script either on hand notes or on the palms. If you write on your palm, it may get rubbed due to sweat or if you speak memorizing it looks robotic. The best way is to notify the major points then speaking all about yourself.

iii) Eye contact: Maintaining eye contact is a very important thing. At the early stage if you try to maintain eye contact with crowd you'd become nervous. So, on this stage while looking side, look at the side windows. After becoming confident maintain proper eye contact.

iv) Energy is contagious: While speaking, if you speak like you are feeling drowsy then you'll see most of your viewers will feel drowsy. But if you speak with an energetic voice & smile you'll find your viewers smiling. Because, "Our Energy is contagious".

v) First Impression: Our body language is of two types (1) posture (2) gesture. The movement of arms & other parts is gesture while the way of our standing or sitting is posture. So, without a smart posture if you speak without gesture none will feel good.

vi) Ending the speech: World's 99% speech ends with two word "THANK YOU". But always try to attract viewers providing an effective ending.

So, let's follow the points to give an impressive speech.

Steven Spielberg meets Stephen King

Raihan Rahman
College No: 17469
Class : XI, Section : E (Morning)

Stranger Things is the newest foray into Netflix's original programming, of which brings us their most impressive and strange production to date. When a young boy named Will Byers goes missing.

STRANGER THINGS

His friends, mother and the town are thrust into a conspiracy involving a mysterious girl named Eleven and something even and something even more sinister hiding in the woods of Hawking, Indiana.

From the get go, you can tell this is an homage to classic 80s Spielberg, drawing on E. T. and close Encounters, as well as JJ Abrams' super 8. But, as the show progresses, it becomes more and more like a twisted Stephen king story set in a Spielberg movie. It becomes a dark and twisted ride into an even darker and more disturbing world where the stakes feel higher than anything before it.

I can't go into great detail because spoiling even just a bit of the story (except season 03) takes away from the greater mystery, but I can say, it's one of the most thrilling and intense series to be on TV, without being on TV, if it were to continue, they have to pull the same punches they did with the first season, because they took a great many clichés, and somehow made them fresh and surprising, save for just a couple that they purposefully left cliche.

1st ASEAN Seaboree, A Golden journey to Singapore...

Abu Saad
College No:17692
Class: XI, Section: G (Morning)

Camping has always been a fun. In scouting, Camping is the most attractive thing. Being a scout, this year I got a chance to participate in the 1st ASEAN Seaboree, Which was at Singapore @ THE SARIMBUN CAMPSITE. The camp was of 4 days, 06 Dec - 09 Dec, 2019. It was my first itnternational and the most wonderful camp For the 1st ASEAN Seaboree, Bangladesh Scouts sent a contingent consisted of 23 Scouts and Scouters. The contingent was led by The Hon'ble Deputy National Commissioner (Training) of Bangladesh Scouts :-MR. MD. TOUFIQ ALI, LT. I was in the charge of the whole contingent (CMT). For participating in the 1st ASEAN Seaboee, we started our journey on December 05, 2019. Our flight was booked at The Singapore Airlines at 9:25 pm. We reached The Changi Airport At 3:40 am. We were warmly received by the Singapore Scout Association at the Changi Airport. Then, we started for THE SARIMBUN SCOUT CAMPSITE at around 6 am...

Day 1:-Inauguration Ceremony:-After the Inauguration ceremonyon the first day, we had the event MPA Gallery Tour and LEAVE NO TRACE.

The special thing of the camp was that, most of our events were off-site. The camp-authority took us to different places of Singapore for the events.

Day2:- Scuba Diving:-The second day, the most exciting day for us. We had Kayak Boating & Scuba Diving. Scuba diving was the most attractive event in the whole camp. We were taken to Qweenstown Active SG Swimming Complex at Kallang for scuba Diving. We were trained there two things by the most experienced and skill divers. One was Scuba Diving and another was Advance Diving and Swimming. At night, It was SKIPPER'S NIGHT. But, the most exciting matter was that Bangladesh was the only contingent to perform at the SKIPPER'S NIGHT. That's really a matter of pride for Bangladesh. Thanks a lot to her!!

08 Dec, 2019, The Third day:- The most exciting event of the camp was SEABOREE REGATTA. And in this event, I achieved Bronze medal in the Regatta by defeating Malaysia, Singapore, Taiwan And Hong Kong. On the 3rd day of the camp, Bangladesh Scouts Contingent arranged a special program named "BANGLADESH DAY" representing the culture, tradition and history of Bangladesh. We arranged Locally produced traditional food items like- Chanachur, JhalChira, Naru, Laddu, Kachagolla, Shondesh, Mithai and a lots of other food items. All the Foreign Scouts were very much delighted to have those food items. It was the International Night and also the prize Giving Ceremony. We also performed at the International Night. From Bangladesh, All total we achieved 1 Gold, 10 Silver and 3 Bronze. So, that was really a pride achievement for Bangladesh....

09 Dec, The last day of the camp. At 11am, the closing program started. At the onset, the contingent of Bangladesh was honoured from the SSA .From Bangladesh, We presented them an appreciation crest. We took photos with the foreign Scouts and Scouters. We also exchanged greetings with them. At around 1:00pm, our bus arrived for our leave. Thus, With a lots of memories, our 4 days 1st ASEAN Seaboree, 2019 ended. We left Sarimbun Scout Camp, with a heart filled with love, memories and many happiest moments.Thanks to Singapore Scouts, Thanks to Seaboree Team...

Good Bye Sarimbun!

THE KNOCK OF 2137

A.B.M Ariyan
College No: 16922
Class: XII, Section: G (Morning)

Digital Diary Entry
Audio Recording
I don't Know how long I can speak to it. But I'll try to put as much information as I can.
I found this tablet at an abandoned warehouse. It wasn't in a great condition but it works. The only application in it was this recording app in which I'm recording this message. I don't know if there will be any benefit in recording in this or not but at this moment nothing seems clear.

My name is Adam. I am 27 years old. And I am the last person alive on planet Earth. For all I know is that a great epidemic had broken out. I've done a bit of research which tells me an organization called OMEGA corp did all this. They used to experiment on humans to see the adverse effect of their latest bioweapon, Genetically Modified viral strand or as they call it Ge.M.S. From all I've known from the surviving backup drives found at the facility, they created a virus called the Ruby Ge.M.S. The virus has the ability to manipulate the host by inducing different frequencies externally. They work like the traditional nannies. But the difference is that the virus is organic and they learn from the host. A technical difficulty as they say led to the spread of the virus globally. But it didn't stop there. The virus self mutated to resist external stimuli and took complete control over the host. For that the surviving few had to create an antivirus. For lack of ways to test it, the antivirus started to kill the host along with the virus. Eventually the surviving few died in lock-down. This all happened around 2127. How I survived is the fact I don't remember. I woke up a year and half ago in a homeostasis pod. I've been asleep for almost 10 years. And I have no recollection of my past life. How I remember my name and age is the fact that it is, on the info panel on my pod. I travel around the world in search of information about everything, anything that can

tell me about my past life. But I also hope of finding survivors although I doubt to find anyone. Even some of the animals were infected. If you exclude the horror of the incident, you can actually see that the planet has stabilized. I've read that global warming had gone to the peak of extinction, resulting in geo-storms. Everything at least now has gone silent. New trees and plants have evolved everyday. For a hobby I catalogue wild flowers and plants. Those speckles aren't even on the 57 terabyte database of the Botanical Institute of Parallax. This hobby is the only thing keeping me sane. I always travel with a backpack containing packs of food, canteens of water, a catalogue pad, some hard drives and a plasma-ion gun. I travel far every day. But the problem is fuel. Even with renewable alternatives fuel doesn't last. The sun having set I am back at my shelter. It was once a mansion, but I must say that this house has remarkable security. I always keep the 3 doors which you have to cross to reach my room, locked. I don't know why but mind you, I got a bad feeling up my spine. If felt like something....!
I just heard something! It's coming from my room door. But to come in someone would have to cross the first two door. Though I swear I had put on the alarm. It didn't go off...
Again! This time I heard knocking.
Again! This time even louder. How did someone get past the first two gates without tripping the alarm ? who? How?
(Bang!)

Help!
Signal Terminated

Movie Review

Rayed Rafsan
College No: 17647
Class: XI, Section: C (Morning)

Movie Name : Inception
Genre : Science fiction, action.
Director : Cristopher Nolan
IMDB rating : 8.8
Cast : Leonardo Dicaprio, Ken warenabe, Joseph Gordon Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael caine etc.

Have you ever dreamt ? Obviously, yes. I meant who has not. But have you ever dreamt within a dream ?

It's hard to say. And have you even stucked into a dream and eagerly wanted to return in your real life ? But you don't really know which one your real life is. You can't even understand are you dreaming or is just your real life ?

And this is the main theme of this movie which we can say "Dream within dream".

Like the hero of this film, the viewer of 'Inception' is a drift of time and experience. We can never be quite sure what the relationship between dream time and real time is.

The hero explains that you can never remember the beginning of a dream. You don't know that when you're dreaming. And what if you're inside other man's dream ? How does your dream time sync with his ? What do you really know ?

Dominick 'Dom' cobb (Leonardo Dicaprio) and Arthur are extractors. They perform corporate espionage using experimental military technology to infiltrate the sub conscious of their targets and extract valuable information through a shared dream world.

Now, he is hired by a powerful billionaire to introduce an idea into a rival's mind and do it so well that he believes it is his own.

The rich man, named Saito, gives Cob an offer he can't refuse. An offer that would end Cob's forced exile from home. Where he has two beautiful children.

So, for doing this mission, cob assembled a team and also managed an architect to create spaces in drams, to create a deceptive mage space in target's (Fischer) dream.

Here, it's been said that, the architecture named Ariadne was named after the woman in Greek mythology who helped. Thesus escape from the minotaur's labyrinth .

But, in fact, this mission seems very impossible to them. They can be dead at every dream at every moment. But Cob has to find his real life and go back to his children in real life by finishing his mission.

The music director is the best at his field and did one of his best compositions for the whole time and I bet you're going to watch it again and again.

MCU : The Charismatic Metaphor

Quazi Tajgir Tahmin Raevan
College No: 17531
Class : XI, Section : C (Morning)

Movies are a very favourite and traditional media. We are watching and enjoying movies from the classical age to today's `pop-culture`era. In this long period of time, movies and cinemas have evolved. Different genres like `Fantasy`, `Drama', `Thriller` were created. Sagas continued in not only one but several movies. We know them as `sequels`. However, have you ever thought of a cinematic universe ? Where you have a movie of your own and there are other movies based on other stories and then you all collaborate in another movie ? Sounds crazy, right ? Well, let me tell you a story where a devoted group of people made this crazy thing reality !

From the year 1939, `Marvel Comics` is gifting us many wonderful stories and charactes like Spiderman, X-men, Thor etc. Kids were very fond of these comics. Apart from comics, Marvel also produced movies and shows based on the characters but those were huge failures ! The situation became worse in 1996, when they were bankrupted. To save the whole company, Marvel started to sell their major characters to other studios. Sony bought spiderman, Fox Studius got X-men. Fact is Sony had the chance to buy all the characters for just 25 million. But they refused the offer and said "No one cares about other Marvel characters" And now,...those other Marvel characters worth more than three billion dollars !!

So, what was the turning point ? In 2008, Marvel studios risked almost everything to make the movie `IronMan` and it was a blockbuster hit ! It earned 585 million dollars and also laid the foundation for the whole cinematic universe. I mentioned earlier.

In the last ten years, `Marvel Studios` gifted us 22 movies 3TV shows and seven web series. The charisma here is the inter connection. These all movies and shows are connected with each other. They have their own solo movies and then they team up in the movies like `Avengers` or `Defenders` show. That is why this is called the `Marvel Cinematic Universe` or `MCU`. This is something that the movie industry never witnessed before. After Marvel was bankrupted, its co-creator Stan Lee said ``One day all characters will return to its real home !`` What a turn of event! Today `Fox` is sold to `Marvel`, `Sony` lent spiderman. All characters came to home! The highest grossing movie of all time is `Avengers : Endgame`. There are 3 more MCU movies in the `Top ten`. Not only box office success, Marvel Studios created a new genre in the industry. Other studios like Universal, Warner Bros are following their footsteps by creating their own cinematic universe. Marvel has taken the superheroes to a new level. They proved `Superheroes` are not just for Kids. They portrayed a strong, mesmerizing metaphor which represents our life. These metaphors make us realize the dynamics of strength and perspectives of people. Their struggle, confidence and success preach this message-

"When the whole world tells you to move, your job is to plant yourself like a tree beside the river of truth and tell them `No! you move!"

(Quote From Captain America Civil War-2016)

রেমিয়ান অধ্যক্ষের সাথে আলাপচারিতা

[সম্প্রতি স্বনামধন্য ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ-এর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ প্রথম অধ্যক্ষের পদটি অলংকৃত করায় ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একজন প্রাক্তন রেমিয়ান অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার নিয়েছে রেমিয়ান ইয়ামিন ইসলাম সাবাত (দ্বাদশ, প্রভাতি) ও রেমিয়ান সাজিদ রহমান (দ্বাদশ, দিবা)।]

শিক্ষার্থী : স্যার, আপনাকে অধ্যক্ষ হিসেবে পেয়ে আমরা উৎফুল্ল। একজন রেমিয়ান অধ্যক্ষ হিসেবে আপনার অনুভূতি জানতে চাই।

অধ্যক্ষ : প্রথম অনুভূতি হচ্ছে- কলেজকে ভালোবাসা। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে-দায়িত্ববোধ বেশি, কারণ এই কলেজে কাটানো ১২ বছরের যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তার মধ্যে যেসব ভালো লাগেনি বা উন্নতির অবকাশ আছে বলে মনে হয়েছে ওই সমস্যাগুলো আগে ঠিক করা দরকার। কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যেমন : Accommodation facilities, তারপর আসবাবপত্রের পরিবর্তন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন প্রভৃতি। পাশাপাশি রেমিয়ান হিসেবে ছাত্রদের প্রতি রয়েছে আমার মিশ্র অনুভূতি। যখন আমি Principal তখন আমি তাদেরকে নিজের সন্তান ভাবি এবং যখন আমি রেমিয়ান তখন তাদেরকে ছোট ভাই হিসেবে দেখি। মিশ্র অনুভূতি দুই রকম। একটা শাসন এবং আরেকটা আদর। Principal হিসেবে ওদেরকে শাসন করার একটা বিষয় আছে, বড়ভাই হিসেবে আবার আদরেরও ব্যাপার আছে। কিন্তু সব কিছুর উপরে Principal হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রদের পড়ালেখার মান বৃদ্ধি করা, তাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে তৈরি করা। শুধু পড়াশোনা নয়, তারা যেন ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি হতে পারে। এটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থী : স্যার, আপনি কলেজে আসার পর কলেজের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নানা উন্নয়ন হয়েছে। কলেজের জন্য আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

অধ্যক্ষ : আমার প্রথম কাজই হচ্ছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করা। কারণ কলেজটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর মূল লক্ষ্যই ছিল দক্ষ ও ভালো মানুষ তৈরি করা। যারা ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। এ কলেজের ছাত্ররা ভালো ডাক্তার, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো আমলা ও ভালো ব্যবসায়ী হবে। সর্বোপরি তারা ভালো মানুষ হবে।

শিক্ষার্থী : স্যার, শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও 'ভালোমানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি কীভাবে মোকাবেলা করবেন?

অধ্যক্ষ : আমাদের কলেজটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৫২ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের অবস্থানগত এই সুযোগ ও সুবিধাদিকে কাজে লাগাতে হবে। সাথে আমাদের রয়েছে দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষকমণ্ডলী; যাদের গুণগত পাঠদান, শিক্ষার্থীদের প্রতি দিকনির্দেশনা আমাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করবে বলে মনে করি। এছাড়া আমি সার্বক্ষণিক অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করি। আমি তাঁদের উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদিও সম্মানের সাথে দেখি এবং কলেজ তথা ছাত্রদের মান উন্নয়নের চেষ্টা করি।

শিক্ষার্থী : স্যার, আপনার শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনশীল বিশ্বে তাল মেলানোর জন্য কীভাবে গড়ে তুলতে চান?

অধ্যক্ষ : আমাদের কলেজ ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত। আজ ২০২০ সাল। মাঝে ৬০ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর বহু পরিবর্তন এসেছে। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য টেকসই ও গুণগত শিক্ষা প্রদান করা। আমাদের ছাত্ররা যেন দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখা। দেশ ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায় তারা যেন ভালো করে সে চেষ্টা থাকবে। সেই সাথে তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলাটাও একটা প্রধান কাজ। One should believe that he can do it- এই বিশ্বাসটি তার মধ্যে তৈরি করতে হবে।

শিক্ষার্থী : স্যার, অনেক ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক আপনাকে কলেজের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মনে করে। এক্ষেত্রে আপনার মতামত কী?

অধ্যক্ষ : প্রথমত আমি বলতে চাচ্ছি যে, এই 'সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ' কিংবা 'শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ' বিশেষণটি আমি এ মুহূর্তে নিতে রাজি নই। আমি যখন অধ্যক্ষের চেয়ারে থাকব না তখন ইতিহাস তা যাচাই করবে। তবে হ্যাঁ, আমি কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।

শিক্ষার্থী : স্যার, ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্পর্ক উন্নয়নে আপনার পদক্ষেপ কী?

অধ্যক্ষ : আমি ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধানকে কমানোর চেষ্টা করছি। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিভাবকগণের দূরত্ব আরও কমাতে হবে। আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতি খেয়াল রেখেই সম্পাদিত হচ্ছে। আমি আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

শিক্ষার্থী : স্যার, এজন্যই কী ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকগণ আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ?

অধ্যক্ষ : ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকগণ আমাকে ভালো বলছেন। এটা নিয়ে আমি মোটেই পরিতৃপ্ত নই। আমি পরিতৃপ্ত হব তখনই যখন অধ্যক্ষের পদ থেকে চলে যাওয়ার পর সবাই আমাকে 'ভালো' বলবে, মিস করবে। সোজাকথা ঐ সময়ে আমি হয়তো বা নিজেকে এটা বলতে পারব যে, আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠের জন্য কিছু একটা করে আসতে পেরেছি।

শিক্ষার্থী : স্যার, আপনার মূল্যবান সময় প্রদানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অধ্যক্ষ : তোমাদেরকেও ধন্যবাদ।

২০১৯-এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

মোঃ মমিনুল ইসলাম, কলেজ নং: ১৫৩০৩৮৯
শাখা: অষ্টম, ঙ, জুনিয়র (প্রভাতি)

সাইদুল্লাহ আনসারী, কলেজ নং: ১৭৩৯০
শাখা: একাদশ, গ, সিনিয়র (প্রভাতি)

মোঃ ফারুক হোসেন, প্রভাষক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ (প্রভাতি)

এ কে এম বদরুল হাসান, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ (দিবা)

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ২০১১-এর কৃতি ছাত্রবৃন্দ

বাংলাদেশ তুর্কি আর্ট কম্পিটিশন বিজয়ী হয়ে সৈয়দ আবতাহী নূর (ষষ্ঠ) ২১ থেকে ২৮ এপ্রিল তুরস্কে অবস্থান করে।

মুজিববর্ষ ট্রাস্ট ব্যাংক ১৭তম জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়র তায়কোয়ান্দো প্রতিযোগিতায় উৎফুল্ল শিক্ষার্থী (২টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ১১টি তাম্র পদকসহ মোট ১৭টি পদক অর্জিত হয়।

সিঙ্গাপুরে 1st Asian Seaboree তে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত আবু সাদ (একাদশ)

জাপান দূতাবাস আয়োজিত JENESYS-2019 Students & Youth Exchange Network এর জন্য নির্বাচিত হয়ে জাপান গিয়েছিল কাজী তাজগির তাহমিন রেভান (একাদশ)

এম এ মুনঈম সাগর (একাদশ শ্রেণি) ১৫টি জাতীয় পুরস্কার ও একটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক বিজয়ী। সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে শেখ রাসেল পদক-২০১৯ প্রাপ্ত।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণে ঢাকা মহানগরের শ্রেষ্ঠ মেধাবী, তাহা ইমতিয়াজ আলিম (দশম), রাশেদুল ইসলাম ইয়ন (সপ্তম), রাশিক রহমান (অষ্টম) এবং মোঃ জুনায়েদ ইসলাম (দ্বাদশ)

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি এর কাছ থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণে ঢাকা মহানগর পর্যায়ের গণিত বিভাগে শ্রেষ্ঠ মেধাবী, রাশিক রহমান (অষ্টম)

জাপানের টোকিওতে ১২তম বিশ্ব কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯ এ অনুর্ধ্ব ১৮তে তৃতীয় স্থান অধিকারী মোনাব্বির আহমেদ ভূঁইয়া, (একাদশ)

Promote Future Leaders প্রোগ্রামে চ্যাম্পিয়ন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র তামজিদ সামদানি প্রত্যয়।

Promote Future Leaders প্রোগ্রামে চ্যাম্পিয়ন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মোঃ সায়মন ইসলাম সাকিব।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর হাত থেকে ফারহান জেহা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্সি স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও সনদপত্র গ্রহণ করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর হাত থেকে রুবাইয়াত বিন হায়দার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্সি স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও সনদপত্র গ্রহণ করে।

এইচ এস সি পরিক্ষার্থী, আহমেদ ইত্তিহাদ হাসিব, আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে ৬০তম আসরে ইংল্যান্ডে অংশগ্রহণ করে। সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

নাঈম বুহা Turkish Govt. Scholarship পেয়ে Sakarya University, Turkey তে Bachelor in Economics এ পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

মোঃ ত্বা-সিন রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় (IBA) ৭ম।

মামুনুর রহমান, ভর্তি পরিক্ষায় (JU)-(H) ইউনিটে ৩য়, (A) ইউনিটে ৬১তম, (DU)-(A) ইউনিটে ১৬৩তম, বুয়েটে ৪৪তম, এম বি বি এস ২০৫তম।

চিত্রশৈলী ও ফটোগ্রাফি

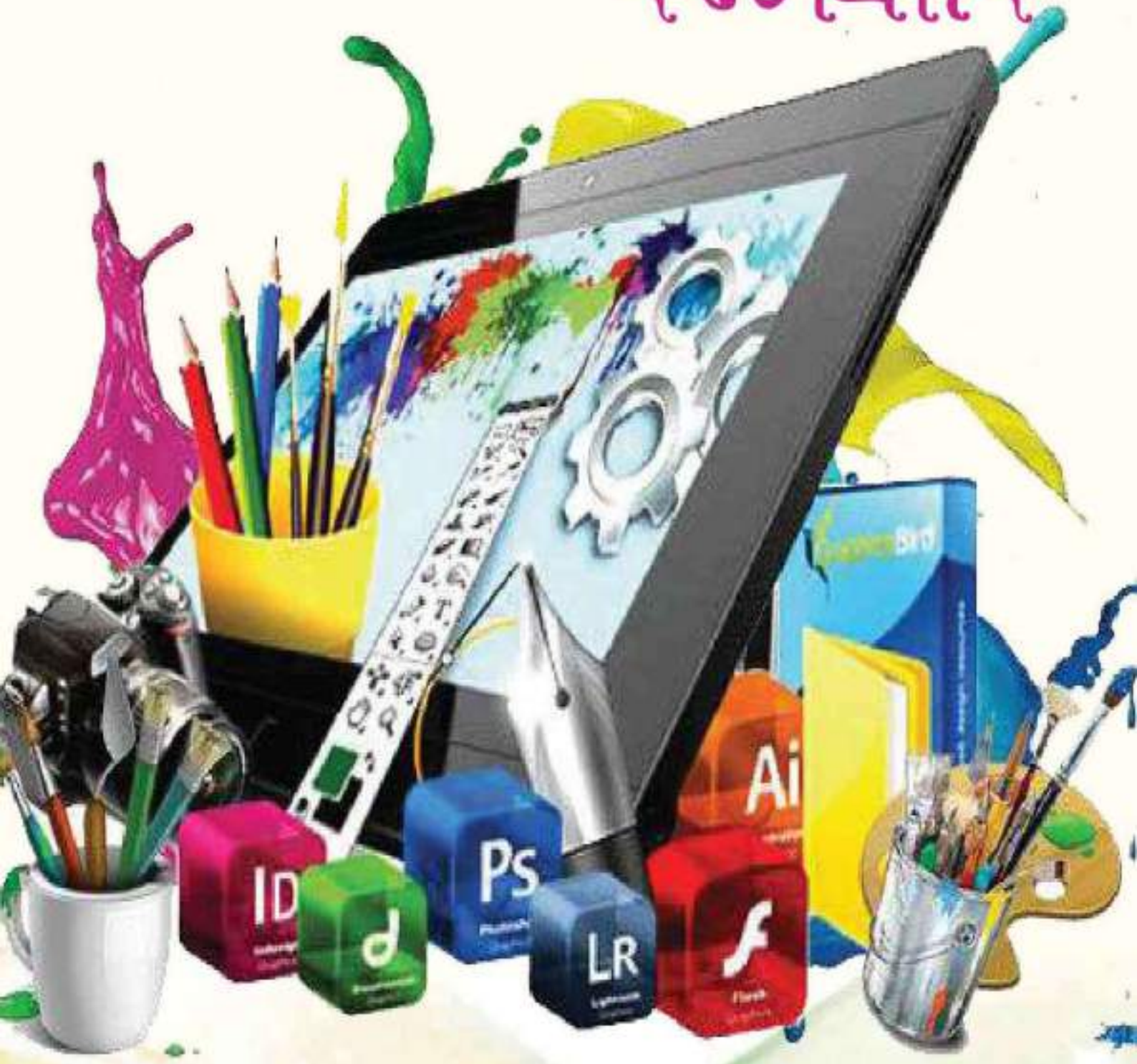

তামজীদ ইসলাম
কলেজ নং :১৭৬০৬
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : ক (প্রভাতি)

কাজী মোঃ তাওহীদ
কলেজ নং : ৮৫৯১
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (দিবা)

এ.বি.এম. আরিয়ান

কলেজ নং : ১৬৯২২

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ছ (প্রভাতি)

ফারহান করিম

কলেজ নং : ১১৬২১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ছ (প্রভাতি)

আল-মোহাইমেন

কলেজ নং : ১৬৭৩০

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

সৌম্য সাহা
কলেজ নং : ৮৬৯১
শ্রেণি : নবম, শাখা : গ (দিবা)

মোঃ হোসাইন আল জাহীন
কলেজ নং : ১৭৩২১
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

দীপ্ত সুমিত
কলেজ নং : ১৭৪৫৮
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

মো. নীয়াজ হাসান
কলেজ নং : ১৭২৮৩
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

শেখ সিয়াম হোসেন
কলেজ নং : ১৫৩৬৮
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (প্রভাতি)

এস.এম. আবতাহী নূর
কলেজ নং : ৮৫৫৯
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : খ (দিবা)

রাশেদুল ইসলাম ইয়ন
কলেজ নং : ১৫৩০৩৬৯
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (প্রভাতি)

আতিক হাসান
কলেজ নং : ১৭০৪৭
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (প্রভাতি)

এম এ মুনঈম সাগর
কলেজ নং : ১৭২৭৬
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : চ (প্রভাতি)

নাম: ইয়ামিন ইসলাম সাবাত
কলেজ নং: ১৬৭১৭
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

নাম: মোঃ গোলাম সাকলাইন
কলেজ নং: ১৭৯১০
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: খ (প্রভাতি)

নাম: ইফতি হাসান অন্ত
কলেজ নং: ১৬৭০৯
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ছ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্মৃতির পাতায়

বর্ণিল

২০১৯

বঙ্গবন্ধুর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে ছাত্রদের দলীয় পরিবেশনা

বঙ্গবন্ধুর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে ছাত্রদের যুগল পরিবেশনা

গণহত্যা দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী সুজেয় শ্যাম

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ এ প্রধান অতিথি এবং অধ্যক্ষের সাথে বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান-১৪২৬

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ছোট সোনামণিদের ফ্যাশন শো

সাপ্তাহিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের একাংশ

২০১৯ সালে থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দ

২০১৯ সালে থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণিশিক্ষকের (কলেজ পর্যায়ে) ক্রেস্ট গ্রহণ

২০১৯ সালে থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বি,এন,সি,সি শিক্ষকের ক্রেস্ট গ্রহণ

কনফারেন্স রুম উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ছাত্রদের ক্লাস পার্টিতে অধ্যক্ষ মহোদয়

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সঙ্গীত পরিবেশন

এইচ এস সি-২০১৯ এর ফলাফল ঘোষণার পর আনন্দঘন মুহূর্ত

বিদায়ী অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশফাক ইকবাল এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-এর বিদায় সংবর্ধনা

প্রাক্তন অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশফাক ইকবাল এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-এর বিদায় উপলক্ষে সামাজিক সন্ধ্যা

মানপত্র গ্রহণ করছেন বিদায়ী শিক্ষিকা জেহিন বেগম

মানপত্র গ্রহণ করছেন বিদায়ী শিক্ষক আব্দুল মোমেন খান

মানপত্র গ্রহণ করছেন বিদায়ী শিক্ষক মোঃ ছানাউল হক

বিদায়ী কর্মচারীদেরকে ফুল দিয়ে বরণ

Climate Action Summit 2019-এ বিজয়ীদের
সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

টিফিনের ফাঁকে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার

BFLHA YOUTH SEMINAR-1 এ কলেজ অডিটোরিয়ামে ছাত্রদের
উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন সাবিহা মেহজাবিন ঐশী

বঙ্গবন্ধুর ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন